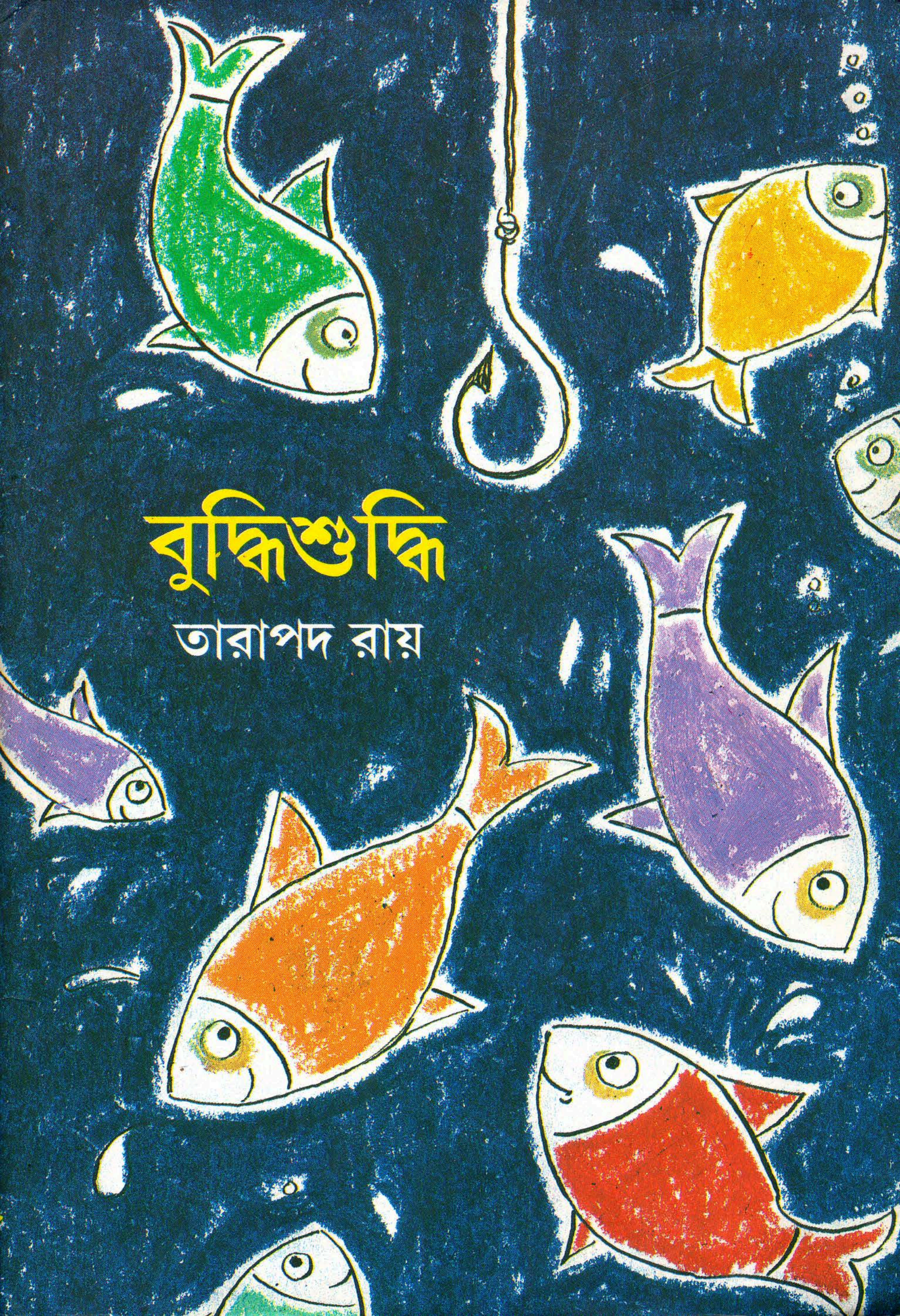
বুদ্ধিশুদ্ধি
তারাপদ রায়

তারাপদ রায়ের কলমে রম্যরচনা, চলতি কথায় একেই কি বলে সোনায় সোহাগা? নিশ্চিত তাই। নইলে পাশাপাশি এই শব্দগুলি দেখামাত্র পাঠকের মুখমণ্ডল কেন হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, হাসিখুশী?
আসলে এতদিনে একটি কথা সবাই জেনে গেছেন। তারাপদ রায়ের রম্যরচনা মানেই অজস্র খোশগল্পের অফুরন্ত। তা সে বইয়ের নাম যাই হোক—জ্ঞানগম্যি বা কাণ্ডজ্ঞান, বিদ্যেবুদ্ধি বা এই বুদ্ধিশুদ্ধি। বিষয় বদলায়, কিন্তু স্টক ফুরোয় না তারাপদ রায়ের। তাঁর লেখাতে প্রসঙ্গ মানেই হাসির সঙ্গ। এমনই এক বর্ণনাভঙ্গি তাঁর যে, পুরনো গল্পও ফুটে ওঠে সদ্যতম হয়ে, নতুন অভিজ্ঞতাকেও মনে হয় চিরকালীন রঙ্গময়। শ্লেষ নয়, জ্বালা নয়, আঘাত নয়, তাঁর লেখার আদ্যন্ত আকর্ষণ—কৌতুকরস। সে-কৌতুকও সূক্ষ্ম এবং সর্বজনভোগ্য। ঝকঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত, বিদ্বেষবর্জিত সরস গল্পের খনি তিনি।
রসিকতা ও হাসির গল্পের স্বভাবলক্ষণ নাকি মহাকাশের ধূমকেতুর মতো। অনেকদিন পরপর ঘুরেফিরে আসে। এই বইতে তেমনই কিছু রসিকতা ও হাসির গল্পকেও সেভাবেই ফিরে পেয়ে আহ্লাদিত বোধ করবেন পাঠককুল। আবার, দূরদর্শন নিয়ে, কথোপকথন নিয়ে, পরিবর্তন নিয়ে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে, পণ্ডিতমশাইদের নিয়ে, দুর্ঘটনা নিয়ে, শৈশব নিয়ে, সাংবাদিকদের নিয়ে, রাতের কলকাতা নিয়ে, খানদান নিয়ে, বিজ্ঞাপন নিয়ে যেসব গল্প ও অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়েছেন এখানে তিনি, তার অধিকাংশই একেবারে তাজা। এমন-কি যেসব বিষয় তাঁর লেখাতে বারবার আসে—প্রেম, দাম্পত্যজীবন, ভুল, উন্মাদ, স্মরণ-বিস্মরণ জাতীয়—সেগুলিকেও এই বইতে নতুন মনে হবে। অধুনালুপ্ত 'অচলপত্র' থেকে উদ্ধার-করা কৌতুককাহিনীগুলি এ-বইয়ের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সেইসঙ্গে, বিদ্যাসাগর, ভাষাতত্ত্ব, রাম, কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ, সাহানা দেবীর 'স্মৃতির খেয়া' প্রভৃতি প্রসঙ্গের লেখাগুলিতেও ফুটে উঠেছে অন্যস্বাদের আকর্ষণ।

ISBN 81-7066-993-6

বুদ্ধিশুদ্ধি ।। তারাপদ রায়

বুদ্ধিশুদ্ধি

তারাপদ রায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯১
পঞ্চম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১০

© মিনতি রায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7066-993-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

BUDDHI SUDDHI
[Humour]
by
Tarapada Roy

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১৫০.০০

রিতা ও আজিজকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

ক খ গ ঘ
কাণ্ডজ্ঞান
কী খবর
কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু
জ্ঞানগম্যি
টমটমপুরের গল্প
দুই মাতালের গল্প ও অন্যান্য
বলাবাহুল্য
বালিশ
ভাগাভাগি
রম্যরচনা ৩৬৫
শোধবোধ
সর্বনাশ
সরস গল্পসমগ্র

সূচী

অবতরণিকা ১
সময় ৪
হায় কবি, তুমি শুধু কবি ৭
চিঠি ১০
দূরদর্শন ১৩
রোগীর বন্ধু ১৬
চিকিৎসা বিভ্রাট ১৯
রসুন ২৩
রসিকতা ২৬
স্বর্গ ২৯
কথোপকথন ৩২
মনের কথা ৩৫
পরিবর্তন ৩৮
বিশ্বাস-অবিশ্বাস ৪১
দুর্ঘটনার আগে ও পরে ৪৪
পণ্ডিত ৪৭
অমল শৈশব ৫০
দুর্ঘটনা ৫৩
সংবাদ সাহিত্য ৫৭
রাতের কলকাতা ৬১
বিদ্যাসাগর ৬৪
পুরানো সেই দিনের কথা ৬৮
সোনার সংসার ৭২
সমস্যা ৭৫
ভুলের মাশুল ৭৯
খান দান ৮৩
মহাজ্ঞানী মহাজন ৮৬
স্বেচ্ছাসেবক ৮৯
বক্তা ও বক্তৃতা ৯৩
আবার বক্তৃতা ৯৬
কথামালার রহস্য সন্ধানে ৯৯
কলিংবেল ১০৩
অমর প্রেম ১০৬
পাগল ১০৯
অসুখ বিসুখ ১১১
উচিত শিক্ষা ১১৪
ঈশ্বর সমীপে ১১৭
শহর থেকে দূরে ১২০
শুভলাভ ১২৪
ব্যবসা বাণিজ্য ১২৭
জীব জগতের আজব কথা ১৩০
তামাক ১৩৩
আবার তামাক ১৩৬
শিক্ষা ১৩৯
সিনেমা সিনেমা ১৪২
রোগী কাহিনী ১৪৯
নরখাদকের কাহিনী ১৫৩
আয় শীত, যায় শীত ১৫৬
ঘটি-বাঙাল ১৫৯
ফেরিওয়ালা ১৬২
চিড়িয়াখানায় ১৬৫
ডিপ্লোম্যাট ১৬৮

গোলমেলে ১৭১
সমান সমান ১৭৪
অকারণে ১৭৭
স্মৃতির খেয়া ১৮০
টাকা মাটি, মাটি টাকা ১৮৩
অচল পত্র ১৮৬
সংসারে সবাই যবে ১৮৯
প্রজাপতির কাহিনী ১৯২
কুৎসিত ১৯৫
স্মরণ বিস্মরণ ১৯৮
গুরু-শিষ্য সংবাদ ২০২
স্বাস্থ্যই সম্পদ ২০৫
সুস্বাস্থ্য ২০৮
দন্তরুচি কৌমুদী ২১১
সচিত্র ভারত ২১৫
নিজেই নিজের কাছে ২১৯
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে ২২২
রাম ও রামকৃষ্ণ ২২৫
কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ ২২৮
ভালবাসা ও টেলিফোন ২৩১
জলবৎ তরলং ২৩৪
রমণী ও রাজনীতি ২৩৭
স্বপ্ন ও রমণী ২৪১
অবাঞ্ছিত আতিশয্য ২৪৫
অসমাপ্ত ২৫০

কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে যে রসরচনামালার আরম্ভ **বুদ্ধিশুদ্ধি** তারই শেষতম সঙ্কলন। দৈনিক কাগজের রবিবারের পাতায় এর অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, বাকি অনেকগুলি সানন্দায় এবং বিভিন্ন পুজোসংখ্যায় ও ক্রোড়পত্রে।

অবতরণিকা

না মহর্ষি ব্যাসদেব অথবা পুণ্যশ্লোক কাশীরাম দাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষীণতম বাসনা এ অধমের নেই।

এ মহাভারত সে মহাভারত নয়। এ শুধু নামের জন্যে নাম। 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে'। অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই তা কোথাও নেই এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে এ নামকরণ নিতান্তই সপ্তাহান্তিক যা ইচ্ছে লেখার খেয়ালখুশির ইজারাদারি। তবুও বলে রাখা ভালো যে মহাভারত সম্পর্কে মহাকবি বলেছিলেন, যে কথাটা সেটা হলো,

'যদিহ্যস্তি তদন্যত্র
যন্নেহ্যস্তি ন কুত্রাচিৎ ॥'

মানে, 'এখানে যা আছে তা অন্য কোথাও থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু যা এখানে নেই তা আর অন্য কোথাও দেখা যাবে না।'

আমার মহাভারত অবশ্য একটু অন্যরকমই হবে। এখানে যা থাকবে তা অন্য কোথাও এমনকি আমার নিজেরই আগের কোনো লেখায় থাকা যথেষ্টই সম্ভব। আর এখানে যা নেই অথবা থাকবে না তার তালিকা রচনা করতে গেলে সে আরেক মহাভারত হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে প্রথমেই কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। পাঠকেরা যথাসময়ে নিজগুণে এবং নিজ বুদ্ধিতে এই তরল এবং সরল মহাভারতের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন।

ধীরে সুস্থে শুরু করি। হালকাভাবেই আরম্ভ করা যাক।

মাস্টারমশাইরা যখন কোনো ক্লাস প্রথম দিন নেন, তাঁরা বিশেষ কিছু পড়ান না। সহজ গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেন। যাতে ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশুনোর ব্যাপারে ভয় না পায়। আমারও এবার তাই উদ্দেশ্য, খুব তাড়াতাড়ি (অথবা বিশেষ বিপাকে না পড়লে) জটিলতার ভিতরে যাওয়ার উদ্দেশ্য নেই। এবং শুধু এবার নয় প্রতিবারই আমার চেষ্টা হবে যতটা তরল ও সরল হওয়া অসম্ভব নয়, অন্তত সেটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকা।

অবতরণিকা দীর্ঘ করে সুবিধে নেই। প্রাচীন প্রবাদ আছে যখন আমরা বিবেচনা করছি কখন কোথায় আরম্ভ করব, সেই বিবেচনা করতে করতে আমাদের সমূহ দেরি হয়ে যায়। এবং আমরা একথাও জানি যে রাস্তার মোড়ে চুপচাপ বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে ভুল রাস্তায় যাওয়াও ঢের ভালো।

সুতরাং ভুল রাস্তা। ভুল সড়ক।

একটা অর্থকরী গল্প দিয়ে ভুল রাস্তায় প্রবেশ করছি।

দুই ভদ্রলোককে রাস্তা থেকে ধরে পুলিস আদালতে সোপর্দ না করে সরাসরি পাগলাগারদে নিয়ে গিয়েছিল। পাগলাগারদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব ভদ্রলোক দুজনকে যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'কিন্তু এঁদের দেখে তো পাগল বলে মনে হচ্ছে না, কোনো মানসিক বিকার দেখছি না।'

পুলিসের যে দারোগাবাবু এঁদের দুজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন, বললেন, 'এঁরা পাগল নয় তো, তবে পাগল কে ?'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন, 'কেন, এঁরা কি করেছেন ?'

দারোগাবাবু বললেন, 'আর কি করবে ?' বলে প্রথম ভদ্রলোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই যে ইনি, ইনি বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটার পর একটা একশো টাকার নোট হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছিলেন,' তারপর দারোগাবাবু দ্বিতীয় ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'আর এর মাথাতো আরো বেশি খারাপ। ইনি সেই একশো টাকার নোটগুলো একটার পর একটা রাস্তা থেকে ছুটে ছুটে কুড়িয়ে এনে ওঁকে ফেরত দিচ্ছিলেন।'

আড়াই টাকা চালের মনের যুগে আমরা জন্মেছি। এখনকার হিসেবে সেই চালের দাম অন্তত দুশো বা আড়াইশো টাকা। অর্থাৎ একশো টাকার আসল দাম এক টাকা বা ঐরকম। পঞ্চাশ বছরে চালের দাম বেড়েছে একশো গুণ, সোনার দাম দুশো গুণ আর বাস্তু জমির দাম হাজার গুণ।

সুতরাং উত্তর পঞ্চাশ কোনো ব্যক্তি যদি হাওয়ায় 'ধুত্তোরি' বলে একশো টাকার নোট উড়িয়ে দেন, আরেকজন যদি সেই টাকা ক্রমাগত ফেরত দিয়ে যান তবে তাঁদের মানসিক বিকারগ্রস্ত বলা উচিত হবে কিনা সে কথা মনোবিজ্ঞানী বা দারোগাবাবুর থেকে অনেক ভালো বলতে পারবেন সমাজবিজ্ঞানী।

আপাতত টাকার কথাতেই থাকি। কথায় আছে, কথায় কথা বাড়ে। টাকায় টাকা বাড়ে। মন্থনে বাড়ে ঘি।

টাকা থাকলেই টাকা হয়। টাকা না থাকলে শুধু টাকা নয়, কিছুই হয় না। কে একজন বলেছিলেন, 'আমি জানি যে পৃথিবীতে টাকার চেয়ে দামী অনেক জিনিস আছে। কিন্তু সেসব টাকা দিয়ে কিনতে হয়।' একদিন ছিল যখন একথা সত্যি ছিল না। তখন বলা

যেতো, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিসগুলো যেমন—আলো, হাওয়া, স্নেহ-ভালোবাসা, ওদের জন্যে কোনো টাকা লাগে না। এগুলো বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। আজকের দিনে একথা মোটেই ঠিক নয়। শীতের সকালে পুবের রোদ ঈশ্বরের বা প্রকৃতির দান। কিংবা দক্ষিণের হাওয়া আজ আর সহজলভ্য নয়। তার জন্য অনেক টাকা সেলামি দিয়ে বহুভাড়ায় ফ্ল্যাট বা বাড়ি সংগ্রহ করতে হয়। আর স্নেহ-ভালোবাসা ? দারিদ্র্য-জর্জর নাগরিক জীবনে সবাই এত স্বার্থপর যে এসবও কেমন অবান্তর, অর্থহীন হয়ে গেছে।

টাকার বিষয়ে দূরদর্শনের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের প্রভাতী অনুষ্ঠানে একটি সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ আছে যার নাম 'মানি ম্যাটারস'। নামটি চমৎকার। নামের মধ্যেই অন্য একটা অর্থ রয়েছে। নামানুযায়ী এর মানে হলো 'টাকা বিষয়ে'। তেমনি একে একটা বাক্য হিসেবে ধরলে এর অর্থ দাঁড়ায়, 'টাকায় আসে যায়', সাদা বাংলায় বলা চলে, 'টাকা ম্যাটার করে।'

শেষে টাকা সংক্রান্ত একটি করুণ কাহিনী বলি। এক দুঃস্থ ভদ্রলোক বিশেষ প্রয়োজনে পড়ে নিজের বাস্তুভিটে বন্ধক দিয়ে ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ নিতে গেছেন। সব শুনে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বললেন, 'আমরা টাকা ধার দিই। অনেক এলেবেলে, গোলমেলে ধারও দিই। কিন্তু বাড়িঘর, জমা রেখে ধার দেয়া খুব কঠিন। আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব হবে না।'

দুঃস্থ ভদ্রলোক বহুরকম ধরাধরি, হাত জোড় ইত্যাদি করাতেও ম্যানেজারের মন সামান্য দ্রবীভূত হলো না। অবশেষে ম্যানেজার বললেন, 'আমি আপনাকে টাকা দিতে পারি, শুধু একটা শর্তে। আমার দুটো চোখের মধ্যে একটা চোখ পাথরের, খুব ভালো পাথরের, কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু আপনি যদি বলতে পারেন, এর মধ্যে কোন্‌টা পাথরের তাহলে আমি আপনাকে টাকা দেব।'

ভদ্রলোক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দুই চোখের দিকে একবার ভালো করে তাকালেন, তারপর একটুও ইতস্তত না করে বললেন, 'স্যার, আপনার ঐ ডান চোখটা পাথরের।'

সঠিক উত্তর পেয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সাহেব বেশ একটু বিস্মিত হয়ে ঋণপ্রার্থী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে বুঝলেন ? অনুমানে বলেননি তো ?'

ঋণপ্রার্থী করজোড়ে বললেন, 'না স্যার। মোটেই অনুমান নয়। আপনার ঐ ডান চোখটায় দেখলাম কিনা একটু করুণা, একটু মায়ামমতা লেগে আছে। তাই বুঝতে পারলাম ওটা আপনার আসল চোখ নয়।'

সময়

সেই জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে আসছি যে সময়টা ভালো নয়। হয় তো আমার এবং আমার বয়সীদের ভাগ্যটাই খারাপ, আমরা জন্মেছিলাম দুর্দিনে। মহাযুদ্ধের ঠিক আগে আগে আর জ্ঞান হয়েছিল দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের মুখোমুখি। তারপরের দাঙ্গা, পার্টিশান হিংসা আর প্রতিহিংসার রক্ত আর কালিমালিপ্ত সেই ছিন্নমূল ইতিহাস তার প্রতিটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি অধ্যায়ে লেখা রয়েছে, বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে 'খারাপ সময়, আরো খারাপ, আরো খারাপ সময়।'

এই দুঃসময় যাকে বলে খারাপ সময় আসল মহাভারতের পাতায় পাতায় তার কথা লেখা আছে। এক অস্থির সময়ের সেই মহাকাব্য জীবনের সব দুর্গতি, সব দুর্ঘটনা আদ্যন্ত বিবৃত হয়েছে। দুঃসময় নয়, আমরা এখানে শুধু সময়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকছি।

প্রথমে একটা রূপকথা বলি।

কলকাতা জি পি ও'র গম্বুজের মাথায় বড় গোল ঘড়িটাকে খুব হিংসে করত এক হাতঘড়ি। সেই হাতঘড়ি যাঁর কবজিতে, তিনি কাজ করতেন ঐ জি পি ও'র পাশেই একটা অফিসে। প্রতিদিন জি পি ও'র পাশে বাস বা মিনিবাস থেকে নেমে তিনি অভ্যাসবশত অন্তত একবার ঘাড় উঁচু করে জি পি ও'র ঘড়িটার সময় দেখে নিতেন। একবার হাতঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে দুটোর সময়ের তারতম্যও হিসেব করতেন।

হাতঘড়িটা এসব পছন্দ করত না। প্রতিদিন সে দেখত যে শুধু তার মালিকই নয়, রাস্তায় অন্য লোকেরাও মাথা তুলে জি পি ও'র ঘড়িটা দেখে নিচ্ছে। খুবই হিংসে হতো হাতঘড়িটার।

এর মধ্যে একদিন হলো কি এক সন্ধ্যাবেলা খুব ভিড়ের বাসে ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে গিয়ে হাতঘড়ির মালিকের কবজি থেকে স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ঘড়িটা ফুটপাথের একপাশে পড়ে গেল, কারো নজরে পড়ল না।

সেদিন অনেক রাতে যখন কেউ কোথাও নেই, অফিসপাড়ার লালদীঘির চারদিক নিঝুম তখন সেই হাতঘড়িটা জি পি ও'র গোল থাম বেয়ে বড় গোল ঘড়িটার চেয়েও অনেক উঁচুতে একদম মিনার চূড়ায় উঠে গেল।

আজকাল সেই হাতঘড়িটা সেখানেই থাকে। অত উঁচুতে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে, কেউ তাকে দেখতে পায় না। কিন্তু যখনই রাস্তার লোকরা মাথা উঁচু করে বড় গোলঘড়িটায় সময় দেখে, সে ভাবে সবাই তাকে দেখছে। সে জানে না তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

এরপর একটা সাদামাটা গল্প মনে পড়ছে। যেমন হয়, একটি মেয়ে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিল, অনুরাগ অনেক দূর গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তার বাবাকে বলে যে সে অমুক ছেলেকে ভালোবাসে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়।

এখন হয়েছে কি, মেয়েটির বাবা হলেন রীতিমত অবস্থাপন্ন, যাকে বলে বড়লোক তাই। তাঁর নিজের ব্যবসা, বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি। তাঁর ছেলেমেয়ের সংখ্যাও যৎসামান্য তিন-চারটি।

আর এদিকে ভাবী পাত্রটি মাত্র দেড় হাজার টাকা মাইনের একটি চাকরি করে, তাও নিতান্ত এক বাংলা খবরের কাগজে।

মেয়ের কথা শুনে বাবা চিন্তান্বিত হলেন, মেয়েকে বললেন, 'এটা তুমি ঠিক করছ না। ঐ ছেলেটি, কি যেন নাম বললে, কি যেন মাইনে পায়! ওতে তো তোমাদের মাসের মধ্যে তিনদিনও যাবে না। বাকি সাতাশদিন কি করবে? উপোস করবে?'

মেয়েটি অনেকক্ষণ নিথর দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তুমি কি মাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলে?'

পিতৃদেব খুব শঙ্কিতভাবে যেন খুব অন্যায় করেছিলেন এইরকম মুখভঙ্গিমা করে বললেন, 'না তো।'

মেয়ে এবার হাতে ট্র্যাম্প কার্ড পেয়ে গেছে, সে বলল, 'তা হলে?' বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'তা হলে?' মেয়ে বলল, 'শোনো। ভালোবাসার ব্যাপার অন্য রকম। তখন সময় কাটে ঝড়ের বেগে। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে একেকটা মাস যাবে একটা দিনের মত। একটা দিনের জন্যে দেড় হাজার টাকা এ বাজারেও কম নয়।'

সময় কিংবা টাকা এ ধরনের হিসেব হয় তো অনেকেই পছন্দ করবেন না। এর চেয়ে কঠিন হিসেব একটা জানি। কেউ হয় তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। কারণ ঘটনাটা আমাদের বাড়িতেই ঘটেছিল।

সামান্য বিশদ করে বলছি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের একটি প্রাচীন দেয়ালঘড়ি আছে। সেটাকে প্রত্যেক রবিবার সকালে দম দেওয়া হয়। ঘড়িটা দেয়ালে প্রায় সাড়ে ছয় ফিট উপরে লাগান। আমি পায়ে বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে কায়ক্লেশে নাগাল পাই কিন্তু

কয়েক বছর আগে একটা মিনিবাসে ডাইনোসর যুগের এক অতিকায় মহিলা চপ্পল পরিহিত আমার বাঁ এবং ডান দু'পায়ের উন্মুক্ত বুড়ো আঙুলকে একসঙ্গে দলিত এবং মথিত করলেন। তারপর থেকে পায়ের পাতায় ভর করে আর দাঁড়াতে পারি না। আমার স্ত্রী তিনি শত চেষ্টা করেও ঘড়ির কাছে পৌঁছতে পারেন না। আমার ভাই, বিজন, সেই এতদিন চাবি দিতো। এখন এখানে নেই। আমার ছেলে এসব কাজ খুবই পছন্দ করে, কিন্তু যতবার সে ঘড়িতে দম দিয়েছে ততবার স্প্রিং কেটে গেছে। সাতবার চাবি ঘোরাতে হয় দম দেয়ার সময়, কিন্তু তাতে তার মন সন্তুষ্ট হয় না। আরো কষে দম দেয়, আর চাবি কেটে যায়। ইতিমধ্যে একটি ছোট ছেলে আমাদের বাড়িতে কাজে লেগেছিল। বয়েসের তুলনায় বেশ লম্বা, চমৎকার হাতে পায় ঘড়িটা। তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। প্রত্যেক রবিবার সকালে, লম্বা রোগা হাত তুলে সে গুণে গুণে পর পর সাতবার খুব নরম আর আলগা করে চাবি দিতো। তাতেই বুড়ো ঘড়িটা সারা সপ্তাহ ঠিক চলত।

এই ছেলেটা, নাম ভৃগুলাল, বছর খানেক কাজ করবার পর একদিন দেশে যাবে। যেদিন সে দেশে যাবে তার আগের দিন ছিল রবিবার, ঘড়িটায় সাপ্তাহিক দম দেবার দিন।

ভৃগুলাল যথারীতি কাজকর্ম করছে। আমি বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। দেখলাম ঘড়িটায় দম দিচ্ছে। কিন্তু মাত্র একপাক দম দিয়েই সে থেমে গেল। আমি ভাবলাম ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? স্প্রিংটা কি আটকিয়ে গেছে? আমি বললাম, 'কিরে ভৃগুলাল, চাবিটা কি আটকে গেল? একবার মাত্র দম দিলি কেন?' ভৃগুলাল নির্বিকার গম্ভীরমুখে বলল, 'আমি তো আর কাল থেকে থাকছি না। তাই শুধু আজকের দিনের জন্য দমটুকু দিলাম।'

সবাই অবশ্য আমাদের ভৃগুলালের মত সময়-সচেতন নয়। সময় বিষয়ে একেকজন একেকরকমভাবে ভাবনা করে। অনেকদিন আগে এক আধুনিক বাঙালি কবি লিখেছিলেন, 'ঘড়িটা হঠাৎ কেন থেমে যায়?'

'তোমরা কোথায়?'

ঘড়ি হলো সময়ের প্রতীক। সে কারো কথায় থামে না বা চলে না। সে চলে তার নিজস্ব, নির্দিষ্ট গতিতে। নদীর স্রোতের জোয়ার-ভাঁটা, উঠতি-পড়তি, কম-বেশি গতি আছে। কিন্তু সময় চিরকাল সমগতি। সে কারো জন্যে কোথাও ছুটে যায় না, কারো জন্যে কোথাও অপেক্ষাও করে না।

পুনশ্চ: কয়েকদিন আগে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম হরিণদের নানারকম কাঁচা তরকারি কুটে খেতে দেয়া হয়েছে। যে লোকটা খাবার দিচ্ছিল তাকে বললাম, 'তরকারিগুলো সেদ্ধ করে দিলে হরিণদের তাড়াতাড়ি হজম হতো।' সে লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এসব জন্তু জানোয়ারের সময়ের কোনো অভাব নেই। একটু দেরি করে হজম হলে এদের কোনো অসুবিধা হবে না।'

হায় কবি, তুমি শুধু কবি

ছন্দের খাতিরে এবং একটি ভালো চুরি করার লোভে এই নিবন্ধের নামকরণেই কেমন গোলমাল হয়ে গেল ।

আসলে কোনো কবিই শুধু কবি নন । তিনি চাকুরীজীবী, সাংবাদিক বা অধ্যাপক, শখ করে কিংবা প্রাণের তাগিদে কিংবা তেমন তেমন ক্ষেত্রে সম্পাদকের তাগিদে মাঝে মধ্যে কবিতা রচনা করে থাকেন ।

সব সময় কবিতা লেখা বা কবিতা আওড়ানো, কাব্যসাগরে নিমজ্জিত হয়ে থাকা অথবা সদা সর্বদা পদ্যের সৌরভে মশগুল হয়ে থাকা এ সবই এক ধরনের পাগলামি, মোটেই কবিত্বের লক্ষণ নয় । এ ধরনের লেখককে সবাই যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে ।

শুধু কবি হওয়া কঠিন । অন্তত এদেশে কঠিন, কোনো জীবিকা হওয়া সম্ভব নয় । কবিতা লিখে জীবন ধারণ, সংসার প্রতিপালন,গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত, শুধুমাত্র কবিতা লিখে অসম্ভব । একটা সাধারণ কবিতার বইয়ের দাম বড় জোর দশ টাকা । সবচেয়ে জনপ্রিয় বইটি যদি বছরে তিনটি সংস্করণও হয় তবে তাঁর যা রয়ালটি প্রকাশক দেবেন (অবশ্য যদি দেন) সেটা যে কোনো অফিসের নিম্নতম কর্মচারীর বার্ষিক বেতনের এক তৃতীয়াংশ । যে কোনো নামকরা ডাক্তার বা উকিলের একবেলার আয়ের চেয়েও হয়তো কম ।

কবির আলোচনায় টাকা-পয়সা ডেকে আনা মোটেই উচিত হলো না। আর তা ছাড়া, এতো উচ্চমার্গের আলোচনা সঠিক হচ্ছে না।

কবিতার ও কবির বিষয়ে আলোচনার সঠিক পটভূমিকা হলো, লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ। অতঃপর আমরা সেই হাসি হাসি গন্ধের পৃথিবীতে প্রবেশ করছি।

একবার এক তরুণ কবি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখুন, সম্পাদকেরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।' এ রকম কথা অনেকের কাছ থেকে অনেকদিন ধরেই শুনছি, তবু ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন ?' তিনি বললেন, 'ষড়যন্ত্র না হলে আমার একই কবিতা পরপর সাতজন সম্পাদক ফেরত দেন।'

অন্য এক কবির বিয়ের ব্যাপারে একটা অত্যন্ত জটিল গল্প শুনেছিলাম। ঠিক বিয়ে নয়, বিয়ের আগের ব্যাপার। বিয়ে তখন প্রায় ঠিক হওয়ার পর্যায়ে এসেছে, এই সময় তরুণ কবি তাঁর প্রেমিকাকে খুব আশা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আমি যে কবিতা লিখি সে কথাটা তুমি তোমার বাড়ির লোকদের বলেছ ?'

কবির ধারণা কন্যাপক্ষের অর্থাৎ তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর কবিপ্রতিভার কথা জানলে নিশ্চয় গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কবিপ্রেমিকা যা বললেন সে নিতান্ত ভয়াবহ। প্রেমিকা বললেন, 'দ্যাখো আমি সব আস্তে আস্তে ভাঙছি। অল্প অল্প করে মা-বাবাকে সব বোঝাতে হচ্ছে। সব ধীরে ধীরে খুলে বলছি।' কবি একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'কি ধীরে ধীরে খুলে বলছ ? ব্যাপারটা কি ?'

প্রেমিকাটি বললেন, 'দ্যাখো রাগ করবে না। সব কথা একবারে বললে আমাদের বিয়েটা হয়তো ভেঙেও যেতে পারে। তুমি যে জুয়ো খেলো, তুমি যে মাঝে মধ্যে মদ খাও, তুমি যে এখনো বি· এ· পাশ করতে পারোনি এগুলো আস্তে আস্তে বলেছি। তবে তুমি যে কবিতাও লেখো একথাটা বলার সাহস পাইনি এখন পর্যন্ত। একদিন অবস্থা বুঝে সময়মত বলব।'

এই প্রেমিকাটি শেষ পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে তাঁর দয়িতের কাব্যচর্চার কথা বলেছিল কিনা এবং সত্যিই জুয়োখেলা কিংবা মদ্যপানের চেয়েও কবিতা লেখা খারাপ কিনা আমরা সে অগ্নিগর্ভ আলোচনায় প্রবেশ করব না।

তবে সেই ওমর খৈয়াম কিংবা তারো অনেক আগে শুরু হয়েছে ; মাইকেল মধুসূদন থেকে ডিলান টমাস ছুঁয়ে এই কবিপ্রধান কলকাতা শহরের খালাসিটোলা-বারদুয়ারিতে কবিতার সঙ্গে মদিরা, মদিরার সঙ্গে কবিতা অনেকদিন একাকার হয়ে গেছে।

শুধু মদ্যপান নয়, যেন জীবনযাপনে বিশৃঙ্খলা কবিত্বের প্রধান উপাদান—এই রকম ধারণা অনেকের ; অনেক কবি যশোপ্রার্থীর। বীট প্রজন্মের কবিদের উল্লেখ বা অনুসরণ করে অনেক আধাকবিই বিশৃঙ্খলতার সপক্ষে একটা যুক্তি খুঁজে নেন। এতে কারো কোনো ক্ষতি বা লাভ হয় না, শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হন সেই ব্যক্তি—যিনি কি চাইছেন বা কি করছেন সেটা জানেন না।

শুনেছি কোনো এক পাড়ার এক বড়দা এক নাবালক মাতাল আধা কবিকে ড্রেন থেকে তুলে মাঘ মাসের মধ্যরাতে টিউবওয়েলের নিচে শুইয়ে স্নান করাতে করাতে বলেছিলেন, 'অমুকদার কাছে মদ খাওয়াটা শিখলি, কবিতা লেখাটা শিখতে পারলি না। কবিতা যা লিখিস তাতে তোর চা খাওয়ারও যোগ্যতা নেই।'

সকলেই কবি না, কেউ কেউ অকবি। যার কবিতা লেখা হবে, মদ খেলেও হবে, মদ না

খেলেও হবে, ফুটপাথে বা ড্রেনে পড়ে থাকলেও হবে, ঘরে শুলেও হবে।

বোধহয় এসব গূঢ় চিন্তা করেই সেই বহু বিদিত গ্রীক দার্শনিক তাঁর আদর্শ কল্পরাজ্যের থেকে কবিদের নির্বাসনের চিন্তা করেছিলেন। এরও চারশো বছর পরে মহাকবি ভার্জিলের পরম সুহৃদ স্যাটায়ার রচনার জনক কবি হোরাস (হেরোটিয়াস) কবিদের এক বিরক্তিকর প্রজাতি বলে অভিহিত করেছিলেন।

আমি এ বিষয়ে এই হালকা রচনায় মাথা গলাবো না। দু একজন বিপজ্জনক কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাই ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। বরং দু একটা পুরনো গল্প স্মরণ করি।

বড় ভাই উঠতি কবি, তার বয়েস একুশ। রাত দিন পাতার পর পাতা ছাইভস্ম ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে যাচ্ছে। তার লেখাপড়া চুলোয় গেছে, এমনকি নাওয়া খাওয়ার পর্যন্ত ঠিক নেই। সারাদিন মনের আবেগে খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখে যাচ্ছে আর নিজের কবিতা আওড়াচ্ছে।

দাদা, মানে এই কবি বড়ভাই বাথরুমে গেছে। তার নিচে আরো এক ভাই, এক বোন আছে। ভাইয়ের বয়েস বছর বারো আর বোন ছোট, চার-পাঁচ বছর বয়েস হবে।

ছোট বোনটি, নাম ঐ খুকু, একটু চঞ্চলা স্বভাবের, এ বয়সের মেয়েরা যেমন হয়। হঠাৎ মেজো ভাই দেখল বোনটি দাদার কবিতার খাতাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে উনুনের মধ্যে ঢেলে দিয়ে এল। মা তখন রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘরে কুটনো কাটছিলেন, ভাই ছুটে গিয়ে সেখানে নালিশ জানালো, 'মা, তাড়াতাড়ি এসো, সর্বনাশ হয়েছে, খুকু এইমাত্র দাদার কবিতার খাতা উনুনে আগুনের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে।' মা-র মধ্যে কিন্তু ভাবান্তর দেখা গেল না, তিনি বললেন, 'সেকি। খুকু এরই মধ্যে কি পড়তে শিখেছে ?'

শেষ গল্পটি তিরিশ বছরের পুরনো। তখনকার এক দুর্দান্ত ও দুর্মদ কবিকে মধ্যরাতে পুলিস রাস্তায় মাতলামি করার অজুহাতে থানায় নিয়ে এল। রাতটা থানার লক আপে কাটল। পরদিন সকালে, সেই থানায় যে বড়বাবু তিনি আবার পুলিশ হলেও খুব নীতিবাগীশ, কবিকে ছেড়ে দেবার আগে একচোট উপদেশ দিলেন। অবশেষে মদ্যপানের বিরুদ্ধে একটা উদাহরণ দিয়ে কবিকে বললেন, 'আচ্ছা, এখানে যদি এক গামলা জল আর এক গামলা হুইস্কি রাখি, তারপর একটা গরুকে নিয়ে আসি, সে কোনটা খাবে ?'

এই অবান্তর প্রশ্নে কবি চুপ করে থাকায় বড়বাবু নিজেই প্রাঞ্জল হলেন, বললেন, 'বুঝলেন মশায়, সে আপনার মতো ঐ মদটা খেতে যাবে না, স্বাভাবিক ভাবেই সে জলটা খাবে।'

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পরে কবি এবারে মুখ খুললেন, দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'হ্যাঁ সেইজন্যেই সে গরু, আর আমি কবি।'

চিঠি

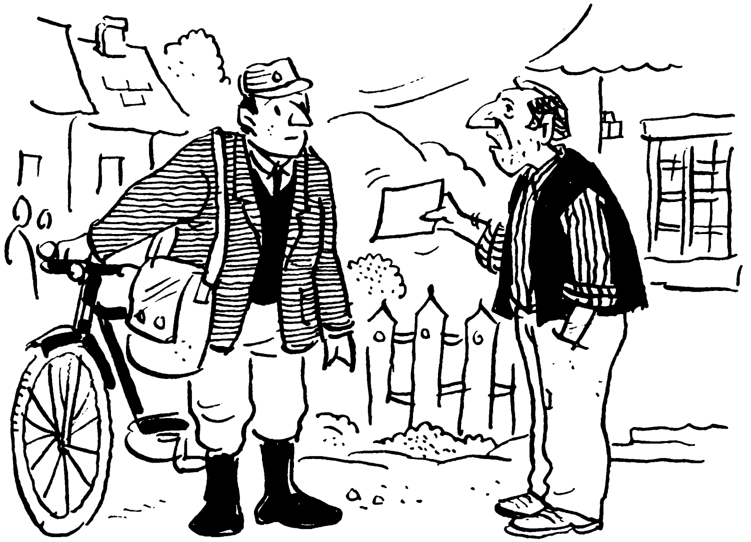

একটা মজার গল্প আছে এই যে একজন সরল ব্যক্তি ডাকটিকিটের দাম বেড়ে যাচ্ছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে বহু টাকার ডাকটিকিট কিনে ফেলে। এটা নিতান্তই খুব বোকামির গল্প। কিন্তু প্রত্যেক বছরই ফেব্রুয়ারি মাসটা সাধারণ মানুষের কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটে। কারণ সামনে থাকে বাজেট। বাজেটে প্রত্যেক বছরই কিছু কিছু দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। ক্রমবর্ধমান সরকারি খরচ জোগাতে সরকার কোনো জিনিসের উপর শুল্ক বাড়িয়ে দেন। কোথাও প্রত্যক্ষ কর বাড়ান। কখনও রেল মাসুল বাড়ে। কখনও ডাক মাসুলের হার বেড়ে যায়।

ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে খবরের কাগজের ফাঁকে ফাঁকে সংবাদ থাকে, রেল ভাড়া সম্ভবত আরও বাড়ছে কিংবা ডাক টিকিটের দাম চড়ে যাচ্ছে। অথবা আয়করের হার বদল হচ্ছে না। হলে বেশির দিকে হচ্ছে।

এবার আরও নানা রকম বৃদ্ধির সঙ্গে সংবাদ আছে যে ডাকমাসুল বাড়বে। পোস্টকার্ডের হয়তো বাড়বে না, কিন্তু অন্তর্দেশিয় অর্থাৎ ইনল্যান্ড থেকে খাম ইত্যাদির দাম বাড়ছে। দু'এক বছর অন্তর ঘুরে ঘুরে এককেটা আইটেমের মাসুল অল্প অল্প করে বেড়ে যায়।

আমাদের অল্প বয়সে একটা পোস্টকার্ডের দাম ছিল তিন পয়সা। দু'পয়সা দামে লোকাল পোস্টকার্ড বলে একটা বস্তু ছিল। তখন টেলিফোনের এত চল হয়নি, ঘরে ঘরে

ফোন বাজতো না। জীবনে এত ব্যস্ততাও ছিল না। কলকাতার মত বড় শহরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যোগাযোগ করতে গেলে একটা দু'পয়সার লোকাল পোস্টকার্ডেই হয়ে যেতো।

আনুপাতিক হারে এখন পোস্টকার্ডের দাম তিনগুণ বেড়েছে সে জায়গায় খামের দাম বেড়েছে পাঁচগুণ। আগে ইনল্যান্ড ছিল না, কিন্তু খামের দাম ছিল পোস্টকার্ডের দ্বিগুণ, দু'পয়সা বা দেড় আনা। সেই দাম বাড়তে বাড়তে এ বছর না হলেও খুব শিগগিরই একটাকায় উঠবে।

ডাক ব্যবস্থা কবে, কোন দেশে প্রথম চালু হয়েছিল, প্রাচীন ভারতে ডাক ব্যবস্থা ছিল কিনা, কি করে চিঠির আদানপ্রদান হতো— এগুলো সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠার প্রবন্ধকারদের প্রিয় বিষয়। ইতিহাসে যতদূর দেখা যায়, ভারতবর্ষে সম্রাট শেরশাহের আমলে ঘোড়ায় করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিঠিপত্রের বিলিব্যবস্থা কিছুটা শুরু করা হয়। সম্ভবত সে সবই ছিল রাজকীয় আদেশনামা অথবা রাজপুরুষদের ব্যক্তিগত পত্র বিনিময়। সে যা হোক একটি অবিস্মরণীয় রসিকতা আছে মহাত্মা শিবরাম চক্রবর্তীর। কোন একটি ছেলে নাকি ইস্কুলের পরীক্ষার খাতায় লিখেছিল, 'শেরশাহ সর্বপ্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। ইহার পূর্বে ঘোড়া ডাকিতে পারিতো না।'

বলা বাহুল্য, পরীক্ষার্থীটি ডাক শব্দের অর্থ ঘুলিয়ে ফেলেছিল। সে যা হোক, আধুনিক যুগে বিলেতে যখন প্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু হয় তখন ডাকমাসুল অত্যন্ত চড়া ছিল। তখন সেই প্রথম যুগে যে চিঠিপত্র লিখতো সে নয়, যার কাছে চিঠি যেতো তাকে মাসুল দিয়ে চিঠি ছাড়াতে হতো, অনেকটা একালের বেয়ারিং চিঠির মতো।

সেই সময় এক কর্তা ব্যক্তি দেখেছিলেন যে এক দুঃস্থ পরিবারে ডাক পিয়ন একটা চিঠি নিয়ে এল। তারা চিঠিটা হাতে নিয়ে একটু দেখে সেটা পিয়নকে ফেরত দিয়ে দেয়। ভদ্রলোকের কৌতূহল হওয়াতে তিনি পিয়নের কাছ থেকে চিঠিটা চেয়ে নিয়ে দেখেন সেটা সাদা, তাতে কিছু লেখা নেই। তিনি তখন ঐ পরিবারটির কাছে জানতে চান যে এর অর্থ কি? কেনই বা এরকম সাদা চিঠি এল, আর কেনই বা তারা সেটা না নিয়ে ফেরত দিয়ে দিল।

তখন জানা গেল যে এদের ছেলে অনেক দূরে থাকে। ডাক মাসুল দিয়ে চিঠি ছাড়ানোর মত আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই। এদের ছেলেকে বলা আছে সাদা চিঠি পাঠাতে যাতে সেটা দেখলেই এরা বুঝতে পারে যে সে ভালো আছে।

ঘটনাটি সেই কর্তাব্যক্তির হৃদয় স্পর্শ করেছিল, তিনি ডাকমাসুলের হার কমানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ডাকব্যবস্থা আদরিদ্র সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

এ সব দৃশ্য চোখে পড়ার মত কর্তাব্যক্তি আজকাল বিরল। তাই শুধু ডাকের মাসুল নয়, নুন-তেল-কেরোসিন-ওষুধের দাম প্রতিনিয়ত নির্বিচারে বেড়ে যায়, কখনও কখনও সরকার নিজেই চড়া হারে কর বা শুল্ক বসিয়ে সেটা বাড়ান। আর তাছাড়া নুনের বা অন্য যে কোনো জিনিসের দাম বাড়ানোর জন্যে তার উপরেই কর বসাতে হবে এমন কথা নেই, নুন যে গাড়িতে আসে সেই গাড়ির পেট্রলের দাম বাড়ালেই নুনের দাম বাড়বে।

এ সব কথা সবাই এখন বোঝে। বরং চিঠির কথায় থাকি। চিঠি কবিদের খুব প্রিয়

বিষয়। বহু স্মরণীয় রোমান্টিক কবিতার বিষয় হলো চিঠি। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতও একধরনের পত্রকাব্য। মেঘকে দূত করে বিরহী যক্ষ তার মারফৎ প্রেমিকাকে চিঠি পাঠাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের সেই বৃদ্ধ বয়সে লেখা (কবির বয়েস তখন পঁচাত্তর) 'নিমন্ত্রণ' নামে অতুলনীয় প্রেমের কবিতাটি স্মরণীয়। সেই কবিতায় কবি চিঠি লিখেছিলেন অতীত যুগের এক নায়িকাকে যার বয়স ষোলো, যার পরণে ডুরে শাড়ি এবং সে যে কে তাকে নিয়ে কবির মনে সংশয় আছে,

'লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে,...
...কোন দূর যুগে তারিখ ইহার কবে ?...'

তবে এ চিঠির সবচেয়ে বড় কথা, এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়, আর এই কবিতার প্রথমেই রয়েছে সেই বিখ্যাত চার পংক্তি,

'মনে পড়ে যেন এক কালে লিখিতাম
চিঠিতে তোমারে 'প্রেয়সী' অথবা 'প্রিয়ে'।
একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম—
থাক্ সে কথায়, লিখি বিনা নাম দিয়ে।'

★ ★ ★

কবিতার পরে গোপাল ভাঁড়। একটু বেমানান মনে হচ্ছে। রম্যরচনার খাতিরে তা হোক।

গোপাল ভাঁড়ের গল্পটা চিঠি লেখা নিয়ে। এক ব্যক্তির হাতের লেখা খুব খারাপ। তাকে পাড়ার এক বৃদ্ধা একটা চিঠি লিখে দিতে বলেছেন। সে জবাব দিল, 'আমার পা ভেঙে গেছে, আমি চিঠি লিখতে পারব না।' বৃদ্ধা বললেন, 'তুমি চিঠি লিখবে হাত দিয়ে। পা ভাঙার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?' সে বলল, 'চিঠি যে লিখব, গিয়ে পড়ে দিয়ে আসবে কে ? আমি ছাড়া আর কেউ তো আমার চিঠি পড়তে পারবে না।'

এর পরের চিঠি লেখার গল্পটা পোস্টাফিসে। এক ভদ্রলোক কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একটা চিঠি লিখছিলেন, হঠাৎ এক জায়গায় লিখলেন, 'আমার পিছনে একটা মোটামত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে যা লিখছি, তাই উঁকি দিয়ে পড়ছে।' সঙ্গে সঙ্গে পিছনে গর্জন শোনা গেল, 'মিথ্যা কথা। আমি কিছু পড়ছি না।' এবং এর পরে পিছন থেকে একটা ছায়া সরে গেল। ঐ চিঠিতে এর পরের লাইন, 'বাঁচা গেল। লোকটা চলে গেছে।'

পুনশ্চঃ

একটি ক্ষুদ্র নাটিকা।

একজন বয়স্ক ব্যক্তি মাদুরের উপর বসে রয়েছেন। তাঁর সামনে একটি ছোট মেয়ে কাগজ-কলম নিয়ে আঁকিবুকি করছে।

বয়স্ক ব্যক্তি : এ সব কি করছ ?

ছোট মেয়ে : চিঠি লিখছি।

বয়স্ক ব্যক্তি : তুমি তো লিখতে পড়তেই জানো না। চিঠি আবার কি লিখবে ?

ছোট মেয়ে : আমি যাকে চিঠি লিখছি, সেও মোটেই লেখাপড়া জানে না।

দূরদর্শন

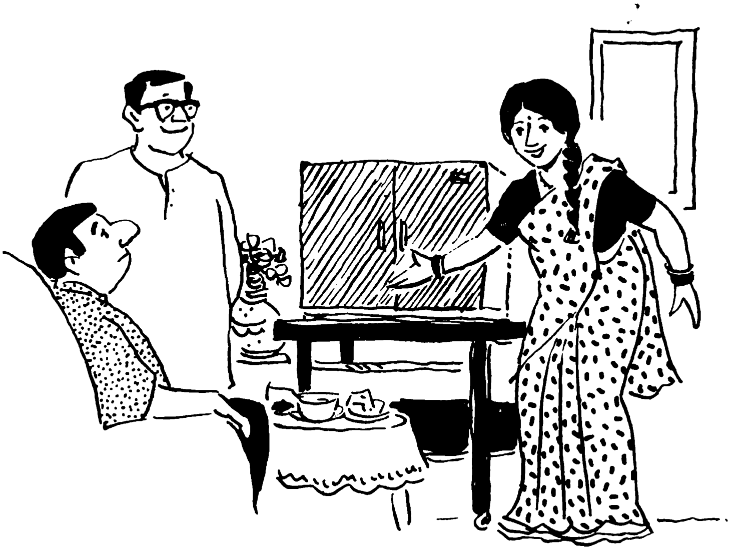

পুণ্যশ্লোক মহাত্মা শিবরাম চক্রবর্তীকে স্মরণ করে আবার মহাভারতে ফিরে আসছি। এবারের আলোচ্য বিষয় দূরদর্শন। আমি এ যাবত মহাভারতে এবং অন্যত্র সংখ্যাতীত বিষয়ে উল্টোপাল্টা অনেক কিছু লিখেছি কিন্তু দূরদর্শনকে এড়িয়ে গেছি। কেন এড়িয়ে গেছি, সেটা বলা কঠিন। কখনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা এমনকি হাসিঠাট্টা করার কথাও দূরদর্শনকে নিয়ে সেভাবে ভাবিনি।

সে যা হোক আগে শিবরাম চক্রবর্তীর কথাটা বলি। এটা সেই সময়ের কথা যখন আমাদের এই দেশে দূরদর্শন চালু করা হবে কিনা এনিয়ে গভীর তর্ক-বিতর্ক চলছে পার্লামেন্টে, খবরের কাগজে, বুদ্ধিজীবী মহলে। সেই সময়ে তাঁর সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক কলম 'অল্পবিস্তরে' শিবরাম চক্রবর্তী একটা মর্মান্তিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। শেক্সপীয়ার সাহেবের নাটকের সেই প্রবাদপ্রতিম অবিস্মরণীয় উক্তি, 'টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইস্ দ্য কোশ্চেন' (To be or not to be that is the question) তিনি একটু ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্নটা ছিল, 'টিভি অর নট টিভি দ্যাট ইস্ দ্য কোশ্চেন' (TV or not TV that is the question)। সেদিনের প্রেক্ষাপটে এই রসিকতা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

ঐ সময়েই এক বিখ্যাত কার্টুনিস্ট, খুব সম্ভব লক্ষ্মণ। (রশিপুরম কে লক্ষ্মণ ছাড়া আর কেই বা এরকম ছবি আঁকবেন)। দুই ভিখিরির ছবি এঁকেছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে সেই

সময়ে ভারতের আণবিক বোমা বানানো উচিত অথবা প্রয়োজন কিনা, এনিয়েও বেশ আলোচনা আর সোরগোল চলছিল, দেশে এবং দেশের বাইরেও নানাস্থানে।

লক্ষ্মণের কার্টুনের উক্ত ভিখিরিদ্বয়, শতচ্ছিন্ন পোশাক তাদের পরনে, তারা ভিক্ষার থালা সামনে নিয়ে ফুটপাথে বসে রয়েছে আর রাস্তার পাশের একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দু'জনে গভীর মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করছে, আগে এ্যাটম বোমা না আগে দূরদর্শন, ভারতের কোন্‌টা আগে চাই—এই ছিল কার্টুনের ছবিটা।

বোধহয় ভারতের মতো ভিখিরি দেশের পক্ষে দূরদর্শন ব্যবস্থা চালু করা আর আণবিক বোমা তৈরি করা দুটোই যে চূড়ান্ত বিলাসিতা, ভিখিরির আকাশকুসুম স্বপ্ন এই কার্টুনের এক খোঁচায় শ্রীযুক্ত রশিপুরম কে লক্ষ্মণ আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন।

খোঁচা থাক। এবার দূরদর্শন সংক্রান্ত একটা সোজা গল্পে যাই। ইস্কুলের ক্লাসের গল্প।

এক শিক্ষক তাঁর এক ছাত্রকে প্রশ্ন করেছেন, ব্রিটিশ চ্যানেল কোথায়? ছাত্রটি বলল, 'স্যার, আমাদের মাত্র দুটো চ্যানেল, কলকাতা আর দিল্লি, তাও কলকাতার দ্বিতীয় চ্যানেল মাত্র সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পাওয়া যায়। ব্রিটিশ চ্যানেল বিষয়ে আমি বলতে পারব্‌ না।'

এই কিশোর তার শিক্ষককে যা বলেছিল তা ঠিকই আছে, কিন্তু তার মাতৃদেবী আমাকে যা বলেছিলেন সেটা অবিশ্বাস্য।

তখন একাধিক গোয়েন্দা কাহিনী দূরদর্শনে হচ্ছে। দুটো বাংলা, একটা হিন্দি, একটা ইংরেজি। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে বাড়িতে আমার কিসের একটা যেন নিমন্ত্রণ ছিল। কি জন্যে আমি যেন একটু আগে চলে গিয়েছিলাম। গৃহস্বামিনী বাইরের ঘরের সোফায় বসে টিভিতে একটা গা ছমছম করা হত্যাকাহিনী দেখতে দেখতে অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

আমিই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রথম গিয়েছিলাম। আমি বাড়িতে ঢুকতে তিনি ভদ্রতাবশত টিভি বন্ধ করে দিলেন। আমি সৌজন্যমূলক প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও।

সে তো হলো, কিন্তু এরপর ভদ্রমহিলা যা করলেন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। টিভির নব্‌টা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার পরে তিনি তাঁর শাড়ির আঁচল দিয়ে সেই নব্‌টা খুব যত্ন করে সম্পূর্ণ মুছলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'খুনখারাপি গোয়েন্দা গল্প টিভিতে দেখে দেখে এমন হয়ে গেছে যে যখনই টিভিটা বন্ধ করি, হাতের আঙুলের ছাপটা যত্ন নিয়ে নব থেকে মুছে দেই।'

টিভির প্রথম যুগে বিলেত-আমেরিকায় একে ইডিয়ট-বক্স অর্থাৎ বোকার বাক্স বলা হতো। এক সাংবাদিক বক্র রসিকতা করে বলেছিলেন যে, 'মাথাধরা জিনিসটা যে ঠিক কিরকম দেখতে টিভির বাক্স দেখার পর সেটা বুঝতে পারলাম।'

আমাদের দেশেও টিভি সম্পর্কে সাধারণ দর্শক এরচেয়ে খুব উচ্চমানের কিছু ভাবেন না। অনেক ক্ষেত্রেই দূরদর্শনের প্রোগ্রামের মান পাড়ার ক্লাবের সামান্য অনুষ্ঠানের চেয়েও উঁচু নয়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে টিভি খুলতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আজকে দূরদর্শনে ভালো কি আছে?' বন্ধুকন্যা সাবালিকা, সেই টিভিটা খুলেছিল, প্রোগ্রামটা একনজর দেখে নিয়ে টিভিটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিলে। সুইচটা অফ করে

দিয়ে, টিভির সাটারটা টেনে বন্ধ করে গম্ভীর মুখে মেয়েটি বলল, 'টিভিতে সবচেয়ে ভালো হলো এই অফ সুইচটা আর এই বন্ধ করার সাটারটা।'

অবশ্য এর চেয়েও বিপজ্জনক কথা আমার এক সহকর্মীর কাছে শুনেছিলাম। তিনি আমার কাছে মাঝেমধ্যেই অফিসে বসে দূরদর্শনের খারাপ প্রোগ্রাম নিয়ে গজগজ করতেন। হঠাৎ একদিন এসে বললেন, 'দূরদর্শনের প্রোগ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কালকে তো খুবই ভালো প্রোগ্রাম দেখলাম।' কি প্রোগ্রাম জানবার আগেই উপরওলার ঘরে আমার ডাক পড়ল, তারপর সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে সেটা আর জানাই হলো না।

পরের দিন ঘটল বিপরীত কাণ্ড। ভদ্রলোক অফিসে ঢুকেই আবার দূরদর্শনের প্রোগ্রাম নিয়ে বেশ কটূক্তি করতে লাগলেন। আগের দিনের কথা আমার মনে ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'কেন কালকেই যে বললেন, দূরদর্শনের প্রোগ্রামের কী সব উন্নতি হয়েছে।'

ভদ্রলোক থমকে গেলেন, তারপর বললেন, 'কালকে আমার একটা ভুল হয়েছিল।' আমি বললাম, 'কাল কি ভুল হয়েছিল?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ভুলটা ঠিক কালকে হয়নি। ভুলটা হয়েছিল পরশুদিন।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকায় এবার সহকর্মী ভদ্রলোক ব্যাখ্যা করে বললেন, 'বুঝলেন কিনা। পরশুদিন দুপুরে আমার স্ত্রী বাইরের ঘরটা গুছিয়েছিলেন। চেয়ার-টেবিল একটু এদিক-ওদিক করে সাজিয়েছিলেন আর কি। আমি তো তখন অফিসে তাই আমি কিছু জানি না। আমাদের একটা রঙিন মাছের এ্যাকোরিয়াম মানে কাচের বাক্স আছে। আমার স্ত্রী টিভিটাকে সরিয়ে সেখানে ঐ মাছের বাক্সটা বসিয়েছিলেন। আর সারা সন্ধ্যা সেই এ্যাকোরিয়াম দেখে আমি ভেবেছি নতুন প্রোগ্রাম। তারপর গতকালও সেই একই প্রোগ্রাম হতে দেখে আমার ভুল ভাঙল। বুঝলাম এটা টিভি নয়।'

পুনশ্চ :

প্রাণাধিকা পাঠিকা,

একটি সামান্য প্রশ্নের জবাব দিন। বলুন দেখি, একটা টিভিসেটের সঙ্গে খবরের কাগজের তফাৎ কি?

জানি, এ প্রশ্নের জন্য আপনি খুব ভাবছেন এবং আপনার জিহ্বায় এর সাতরকম জবাব এই মুহূর্তে জমা হয়েছে।

ঠিক আছে, শুধু আমার জবাবটা ঐ সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি। জবাবটা খুব সোজা, খবরের কাগজ দিয়ে ঠোঙা বানানো যায়, কিন্তু টিভিসেট দিয়ে ঠোঙা বানানো যায় না।

রোগীর বন্ধু

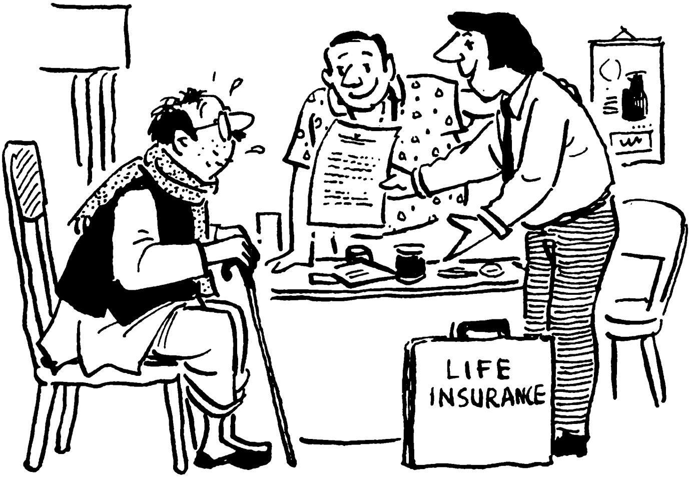

রবীন্দ্রনাথের রোগীর বন্ধু প্রহসনের দুঃখীরাম ডাক্তার ছিলেন না। তিনি রোগীর বন্ধুও ছিলেন না। শুধু রোগী কেন, ডাক্তারদেরও তিনি শত্রুতা করেছেন।

দুঃখীরামের মতে, 'অ্যালোপ্যাথরা তো বিষ খাওয়ায়। ব্যামোর চেয়ে ওষুধ ভয়ানক। যমের চেয়ে ডাক্তারকে ডরাই।' আর, 'হোমিওপ্যাথি তো শুধু জলের ব্যবস্থা।' এবং বদ্যি দেখানোর চেয়ে দুঃখীরামের মতে, 'খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে খান না কেন?'

দুঃখীরামবাবুর প্রতি আমার নিজস্ব মনোভাব সদয় নয়। তিনি ডাক্তারদের অপবাদ দেন, রোগীকে অযথা ভয় দেখান। কিন্তু কালক্রমে, দৈবের অদৃশ্য লিখনে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আরেক দুঃখীরাম হয়ে উঠেছি।

হয়তো কোনো রোগী বা অসুস্থ ব্যক্তিকে মৃত্যুভয় দেখানোর মতো অমানুষ আমি নই কিন্তু সেই কবে থেকে আমি ডাক্তারবাবুদের অপবাদ দিয়ে যাচ্ছি, তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করছি তাঁরা যে আজও আমি অসুস্থ হলে আমাকে দেখতে আসেন, ওষুধের দোকানি আজও আমাকে ওষুধ দেন সেটাই আশ্চর্য।

অথচ ভালো ডাক্তার দেশে যে নেই তাতো নয়। আমি এক ডাক্তারবাবুকে জানি কঠিন রোগগ্রস্ত আমার এক আত্মীয়কে যিনি চিকিৎসা করছিলেন। সেই মহিলা একটি অনারোগ্য

অসুখে ভুগছিলেন, তিনি জানতেন, (তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন), তিনি বুঝেছিলেন এই অসুখই তাঁর কাল, তবু স্বাভাবিক দুর্বলতাবশত তিনি ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর পরমায়ু কত ? তিনি আর কতদিন বাঁচবেন ?

ডাক্তারবাবু ভালো লোক, সৎ লোক। একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'আপনি কি টিভিতে কোনো নতুন সিরিয়াল দেখছেন ?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি কোনো রবিবাসরীয় বা সাময়িক পত্রিকায় কোনো ধারাবাহিক লেখা পড়তে আরম্ভ করেছেন ?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'এটা ঠিক করেননি। আর কোনো নতুন ধারাবাহিক সিরিয়াল দেখা বা ধারাবাহিক লেখা পড়া আরম্ভ করা উচিত হবে না।' ডাক্তারবাবুর বক্তব্য পরিষ্কার হলেও, ঐ মহিলার পক্ষে ভালো নয়। ডাক্তারবাবুর মতে একটা ধারাবাহিক যতদিন চলবে ততদিন পর্যন্ত মহিলার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়। চিকিৎসকেরা অনেক সময় এ জাতীয় প্রশ্নে নিষ্ঠুর জবাব যে দেন না তা নয়। অনেক সময় না দিয়ে উপায় থাকে না।

এক চিকিৎসককে মধ্য রাতে ফোন করে ঘুম থেকে তুলেছিলেন এক অনিদ্রার রোগিনী। সারাদিন এবং সন্ধ্যার কঠোর পরিশ্রমের পর সদ্য ঘুমিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। ঘুম থেকে উঠে ফোন তুলে তিনি শুনতে পেলেন রোগিনীর প্রশ্ন, 'ডাক্তারবাবু আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?'

ডাক্তারবাবু শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, কি হয়েছে ?' রোগিনী বললেন, 'আপনি তো বেশ ঘুমোচ্ছেন। এ দিকে আমার যে কিছুতেই ঘুম আসছে না। দু'বার ঘুমের ওষুধ খেলাম। তাও ঘুম কেটে কেটে যাচ্ছে। এখন আমি কি যে করি ?'

রোগিনীর জিজ্ঞাসা শুনে ডাক্তারবাবুর ঘুম সম্পূর্ণ চটে গেল। তিনি বললেন, 'আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। ফোন ধরে থাকুন। আমি আপনাকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শোনাচ্ছি।' এই বলে হেঁড়ে, বেসুরো গলায় ফোনে গান গাইতে লাগলেন, 'খুকু ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গী এলো দেশে…' ইত্যাদি।

অনিদ্রা রোগিনীর এই গল্প সত্যি হলেও হয়তো হতে পারে। কিন্তু দুর্বল হৃদয়া রোগিনীর ঘটনাটা সত্যি নয়। এক কুৎসিত দর্শনা এবং দুর্বলহৃদয়া রোগিনী ডাক্তারবাবুকে বড় জ্বালাচ্ছিলেন। ডাক্তারবাবু তাকে বলেছেন যে তাঁর হার্ট ভালো নয়। সাবধানে থাকতে, সবসময়ে লক্ষ্য রাখতে যে কখনো হাঁপ ধরে না যায়, কোনো শক না লাগে।

মহিলা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, 'আমি কি পাঁঠার মাংসের মেটে খেতে পারি ?' 'আমি কি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আস্তে আস্তে উঠব ?' 'আমি কি ভয়ের সিনেমা দেখতে পারি ?'

একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তরে কোনোটায় 'হ্যাঁ', কোনোটায় 'না' বলতে বলতে অবশেষে ডাক্তারবাবু ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। বললেন, 'দেখবেন কোন কিছুতে যেন শক না লাগে। চমকে না ওঠেন হঠাৎ।' রোগিনী বললেন, 'যেমন ?' রোগিনীর মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'যেমন, আয়নায় মুখ দেখবেন না। কখনো

আয়নার কাছে যাবেন না।'

এই কাল্পনিক ডাক্তার রোগীকে খুশি রাখতে চান না এবং নিতান্ত বাধ্য হয়ে, তিতিবিরক্ত হয়ে কটুবাক্য ব্যবহার করেছেন। তবে অনেক সময় চিকিৎসকেরা না বুঝেও রোগীর মনে আঘাত দিয়ে থাকেন।

এক তরুণ কবির চিকিৎসা বিভ্রাটের কথা মাত্র কয়েকদিন আগে একটা কাগজে পড়লাম। এই কবিকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি, যখন সে নিতান্ত নাবালক অথচ কবিতা লেখা আরম্ভ করেছে তখন থেকে তাকে এবং তাদের দলের প্রায় সবাইকার সঙ্গে আমার একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। সে থাকে একটা প্রত্যন্ত জেলার সদর শহরে এবং সেখান থেকে ডাকে কবিতা পাঠায় কলকাতায়। সেখান থেকেই যোগাযোগ রক্ষা করে। আমি যতবার সেই শহরে গেছি তার এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছি, খোঁজখবর নিয়েছি। দুয়েকবার তারাও আমাকে উৎসাহভরে সভা সমিতিতে নিয়ে যাচ্ছে কলকাতায় এসে।

কিন্তু তরুণ কবিটি এবার মোক্ষম বিপদে পড়েছে। যাকে বলে রীতিমত চিকিৎসা বিভ্রাটে। চিকিৎসা বিভ্রাটের অতুলনীয় বিচিত্র গল্প পরশুরাম লিখেছিলেন। কিন্তু অনেক সময়েই ব্যাপারটা অত সরস নয়।

তরুণ কবি স্থানীয় ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন হাইড্রোসিল অপারেশন করার জন্যে। কিন্তু অপারেশন করার পরে নাকি বোঝা গেছে যে তার হাইড্রোসিল নয় হয়েছে ফাইলেরিয়া।

অবশ্যই এই দুই রোগের দুই রকম চিকিৎসা। যে ডাক্তার রোগ নির্ণয় করলেন আর যিনি অপারেশন করলেন, যে যাঁর মত ভেবেছেন। সুখের বিষয় তরুণ কবি এখন ভালো আছেন এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

কিন্তু সবসময় সুখবর এত সহজ হয় না। দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে যাব না। এই সূত্রে একটা বিলিতি হাসির আখ্যান বলি।

গল্পটি পুরনো, বোধহয় আগেও লিখেছি। এক ব্যক্তি তার ডাক্তারকে বলেছিলেন, 'স্যার, একটু দেখেশুনে আমার চিকিৎসা করবেন। আমার জামাইবাবু গত মাসে মারা গেলেন, তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল টাইফয়েডের কিন্তু হয়েছিল নিউমোনিয়া। আমার অফিসের বড়বাবুর ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা হলো কিন্তু হয়েছিল এনসেফেলাইটিস। তিনিও মারা পড়েছেন।' শুনে চিকিৎসক গম্ভীর হয়ে রোগীকে আশ্বস্ত করলেন, 'অত ভয় পাবেন না। আমি যে রোগের চিকিৎসা করি, সেই রোগেই রোগীরা মারা যায়। আমি যদি আপনার টাইফয়েড বলে চিকিৎসা করি আপনি টাইফয়েডেই মারা যাবেন। নিউমোনিয়া বা ম্যালেরিয়ায় নয়।'

চিকিৎসা বিভ্রাট

'রোগীর বন্ধু'—নিবন্ধে চিকিৎসা বিভ্রাট বিষয়ে লিখতে গিয়ে আসল গল্পটি বাদ পড়ে গেছে।

বস্তুত চিকিৎসার ব্যাপারটি অতি জটিল। চিকিৎসক ও চিকিৎসা নিয়ে আমি জীবন বিপন্ন করে বহুবার রসিকতা করেছি। কিন্তু এ বিষয়ে গল্পকাহিনীর শেষ নেই। অনায়াসে অষ্টাদশপর্ব সরস মহাভারত লিখে ফেলা যায়। তবে আমি অতদূর যাব না। এবারেই চিকিৎসা পর্ব সমাপ্ত হবে।

চিকিৎসা বিভ্রাট খুব সাধারণ ব্যাপার। হতেই পারে। অনেক সময় অসুখ নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করি। যে রোগ হয়তো একা একাই উপশম হতো, দু'দিন বিশ্রাম বা একরাত্রি উপোস দিলে যে অসুখ সেরে যেতো সেটা নিয়ে ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধ-ইঞ্জেকশনে আমরা শরীরকে ব্যস্ত করে তুলি। আবার অনেক সময়ে উপসর্গগুলো এতো রঞ্জিত করে ডাক্তারবাবুকে বলি যে তিনি ভুল করে বসেন।

অনেক সময় এমনিও ভুল হয়। তবে কদাচিৎ কোনো চিকিৎসক নিজের ভুল স্বীকার করেন। গোলমাল বুঝলে মানে মানে সরে পড়েন।

কিন্তু কোনো কোনো চিকিৎসক খুব একরোখা হন। তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে টলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমার এক আত্মীয়ের কথা জানি। তিনি বেশ কয়েকমাস হলো পরপর জ্বরে পড়ছেন। বেশ কয়েকদিন ভোগার পর জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে কিন্তু তিনি ক্রমশ রুগ্ন ও কাহিল হয়ে পড়ছেন।

যে ডাক্তারবাবু তাঁকে দেখছিলেন তিনি বেশ যত্ন নিয়েই চিকিৎসা চালাচ্ছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বার পাঁচেক সেই ডাক্তারবাবুকে দেখানোর পর ডাক্তার বদলানো হলো।

পরে ডাক্তার সব দেখেশুনে সব ওষুধ পালটিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'আগের ডাক্তার কিছুই ধরতে পারেনি। সম্পূর্ণ ভুল চিকিৎসা হয়েছিল।'

দুঃখের বিষয়, আগের ডাক্তারবাবু পাড়াতেই থাকেন। প্রতিবেশী মারফত কি করে যেন পরের ডাক্তারের এই কথা তাঁর কানে গেল। পরের দিন বিনা কলেই আমার আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি এলেন। এসে মনোযোগ দিয়ে নতুন প্রেসক্রিপশনটা দেখে রোগীকে বললেন, 'কিছু ধরতে পারেনি। এই ওষুধ খেয়ে এবার মারা পড়বেন। আর আপনি মারা যাওয়ার পরে আমি আপনার অটোপ্সি (Autopsy) করাব, তখন প্রমাণ হবে কে ঠিক ছিল আর কে ভুল করেছিল, আমি না ঐ নতুন ডাক্তার।'

চিকিৎসক বিষয়ে অন্য ধরনের একটা গল্প এবার বলি।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন একটা অপারেশন করানোর জন্যে। অপারেশন ভালোভাবেই হলো, তবে অপারেশনের পরে সার্জনের কাছ থেকে একটা মাত্রাতিরিক্ত বিল পেয়ে তিনি চমকিয়ে উঠলেন। তাঁর ছেলে বলল, 'এতো খুব মারাত্মক বিল করা হয়েছে।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সার্জন সাহেবকে সে কথা জানালেন। বললেন, 'স্যার আমার ছেলে বলছে আমার এই সামান্য অপারেশনের জন্য আপনার চার্জটা বড় বেশি হয়ে গেছে।'

সার্জন সাহেব কপালে চোখ তুললেন, বললেন, 'আপনার ছেলে এই কথা বলেছে ? বলেছে সামান্য অপারেশন ? দেখুন আপনার ছেলের কাছে আপনার জীবনের মূল্য কম হতে পারে, কিন্তু আমি কিছুতেই আপনার জীবনকে তুচ্ছ ভাবতে পারি না।'

অন্য এক বৃদ্ধ রোগীর কথা মনে পড়ছে। তিনি ছিলেন একটু আত্মভোলা ধরনের। তাঁর অসুখ হয়েছে। ডাক্তারবাবুকে কল দেয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু তাঁর বাড়িতে এসেছেন। গৃহভৃত্য এসে খবর দিল, 'বাবু, ডাক্তারবাবু এসেছেন।' বাবু বললেন, 'তুমি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে বলো, আমার শরীর খুব খারাপ, আমি আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব না।'

এই আত্মভোলা রোগীকে নিয়ে চিকিৎসকের সমস্যা তেমন জটিল নয়। ইনি হয়তো বড় জোর দু'-একবার ওষুধ খেতে ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু এমন অনেক রোগী আছেন যাঁরা চিকিৎসকের কোনো নিষেধেই কর্ণপাত করেন না।

এক স্থূলদেহ হৃদরোগীকে ডাক্তারবাবু নির্দেশ দেন যে মোটেই মাখন খাবেন না। কয়েকদিন পরে রোগী এসে জানালেন যে, মাখন না খেয়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। দু'বেলা মাখন দিয়ে চারটে চারটে টোস্ট সকাল বিকেলে চায়ের সঙ্গে খাওয়া তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রিয় অভ্যেস। এখন এ বয়েসে এ অভ্যাস পরিত্যাগ করা অসম্ভব।

ডাক্তারবাবু বিচক্ষণ, তিনি বুঝলেন এই রোগী মাখন খাবেনই এখন যতটা কম মাখন

খান তাই মঙ্গল। তিনি ভেবে চিন্তে বললেন, 'ঠিক আছে, কী আর করা যাবে ? মাখন তাহলে খাবেন। তবে স্বাস্থ্যের কারণে মাখন লাগানোর আগে ছুরিটা খুব ভালো করে আগুনে গরম করে নেবেন।'

সত্যি মিথ্যে মেশানো চিকিৎসা ও চিকিৎসক নিয়ে এসব গল্প বহুদিন ধরে চলে আসছে। ডাক্তারবাবুরা চিরকাল এসব গল্পকথা শুনে মুচকি হেসেছেন। তাঁরা হাসুন, আর এই সুযোগে চিকিৎসা পর্বের অবশেষে মহামহিম ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নামে কথিত একটি পুরনো বিধান আরেকবার উল্লেখ করি। এই কাল্পনিক আখ্যানটি একেকজন একেকভাবে বলেন, আমি নিজেও একাধিকবার অন্য সূত্রে অন্যভাবে বলেছি, তবু এখানে না বললে এবারে চিকিৎসা পর্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এই কাল্পনিক আখ্যানে বিধানচন্দ্র কী বলেছিলেন। এই পরম চিকিৎসক সর্ব সাধারণকে একটি সরল ডাক্তারি পরামর্শ দিয়েছিলেন।

পরামর্শটি হলো তিন দফায় :—

[এক] আপনার অসুখ হলে আপনি অবশ্যই ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখাবেন। কারণ, ডাক্তারকে তো খেয়ে বাঁচতে হবে।

[দুই] তখন ডাক্তারবাবু আপনাকে একটি প্রেসক্রিপশন দেবেন। আপনি অবশ্যই সেই

প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে কিনবেন। কারণ, ওষুধের কোম্পানিওলাদের আর দোকানদারদের তো খেয়ে বাঁচতে হবে। এবং

[তিন] সেই ওষুধ কিনে আনার সঙ্গে সঙ্গে আপনি অবশ্যই সেই ওষুধগুলো নর্দমায় ফেলে দেবেন।

কারণ আপনাকেও তো বেঁচে থাকতে হবে।

★ ★ ★

এই অমূল্য উপদেশের সূত্রে আরেকটি বিপজ্জনক গল্প বলি। নার্সিং হোমে এক ডাক্তারবাবু এক ধনী ব্যক্তিকে চিকিৎসা করছিলেন। দুঃখের বিষয়, রোগীটি মারা যান। বেশ কিছু টাকা পাওনা ছিল রোগীর কাছে ডাক্তারের। ডাক্তারবাবু অনেক খোঁজ খবর করে মৃত ব্যক্তির উকিলের কাছে গিয়ে বললেন, 'এই টাকা আমার পাওনা আছে ঐ মৃত ভদ্রলোকের কাছে। উনি আমারই চিকিৎসায় ছিলেন। টাকাটা পেতে গেলে আমাকে কি এফিডেবিট করতে হবে?' উকিল বললেন, 'আমার মক্কেল যে আপনার চিকিৎসায় মারা গেছেন এর জন্যে এফিডেবিটের কি দরকার। আপনার নাম শুনেই বুঝতে পেরেছি। কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ লাগবে না আপনার টাকা আপনি পেয়ে যাবেন।'

এই নিবন্ধ এর পরে আর টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। শুধু আরেকটা গল্প বাকি আছে।

অনিদ্রা রোগের এক চিকিৎসক তাঁর বিষয় অর্থাৎ ইনসোমনিয়ার ওপর বিদ্বজ্জন সভায় বক্তৃতা করছিলেন। বেশ বড় বক্তৃতা, প্রায় ঘণ্টা দেড়েক।

বক্তৃতার শেষে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক উঠে এসে বক্তাকে, ধন্য, ধন্য করতে লাগলেন। বক্তা এতটা আশা করেননি, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?' শ্রোতা বললেন, 'এমন অব্যর্থ বক্তৃতা হয় না। আমি পুরনো ইনসোমনিয়ার রোগী। আপনার বক্তৃতা শুনে আজ যে কতদিন পরে ঘুমোলাম ডাক্তারবাবু, কি আর বলব?'

তথাপি পুনশ্চঃ

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার পেটের গোলমাল হচ্ছে আপনার দাঁতের ইনফেকশনের জন্য। আপনার কয়েকটা দাঁত তুলে ফেলতে হবে।'

বিহ্বল রোগী এই কথা শুনে মুখে আঙুল দিয়ে দুই পাটি বাঁধানো দাঁত খুলে ডাক্তারবাবুর সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এই নিন।'

রসুন

কবিরাজ কুলতিলক শ্রীযুক্ত শিবকালী ভট্টাচার্য মহোদয়ের সাজানো বাগানে অনুপ্রবেশ করবার এ কোনো ব্যর্থ প্রয়াস নয়।

এই হাস্যকর নিবন্ধমালায় রসুন অন্তর্ভুক্ত করে আমি আমার পচা তরকারি বা মাছ-মাংসে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা আনতে চাচ্ছি, এমন কথা যদি কোনো নবীন পাঠক কিংবা প্রবীণা পাঠিকা ভেবে বসেন, এবং বক্র হাসেন শুধু তাঁর এবং তাঁদের নিতান্ত অবগতির জন্যে জানাই এ শুধু অলস মায়া। শুধুই ডাক্তারবাহিনী আর রোগীর কাহিনীর অন্তে অন্তত একটি ওষুধ বা একটি ভেষজ, অথবা একটি নিরোগদায়িনী লতা নিয়ে আলোচনা থাকা উচিত তাই রসুন নিয়ে এই নিবন্ধ।

রসুনের উপকারিতা এবং রোগ নিরাময় ক্ষমতা নিয়ে সম্প্রতি কিছুদিন হলো খুব সোরগোল উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এখন যখন শরীরে শরীরে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদয়ে হৃদয়ে দুর্বলতা, গৃহে গৃহে স্নায়ু বৈকল্য সেই সময় রসুন এই সমস্ত রোগের প্রতিষেধকরূপে চিহ্নিত হয়ে বহুপ্রিয় হয়েছে।

নানারকম শোনা যাচ্ছে। যেমন এক কোয়াযুক্ত রসুন, দু'কোয়া বা ততোধিক কোয়াযুক্ত রসুনের চেয়ে বেশি উপকার দেয়। সুযোগ বুঝে হাটে বাজারে, বিবাদী বাগের ফুটপাতে এক কোয়া রসুনের ঝুড়ি নিয়ে ব্যাপারি দাঁড়িয়ে গেছে, এবং সে রসুনের দামও পঁচিশ-ত্রিশ টাকা

কেজি।

দায়ে পড়ে, রসুনের গুণ বিশ্বাস করে বহু লোক কিনছেন। অতি শৌখিন ব্যক্তিও, যিনি ইনটিমেট সৌরভ এবং ওলড্ স্পাইস সেভিং লোশনে আসক্ত, তিনি পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠে এই কটুগন্ধ পদার্থটা চিবিয়ে গলাধঃকরণ করছেন। সারাদিন গন্ধে তাঁর কাছে এগোনো যাচ্ছে না।

একদা কথা ছিল যে দৈনিক একটি করে আপেল খেলে ডাক্তার দূরে থাকবে। আপেল স্বাস্থ্যের এবং শরীরের পক্ষে কতটা ভালো ও প্রয়োজনীয় এটা বোঝানোর জন্যেই একথা বলা হতো।

আজকাল আপেলের আর সে মর্যাদা নেই। তার স্থান নিয়েছে রসুন। এবং সে শুধু এই আয়ুর্বেদের দেশেই নয় সাহেবদের দেশেও। এখন আপেলের ঐ প্রবাদ বাক্যের স্থলে যে রসিকতাটি বিলেতে চালু হয়েছে সেটি হলো, 'প্রতিদিন একটা করে আপেল খেলে ডাক্তার দূরে থাকবে আর প্রতিদিন একটা করে রসুন খেলে শুধু ডাক্তার নয় সবাই দূরে থাকবে।'

অর্থাৎ, রসুনের গন্ধে কেউই কাছে ঘেঁষবে না। সবাই দূরে দূরে থাকবে।

এই সূত্রে একটি সর্বাধুনিক ডায়েটিংয়ের গল্প মনে পড়ছে। কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গিনী এক মেমসাহেবকে ডাক্তার ওজন কমানোর জন্যে রসুনের ডায়েটিং করান। সকালে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে এক কোয়া রসুন, দুপুরে লাঞ্চের সময় রসুন বাটা মিশিয়ে স্যাণ্ডউইচ আবার রাতে ডিনারের সময় রসুন ফ্রাই। কয়েকদিন পরে মেমসাহেবের এক বান্ধবী তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, 'ওজন কিছু কমলো?' সুরসিকা মেমসাহেব জবাব দিলেন, 'না ওজন তেমন কমেনি। তবে প্রেমিকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।'

রসুন দিয়ে অতিরিক্ত রসিকতা করার আগে দু'একটি তথ্য স্বীকার করে নিই।

যদিও এই সেদিন পর্যন্ত বর্ণ হিন্দুর রান্নাঘরে রসুনের প্রবেশাধিকার ছিল না। সারা পৃথিবীতে এখন প্রায় দুশো কোটি কিলোগ্রাম রসুন খাওয়া হয়। তার মানে এই যে মাথা প্রতি দু'দিনে এক কোয়া করে রসুন খাওয়া হয়।

সম্প্রতি এক ধরনের গন্ধহীন রসুনের বড়ি বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত করে জাপান সেটা মার্কিন দেশের বাজারে ছেড়েছে এবং প্রথম বছরেই আমেরিকায় তিরিশ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

বলা বাহুল্য এ ধরনের গন্ধমুক্ত রসুনের বড়ি আমাদের দেশেও এখন চলছে, যে কোনো ওষুধের দোকানেই দু'চার রকম এ ধরনের ওষুধের শিশি পাওয়া যায়। তার দামও বেশ চড়া। তবুও ভালো বিক্রি হচ্ছে সেটা যে কোনো কাগজে এ সম্পর্কে বিজ্ঞাপনের বহর দেখলেই বোঝা যায়।

শুধু আমাদের সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নয়, সোয়া'শ বছর আগে লুই পাস্তুরের মত মহান বিজ্ঞানী রসুনের অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতা ধরতে পেরেছিলেন। রসুনের মধ্যে গন্ধকের উপাদান রয়েছে। রসুন সংক্রমণ প্রতিহত করে। রক্তে কোলেস্টরল কমায়, মেদ বৃদ্ধি ঠেকিয়ে রাখে।

বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকেরা রসুনের নানা গুণের কথা এখন বলছেন। একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন যে রসুন শব্দের সন্ধি হলো রস+উন, উন মানে কম, যেমন উনত্রিশ মানে ত্রিশের এক কম। এতে অম্লরস ছাড়া আর সব রসই রয়েছে বলে

এর নাম হয়েছে রসুন, মূল শব্দটি দেশজ বা বিদেশি নয় প্রকৃত সংস্কৃত।

অভিধান থেকে ব্যাপারটা যাচাই করতে গিয়ে সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' দেখে ব্যাপারটা প্রত্যয় হলো। রসুন রান্নাঘরে যতই ব্রাত্য হোক, আলু কপি এ সমস্তের ঢের আগে থেকে রসুন ভারতবর্ষে রয়েছে।

সে যা হোক, অভিধানের সূত্রে অন্য একটি অপ্রাসঙ্গিক গল্প মনে পড়ছে। এক গ্রাম্য ব্যক্তি ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধান দেখে স্বচেষ্টায় ইংরেজি শেখে। দুঃখের বিষয় সেই ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিক্সনারিতে দু'একটা ছাপার ভুল ছিল। সেই বইয়ে ইংরেজি গারলিক শব্দের অর্থে রসুন ছাপতে গিয়ে র শব্দটির নিচের বিন্দুটি বাদ পড়ে যায় ফলে রসুনের জায়গায় বসুন ছাপা হয়। তাই ঐ ব্যক্তি ধরে নিয়েছিল গারলিক মানে বসুন। ফলে একদিন যখন এক সাহেব তার বাড়িতে বেড়াতে এল, সে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সাহেবকে বলল, 'গারলিক স্যার, গারলিক'। অর্থাৎ 'বসুন স্যার, বসুন।'

এই গল্পটি নিতান্ত গোপাল ভাঁড় মার্কা। বহুদিন আগে বটতলার রসিকতার বইতে পড়েছিলাম। রসুন বিষয়ে একটা পুরনো মজার গল্প দিয়ে এই আখ্যান শেষ করব। তার আগে, সম্প্রতি একটি পত্রিকায় রসুন বিষয়ে কিছু তথ্য পেয়েছি সেটা জানাই।

আড়াইশো বছর আগে ফরাসি দেশে প্লেগ মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছিল। মৃতদেহ সৎকারের জন্যে লোক পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তখন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েকজন বন্দীকে ঐ মৃতদেহ সৎকারের কাজে নিয়োগ করা হয়। তারা কিন্তু প্লেগে আক্রান্ত হয়নি। পরে অনুসন্ধান করে জানা যায় তারা দু'বেলা রসুনের ঝোল খেতো। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে ক্ষয়রোগ পর্যন্ত সব অসুখেই রসুন উপকারী, বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত চিকিৎসকেরা এ ধরনের মত দিয়েছেন। বলা হয়, বুলগেরিয়ার লোকেরা যে দীর্ঘজীবী তার কারণ হলো তারা নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে রসুন খায় বলে।

তাহলে আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যে বলতেন, রসুন শরীর গরম করে, রসুন বেশি খেতে নেই। সেটা কেন বলতেন ? বহুকাল ধরে যে ধারণা যুগপরম্পরায় চলে আসে তারও তো কোনো ভিত্তি থাকে।

সে যাক, আমরা মজার গল্পে ফিরে যাই। গল্পটি এর আগে যদি কেউ শুনে বা পড়ে থাকেন ক্ষমা করবেন।

এক বড় সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি দৈনিক লাঞ্চের সময় এক বোতল বাংলা মদ খেয়ে আসতেন। তারপর সাহেব যাতে গন্ধ না পান সেই জন্যে খুব কড়া জর্দা দিয়ে পান খেয়ে কাজে ফিরতেন। তাঁর মাথায় হঠাৎ ঢুকলো রসুনের চিন্তা। রসুন খেলে অসুখ হয় না, স্বাস্থ্য ভালো থাকে ইত্যাদি। তিনি রসুন চিবিয়ে খাওয়া শুরু করলেন এবং ঠিক করলেন দুপুরে মদ খেয়ে আসার সময় আর জর্দা পান খাবেন না তার বদলে রসুন চিবিয়ে আসবেন, সাহেব মদের গন্ধ টের পাবেন না।

সাহেব কিন্তু ঠিকই টের পেলেন এবং যা বললেন সেটা ভয়াবহ, 'দ্যাখো গত পনেরো বছর ধরে আমি তোমার ধেনো মদের সঙ্গে জর্দার গন্ধ সহ্য করে গেছি, কিন্তু এই যে এখন শুরু করেছ ধেনো মদের সঙ্গে রসুনের গন্ধ এটা আর সহ্য হচ্ছে না।'

রসিকতা

দুর্লভ মানবজন্মের মহামূল্য দিনগুলি ইয়ার্কি দিয়ে কেটে যাচ্ছে আমার। কি কুক্ষণে যে রসিকতা ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল যতবার তাকে ঘাড় থেকে ঝাঁকি দিয়ে ঠেলে দিতে যাই সে আমাকে আরো জড়িয়ে ধরে।

এখন মনে হচ্ছে আর পরিত্রাণ নেই। এ ভূতের হাত থেকে এ জন্মে আর পরিত্রাণ পাব না।

রসিকতার মহত্ত্ব সম্পর্কে কত বড় বড় কথাই যে এ যাবৎ শুনেছি। সেই এক দার্শনিক বলেছিলেন, যার রসবোধ নেই, সে মানুষই নয়। মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের পার্থক্য এইখানে যে জানোয়ার রসিকতা করতে জানে না।

দার্শনিক মহোদয়ের এই আপ্তবাক্য অবশ্য আমার কাছে সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়। সুরসিক দু-একটি জন্তু, বাঁদর, শুশুক এমনকি কুকুর-বিড়ালের কথা আমরা জানি। ছোট কুকুরছানার লেজ ঠোঁট দিয়ে টেনে পালিয়ে যায় এমন ফাজিল কাকও অনেক দেখেছি।

জীবজন্তুর রসিকতা বিষয়ে কথা বাড়ানোর মত রসদ আমার হাতে আজ নেই, আমি আপাতত রসিকতার স্বভাবচরিত্র নিয়ে সামান্য দু-একটা কথা নিবেদন করতে চাই।

রসিকতা ও হাসির গল্পের স্বভাব লক্ষণ হলো যে এইসব গল্পগুলো মহাকাশের ধূমকেতুর মতো অনেকদিন পর পর ঘুরে ফিরে আসে। কিছুদিন ধরে কোনো একটা রসিকতা

বৃত্তাকারে ঘুরপাক খায় হাটে-বাজারে, অফিস-কাছারিতে, ক্লাবে-বারে এগুলো লোকমুখে চলতে চলতে তারপর একদিন হারিয়ে যায়। কেউ আর মনে রাখে না। অনেকে একটা হাসির গল্প আজ হয়তো শুনল, তারপর তারা সেই গল্পটা কাল অন্যদের বলল। তারপর সেই অন্যেরা পরশুদিন আরো অন্যদের বলল। সবাই খুব হাসাহাসি করল, তারপর যথারীতি একদিন ভুলে গেল।

যদি কেউ অনেকদিন বেঁচে থাকে, যদি তার স্মৃতিশক্তি প্রখর হয় সে হয়তো দেখবে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে সেই গল্পটা আবার ঘুরে এসেছে। লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। সেই গল্প লোকেরা বলছে, লোকেরা শুনছে। শুনে হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

তিন-চার দশক আগের কোনো বিলিতি ম্যাগাজিন যদি খুলি, এমনকি আমাদের পুরনো 'ইদানিং' বা 'অচলপত্র', বিস্ময় সহকারে আবিষ্কার করব এখনকার সবচেয়ে বাজার চালু গল্প সেইখানে ছাপা রয়েছে। এমনকি আমার এই অপাঠ্য মহাভারতেও হয়তো পাঠকেরা খুঁজে পাবেন সেই সব সরস আখ্যান।

একটা রসিকতার পরমায়ু পাঁচ-ছয় মাস, বড় জোর একবছর। হয়তো নিউইয়র্কে যেটা শোনা গেল যেদিন তার তিনদিনের মাথায় সেটা উড়ে এল লন্ডনে। সেখান থেকে অন্য আকারে অন্য ভাষায় পৌঁছালো দিল্লি, দিল্লি থেকে কল্পনায়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেই রসিকতা হলুদ হয়ে যাওয়া কাঁঠাল পাতার মতো উড়ে গেল মহাকালের হাওয়ায়। কিন্তু একদিন সেই রসিকতা আবার কোথায় কুড়িয়ে পেল সবুজতা, হরিৎ আভা, ঘরে ঘরে চায়ের আসরে, বার লাইব্রেরির কালো কোট পরা উকিলেরা, সাদা অ্যাপ্রন পরা, সাদা মুখোশে নাক ঢাকা শল্য চিকিৎসকবৃন্দ সকলেই আবার অবসরে বলতে লাগলেন, 'শুনেছেন সেদিন ভারতমাতা হোটেলে···।'

ভারতমাতা হোটেলের গল্পটা মর্মান্তিক হাসির গল্প। বিস্তারিত বলা প্রয়োজন।

এক ভদ্রলোক ভারতমাতা হোটেলে খেতে গিয়েছেন। ভারতমাতা হোটেলের স্পেশাল হলো পাঁঠার মাংস। সেদিন নানা কাজ সেরে তাঁর হোটেলে যেতে যেতে রাত সাড়ে দশটা হয়ে যায়, গিয়ে নির্দিষ্ট টেবিলে বসে ভদ্রলোক বেয়ারাকে বলেন, 'ভাত-মাংস।'

বেয়ারা পুরনো খদ্দেরকে দুঃখিত করতে চাননি তবু বাধ্য হয়ে বললেন, 'স্যার, মাংস ফুরিয়ে গেছে।'

এই কথা শুনে ভদ্রলোক উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বেয়ারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলল, 'স্যার উঠবেন না, আমি দেখছি, কি করা যায়। একটু চেষ্টা করে দেখছি।'

এই বলে বেয়ারা হোটেলের রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘরের দরজার কাছেই শুয়ে ছিল একটা কুকুর। অন্যমনস্ক ভাবে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে বেয়ারাটি কুকুরের পা মাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা চিৎকার করে কেঁউ কেঁউ করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল।

এদিকে হয়েছে কি শহরের মেয়র মহোদয় স্বয়ং কবুল করেছেন যে তাঁর শহরে পাঁঠার মাংসের বদলে হামেশাই কুকুরের মাংস চালানো হচ্ছে। মেয়র সাহেবের ওই উক্তি সুরঞ্জিত হয়ে প্রতিদিন কাগজে কাগজে বেরোচ্ছে।

সুতরাং কুকুরের আর্তনাদ শোনামাত্র ভদ্রলোক বুঝলেন এখনই তাঁকে মাংস দেয়ার জন্যে একটা কুকুর কাটা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোজনালয় থেকে তিনি পলায়ন করলেন। কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা মাংসের ডেকচির তলা কুড়োনো কয়েক টুকরো হাড়, চর্বি সমেত

একটু শুকনো ঝোল একটা প্লেটে নিয়ে এসে দেখে মাননীয় খদ্দের উধাও।

এই গল্প এখন কলকাতা শহরের বাজারে চলছে। কিন্তু তিরিশ বছর আগেও আরেকবার এ গল্প লোক মুখে ফিরেছে। তারও বহু আগে লন্ডনের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এ গল্প ছাপা হয়েছিল। আরো পিছিয়ে গেলে হয়তো নাসিরুদ্দিনে অথবা মার্ক টোয়েনে এ গল্প পাওয়া যেতে পারে।

অতঃপর রসিকতার বিপজ্জনক দিকটি বলি।

কবি অরবিন্দ গুহ, যিনি ইন্দ্র মিত্র নামে সুপ্রসিদ্ধ, তাঁর মতো মজার গল্প ভূভারতে কখনো কাউকে বলতে শুনিনি। আমাদের চেনাজানা সব হাসির গল্প তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় বাচনভঙ্গিতে অনবদ্য হয়ে ওঠে। সেই অরবিন্দ বহুদিন আগে একবার রসিকতা বিষয়ে এই ভয়াবহ গল্পটি বলেছিলেন।

অরবিন্দ একটা সরকারি অফিসে কাজ করতেন। সেই অফিসের এক বড়বাবুর বদ অভ্যাস ছিল হাসির গল্প করা। তিনি যে খুব ভালো রসিকতা করতে পারতেন তা নয়। কিন্তু প্রতিদিন দুপুরে টিফিনের সময় জমিয়ে আধঘণ্টা বা তারও বেশি সময়, টিফিনের সময় অতিক্রান্ত করে তিনি তাঁর যোগ্যতা মত যথাসাধ্য হাসির গল্প সবাইকে শোনাতেন। যাঁরা শুনতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই তার অধস্তন কর্মচারী, তাঁর বিভাগেই কাজ করেন, তাঁরাও এসব গল্প শুনে, কোনো কোনো গল্প বারবার শুনে যথারীতি হাসতেন।

স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় অরবিন্দ নিজেও বড়বাবুর এই আড্ডায় নিয়মিত যোগ দিতেন। এই সময় অফিসের নিয়মানুযায়ী অরবিন্দ এই সুরসিক বড়বাবুর দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে বদলি হয়ে গেলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল সম্ভবত অরবিন্দ অতঃপর আর এই মধ্যাহ্ন আড্ডায় আসবেন না। কিন্তু পুরনো জায়গার মায়াতেই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক পরের দিন বেলা দু'টোয় টিফিন হওয়া মাত্র অরবিন্দ পাঁচতলায় তাঁর নতুন শাখা থেকে নেমে চারতলার পুরনো শাখায় এলেন।

আজ বড়বাবু বেশ জমিয়ে বসেছেন, গতকাল সন্ধ্যাতেই তিনি বাড়ি ফেরার পথে একটা ইংরিজি পকেট জোক বুক ফুটপাথের দোকান থেকে দেড়টাকা দিয়ে কিনেছেন। আজ তাঁর মনের মধ্যে রসিকতার বড় বড় বুদ্বুদ উঠছে। টিফিনের সময় সেই সব রঙিন বুদ্বুদ একটার পর একটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন তিনি, অনুগত শ্রোতারা হাততালি দিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন।

কিন্তু অরবিন্দ নির্বিকার। ভাবলেশহীন গম্ভীর মুখে একটার পর একটা হাসির গল্প শুনে চলেন তিনি। এই ব্যতিক্রম সকলেরই নজরে পড়ল, বিশেষ করে রসিক বড়বাবুর। তিনি অবশেষে বাধ্য হয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কি হলো অরবিন্দ ? ব্যাপার কি ? তোমার হলোটা কি ? এই রকম সব মজার গল্প, একবারও হাসছো না ?'

তিক্ত, গম্ভীর বদনে অরবিন্দ উত্তর দিলেন, 'যারা হাসবার তারা হাসছে। আমি হাসবো কেন ? আমি তো এখন আর আপনার দপ্তরে কাজ করি না।'

অরবিন্দ গুহের গল্পের এই মর‍্যাল সব বাক্যবিলাসীর সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

স্বর্গ

রবীন্দ্রনাথকেও নাকি একবার নরকে যেতে হয়েছিল। গল্পটা পুরনো, জর্জ বিশ্বাসের নামে প্রচলিত রয়েছে। সম্প্রতি গল্পটা আবার শুনলাম।

সেটা সেই সময়ের কথা, যখন জর্জ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত 'বিশুদ্ধ' না হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ। তখন তিনিই গল্পটা বলেছিলেন, "আমি যখন মারা গেলাম, মারা গিয়ে দেখি নরকে গেছি, নরকেতো আমি যামুই। তা সেই নরকের বারান্দায় দেখি আলখাল্লা গায় দিয়া রবীন্দ্রনাথ হাঁটিতেছেন। আমি তো অবাক, 'কইলাম, গুরুদেব আপনি এখানে!' গুরুদেব কইলেন, 'আমি ভদ্রঘরের মাইয়াদের স্টেজে নাচাইয়াছিলাম, তাই ভগবান আমারে নরকে পাঠাইছে।"

বলা বাহুল্য, অনন্য ও অদ্বিতীয় জর্জ বিশ্বাসের এ এক মর্মান্তিক বিদ্রূপ নীতিবাগীশদের বিরুদ্ধে।

* * *

জর্জ বিশ্বাসকে দিয়েই যখন আরম্ভ করে ফেললাম, তাহলে নরক নয় স্বর্গের কথা হোক।

মানুষের জ্ঞান হওয়া অবধি স্বর্গ নিয়ে তার কল্পনার অভাব হয়নি। সব ধর্মে যেমন

পাপ-পুণ্যের কথা আছে, তেমনই স্বর্গ নরকের কথা আছে। মানুষকে বলা হয়েছে পাপ করো না, মিথ্যে কথা বলো না, কুকর্ম করো না, মানুষের উপর এই সব নিষেধাজ্ঞা জারি করে তারপর তাকে লোভ দেখানো হয়েছে স্বর্গবাসের।

সেই স্বপ্নের স্বর্গে অনন্ত বসন্ত, অনন্ত যৌবন। তার পারিজাত কাননে কোনোদিন ফুল ঝরে পড়ে না, স্বর্গ নর্তকীর চঞ্চল চরণ কোনোদিন ক্লান্ত হয় না, স্বর্গের অমৃতসুধা পান করে লিভার খারাপ হওয়ার অথবা হ্যাং-ওভার হওয়ার আশঙ্কা নেই।

মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠির স্ত্রী এবং ভাইদের নিয়ে এই স্বর্গে পৌঁছানোর জন্যে যাত্রা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সবাই পথে পড়ে যায়, এক সারমেয়বেশী ধর্ম ছাড়া তাঁর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আর কেউ ছিল না।

রামায়ণের লঙ্কেশ্বর রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে চেয়েছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত পারেন নি। মৃত্যুর সময়ে তিনি বলেছিলেন, 'শুভ কাজ শীঘ্র করতে হয়, আর অশুভ কাজে কালহরণ করতে হয়।' তবে স্বর্গের সিঁড়ি বানানোটা শুভ কাজ হতো কিনা সেটা বলা কঠিন।

স্বর্গের সিঁড়ির আরো একটা গল্প আছে। সেটা পৌরাণিক উপকথা।

তখন সৃষ্টির আদিযুগ। পৃথিবীর সব মানুষের মুখে একই ভাষা। সেই সময় মানুষেরা ঠিক করল স্বর্গের সিঁড়ি বানাবে। সিঁড়ি বানানো শুরু হলো, কাজ পুরোদমে চলছে, স্বর্গ প্রায় ছুঁই ছুঁই। ঈশ্বর তখন প্রমাদ গনলেন, সর্বনাশ! মানুষ যে সিঁড়ি পেয়ে সরাসরি স্বর্গে উঠে আসবে। তাঁর আর মাহাত্ম্য রক্ষা হবে কি করে? ঈশ্বর তখন বুদ্ধি করে একেক মানুষের মুখে একেক রকম ভাষা দিলেন। তুমুল গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। এ চাইছে ইট, ও নিয়ে এল জল। সে চাইছে পাথর এ নিয়ে আসছে বালি। বিশাল কর্মকাণ্ড ভণ্ডুল হয়ে গেল। রচিত হলো মানুষে মানুষে প্রথম ব্যবধান। ভাষার ব্যবধান। এ ব্যবধান ঈশ্বরেরই সৃষ্টি এবং তার কারণ ঐ স্বর্গ।

নিউ টেস্টামেন্টে আছে, 'আমার পিতৃগৃহে রয়েছে বহু প্রাসাদ।' এই পিতৃগৃহই হলো স্বর্গ।

এক অবিশ্বাসী পরিহাস করে এক খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকের কাছে জানতে চেয়েছিল, 'আজ্ঞে, বলতে পারেন স্বর্গের পথটা কোন দিকে?' ধর্মযাজক মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'এখন থেকে সরাসরি সোজা রাস্তায় যাবেন, তাহলেই স্বর্গে পৌঁছে যাবেন।'

এই যাজক যে ধর্মের অনুসারী সেই ধর্মের মূল গ্রন্থে এ রকম কথা বলা আছে যে সূচের ফুটো দিয়ে একটা উট পর্যন্ত গলে যেতে পারে কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা কখনোই স্বর্গে যেতে পারবে না।

বলা বাহুল্য ধনী ব্যক্তিরা স্বর্গে যাওয়া নিয়ে তেমন চিন্তিত নন। তার প্রধান কারণ হলো এই যে ধনী হতে গেলে সাধারণত যে সব কাজ করতে হয় সে সব কাজ করে স্বর্গে যাওয়া যায় না।

তবে ভালো কাজ করলেই সর্বদা স্বর্গে যাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই। একটা পুরনো গল্প এখানে আবার বলা যেতে পারে।

এক ভদ্রলোক মৃত্যুর পরে পরলোকে পৌঁছেছেন। পরলোকের দরজায় তিনি দেখলেন চিত্রগুপ্ত বসে রয়েছেন দরজার সামনে। তিনি চিত্রগুপ্তকে বললেন, 'আপনার খেরোর

খাতাটা একবার বার করে দেখুন তো আমার পাপ-পুণ্যের হিসেবটা। আমি কি স্বর্গে যাব নাকি নরকে যেতে হবে ?'

চিত্রগুপ্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার আবার খাতা কি ? ও সব পৃথিবীর মানুষের মনগড়া কথা। আমি লেখাপড়াই শিখিনি কখনো, খাতা কি করে রাখব ? পাপপুণ্যের হিসেব বলে কিছু নেই, স্বর্গ-নরক বলেও কিছু নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকে যাও।'

ভদ্রলোক দরজা দিয়ে পরলোকের ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন সেখানে ভয়াবহ কাণ্ড হচ্ছে। হাজার হাজার লোক, মারামারি, গালাগালি, চুলোচুলি করছে পরস্পরের সঙ্গে। এর মধ্যে অনেক মহাজ্ঞানী, মহাজন, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ পর্যন্ত রয়েছেন। এঁরাও অশ্রাব্য, অশ্লীল ভাষায় কথা বলছেন, এঁকে তিনি লাথি মারছেন, তাঁকে ইনি থুথু ছিটোচ্ছেন।

এই অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে নবাগত ভদ্রলোক একদম হকচকিয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এলেন পরলোকের দরজা দিয়ে। গেটের পাশে একটা মেহগনি কাঠের কালো চেয়ারে তখনো চিত্রগুপ্ত নির্বিকার, নির্লিপ্ত বসে রয়েছেন।

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে চিত্রগুপ্তকে বললেন, 'ভেতরে এ সব কি ব্যাপার হচ্ছে ? এই সব মহাপুরুষেরা এসব কী করছেন ? কেন করছেন ?'

শান্তভাবে চিত্রগুপ্ত বললেন, 'সে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কে মহাপুরুষ, কে মহাপুরুষ নয় তাও আমি জানি না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মানে' ?

ততোধিক শান্তভাবে চিত্রগুপ্ত বললেন, 'মানে টানে জানি না। তবে এতদিন ধরে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে এরা যখন একজন আসে, এসেই জিজ্ঞাসা করে, স্বর্গটা কোন দিকে। এদের যেই মাত্র বলি স্বর্গ নরক বলে কিছু নেই। আর ঐ পাপপুণ্যের হিসেব টিসেব সব বাজে কথা। এখানে কোনো রকমের হিসেব রাখা হয় না। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো কেমন যেন ক্ষেপে যায়। পাগলের মত করতে থাকে। তারপর শুরু হয় গালাগালি, হাতাহাতি,লাথালাথি।'

চিত্রগুপ্তের এই কথা শোনামাত্র নবাগত ভদ্রলোক এক দৌড়ে পরলোকের ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং প্রথমেই যাঁকে লাথি দিয়ে ফেলে দিলেন, তাঁর ফটোতে মৃত্যুর আগের দিন সকালেও তিনি মালা দিয়েছেন।

পুনশ্চঃ একটি গ্রাম্য বালক তার বাবার সঙ্গে শহরে এসেছে। শহরের রাস্তা-ঘাট, ট্রাম-বাস, বহুতল বাড়ি যা কিছু সে দেখছে, দেখে বিস্মিত হচ্ছে। তার বাবা ঠিক করল যে একটা খুব উঁচু বাড়িতে ঢুকে ছেলেকে লিফটে চড়াবে। ছেলেটি এর আগে লিফটে চড়া তো দূরের কথা এ জিনিস চোখেই দেখেনি। সুতরাং লিফটে চড়ার পরে লিফট যখন দ্রুতগতি উপরের দিকে উঠতে লাগল, ছেলেটি বিস্মিত হয়ে তার বাবাকে প্রশ্ন করল, 'বাবা, ভগবান কি জানে যে আমরা স্বর্গে যাচ্ছি ?'

পুনশ্চঃ : মহাত্মা মার্ক টোয়েনকে একদা এক ভদ্রমহিলা স্বর্গ এবং নরক বিষয়ে তাঁর অভিমত জানতে চান। মার্ক টোয়েন করজোড়ে বলেন, 'মাফ করবেন। কোনোটারই নিন্দে করতে পারব না। দু'জায়গাতেই আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।'

জবরদস্ত কথোপকথনের এ অবশ্য খুব উচ্চাঙ্গের উদাহরণ নয়। আসলে যেসব বাক্যালাপ সহসা কানে শুনে খুব একটা স্মার্ট বা সুচতুর বলে মনে হয় কাগজে কালিতে ছাপা হয়ে সেটাই কেমন যেন ভেতো-ভেতো, ঘষা-ঘষা লাগে।

আবার বলি, কথার কায়দা যে জানে সে জানে, যে জানে না সে জানে না। চেষ্টা করেও সেটা শেখা সম্ভব নয়।

একটি বিখ্যাত বিদেশি নাটকে এক বুদ্ধিমান গাধার চরিত্র ছিল। সেই নাট্যকারকে জনৈক স্থূলবুদ্ধি শ্রোতা প্রশ্ন করেছিলেন, 'এটা কি রকম আপনার নাটকে গাধা মানুষের মত কথা বলছে ?'

সহৃদয় নাট্যকার দর্শকপ্রবরের কাঁধে হাত রেখে স্নেহময় কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দ্যাখো, মানুষেরা যদি গাধার মত কথা বলতে পারে, গাধারা কেন মানুষের মত কথা বলতে পারবে না ?'

জর্জ বার্নাড শ, স্যার উইনস্টন চার্চিল অথবা ঘরের ভিতরে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত এমনকি সুদূর দিনের গোপাল ভাঁড়—এই সব মহাজনদের কথামালা থেকে রাশি রাশি উদ্ধৃতি দিয়ে এই রচনা এই মুহূর্তে সুদীর্ঘ করা সম্ভব। প্রতিপক্ষকে গাধা বানাতে এঁরা প্রত্যেকেই ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু আমার ততো উচ্চাভিলাষ নেই, সামান্য দিশি-বিলিতি রসিকতা, এক হাজার শব্দের সীমানায়, সেটা আমার পক্ষে আপাতত যথেষ্ট।

অন্য একটি সরস কথোপকথন স্মরণ করছি।

এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে শাসাচ্ছিলেন।

প্রথম ব্যক্তি : দ্যাখো তোমার ভাইকে এখন থেকে সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলতে বলো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : কেন সে কি বলেছে ?

প্রথম ব্যক্তি : সে আমার নামে যাচ্ছেতাই সমস্ত মিথ্যে কথা বলে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তাতে তোমার রাগের কী আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ভাই তোমার বিষয়ে সত্যিকথা বলছে তোমার আপত্তি করার কিছু নেই।

এরই পরিপূরক একটি কাহিনী আছে এক খবরের কাগজের সম্পাদককে নিয়ে। একদিন জনৈক কুখ্যাত রাজনীতিবিদ তাঁকে ফোন করে বললেন, 'দেখুন মশায়, আপনি আপনার কাগজে আমার নামে মদ্যপ, লম্পট, ঘুষখোর, জোচ্চোর এই সব কথা ছেপেছেন, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।' সম্পাদক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনি ভুল করেছেন, আমাদের কাগজে আপনার সম্পর্কে এরকম কিছু ছাপা হয়নি। হয়তো অন্য কেউ ছেপেছে। আমরা পুরনো, বাসি খবর ছাপি না।'

মনের কথা

'সই লো সই,
দুটো মনের কথা কই।'

গ্রাম্য লোকগাথায় একটি বিরহ বিধুর আখ্যান এইভাবে শুরু হয়েছে। লোক কাহিনীর নায়িকা তার প্রাণের সখীকে দুটো মনের কথা বলতে চাইছে।

আমাদের এই তরল নিবন্ধে কাব্য করার বিশেষ কোনো অবকাশ নেই। শুধু এবারে আমাদের বিষয় হলো মন বা মনের কথা সেই সূত্রে এই গানের কলিটি প্রথমেই মনে এল।

মন নিয়ে আধুনিক মানুষের সমস্যার অন্ত নেই। টাকা পয়সা, খ্যাতি প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা মানুষ কী যে চায় সে নিজেও জানে না। বাইরের জীবনযাত্রা ও তার প্রাপ্তির সঙ্গে ভিতরের মনের যোগ হয় না। মনের মধ্যে থেকে যায় দুরাশা ও স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ। দৈনন্দিনতার গ্লানি মনকে মলিন করে তোলে। কঠিন মনের অসুখে ভোগে মানুষ।

★ ★ ★

এই নিবন্ধের নাম মনের কথা হলেও আমরা ঐ মনের অসুখ বিশেষত মনের ডাক্তার নিয়ে আলোচনা করছি। আলোচনা ঠিক নয়, কয়েকটি ছড়ানো ছেটানো বাজে গল্প। এই গল্পগুলি অধিকাংশই মার্কিনী, কারণ সেখানেই মন নিয়ে যত সমস্যা, যত গোলমাল। শরীর

সারাতে যত লোক ডাক্তার দেখায় সেখানে তার চেয়ে বেশি লোক মনের ডাক্তারের কাছে যায়।

মনের ডাক্তার বা সাইক্রিয়াটিস্ট এখন প্রথম বিশ্বের সমাজ জীবনের প্রধান কুশীলবদের একজন। তাঁর কাছে সকলেই যায়, সকলেই তাঁকে মান্যগণ্য করে। তাঁর পরামর্শ সকলের শিরোধার্য। তাঁকে নিয়েই শুরু করা যাক।

দু-জন মনের ডাক্তারের মধ্যে ক্লাবে গল্পগুজব হচ্ছিল। প্রথম ডাক্তার দ্বিতীয় ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কাছে আমার এক পুরনো রোগী গিয়েছে। তার এখন কিসের ব্যামো ?' দ্বিতীয় ডাক্তার জানতে চাইলেন, 'কোন রোগী ?'

প্রথম ডাক্তার বললেন, 'ঐ যে অঙ্কের অধ্যাপক মিস্টার জন।' দ্বিতীয় ডাক্তার অবাক হলেন, 'ও, জন সাহেব তোমার কাছেও গিয়েছিলেন ? আমার কাছে এসেছেন একটা অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে, ওঁর ধারণা উনি অঙ্কের মাস্টার-টাস্টার কিছু নন, উনি নেহাতই এক রাজমিস্ত্রি।' প্রথম ডাক্তার একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জন সাহেবের ব্যামো সারল ?' দ্বিতীয় ডাক্তার বললেন, 'যথাসময়ে সারবে। তবে এর মধ্যে ওঁকে দিয়ে আমি বাড়ির ঘরটরগুলো একটু চুনকাম করিয়ে নিচ্ছি।'

প্রথম ডাক্তার এবার বিজ্ঞের মত মুখ করে বললেন, 'ঠিক আমিও তাই করিয়েছিলাম।' দ্বিতীয় ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'তুমিও ওঁকে দিয়ে ঘরদোর সব চুনকাম করিয়ে নিয়েছিলে ?'

'না, না। তা করাবো কি করে ?' প্রথম ডাক্তার বলে উঠলেন, 'জন সাহেব যখন আমার কাছে গিয়েছিলেন তখন তো উনি নিজেকে রাজমিস্ত্রি ভাবতেন না। তখন উনি ছিলেন কাঠের মিস্ত্রি। আমি ওঁকে দিয়ে কয়েকটা পুরনো চেয়ার টেবিল মেরামত করিয়ে নিয়েছিলাম।'

মনের ব্যামো অর্থাৎ মানসিক রোগ একেকজনের একেকরকম হয়। কারো কারো মনে ধারণা জন্মায় যে তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান। কেউ কেউ নিজেকে আলেকজান্দার বা হিটলার ভাবে।

এক মানসিক হাসপাতালের একই ঘরে পাশাপাশি দুই বেডে দুই রোগী ছিলেন। প্রথম রোগীটি নিজেকে আলেকজান্দার ভাবেন, মধ্যে মধ্যে বেডের উপর দাঁড়িয়ে 'লেফট-রাইট, লেফট-রাইট' মার্চ করতে করতে ভারত অভিযানে অগ্রসর হোন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। তিনি সদাসর্বদা চোখ বুজে ঝিম মেরে পড়ে রয়েছেন। ডাক্তাররা ধরতেই পারছেন না তাঁর কি সমস্যা! কিছু প্রশ্ন করলেই 'হুঁ', 'হাঁ' বলে পাশ কাটিয়ে যান।

এই দ্বিতীয় রোগী সম্পর্কে অবশেষে ডাক্তাররা যখন সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়েছেন সেই সময় সহসা ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

ডাক্তাররা দ্বিতীয় রোগীকে প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন, প্রথম রোগীকে সেদিন জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছিলেন। চলতে চলতে অবশেষে অনিবার্য প্রশ্নটি উঠল, জিজ্ঞাসা করা হলো কে আপনাকে বলেছে যে আপনিই আলেকজান্দার। অন্যদিন রোগী এই প্রশ্নটি এড়িয়ে চলেন কিন্তু আজ কি ভেবে দুম করে বলে বসলেন, 'স্বয়ং ভগবান বলেছেন।'

এবং এই উত্তর দেয়া মাত্র পাশের খাট থেকে ঝিমুনিরত দ্বিতীয় ব্যক্তি লাফিয়ে গর্জন করে উঠলেন, 'শাট আপ। মিথ্যেবাদী, আমি তোমাকে কখনো একথা বলিনি।'

এতদিনে দ্বিতীয় ব্যক্তির মনের ব্যামো ধরা গেল, তিনি নিজেকে ভগবান ভাবছেন।

এতদূর লিখে ফেলে কেমন একটা খটকা লাগছে, এ গল্পটা আগেও লিখেছি নাকি ? কবে,কোথায় কিছুই খেয়াল করতে পারছি না। সুতরাং ভগবানের বিষয়ে আরেকটা মনের অসুখের গল্প বলি।

মানসিক রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। এই রোগীকে ডাক্তারবাবু প্রথম দেখছেন সুতরাং অনেক কিছু জানতে হবে। তিনি রোগীকেও তাই বললেন, 'দেখুন এর আগে তো আপনাকে আমি দেখিনি। আপনাকে দেখতে হলে আপনার পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হবে। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার বিষয়ে সমস্ত কথা একেবারে প্রথম থেকে বলুন।'

রোগী বললেন, 'একেবারে প্রথম থেকে বলব।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঠিক তাই।'

রোগী বললেন, 'প্রথমে আমি স্বর্গ এবং মর্ত্য নির্মাণ করলাম।'

ডাক্তারবাবুকে আর বিশেষ কষ্ট করতে হলো না। বুঝতে পারলেন ইনি যে সে ব্যক্তি নন, স্বয়ং ঈশ্বর। পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।

কিন্তু সবাই তো নিজেকে ভগবান ভাবে না। ফরাসি জোক বুকে এক বায়ুরোগগ্রস্তের গল্প পেয়েছি যে নিজেকে বেড়াল ভাবত। তার স্ত্রী ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, 'ডাক্তারবাবু রক্ষা করুন। আমার স্বামী নিজেকে বেড়াল ভাবেন।'

এই কথা শুনে বিচলিত ডাক্তারবাবু বললেন, 'বলুন তো, এ সম্পর্কে আমি কী করতে পারি।'

স্ত্রী বেচারী বললেন, 'আর কিছু না করুন, অন্তত আমার স্বামীর ইঁদুর ধরে খাওয়া বন্ধ করুন।'

আরেকটি বাজে গল্প।

মনের ডাক্তার রোগীকে বললেন, 'মনের কথা খোলসা করে বলুন। আপনি সরল হয়ে কথা বলুন।'

রোগী বললে, 'সে খুব কঠিন কাজ সে আমি পারব না। সরল হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

ডাক্তারবাবু বিভ্রান্ত বোধ করলেন, মুখে বললেন, 'মানে ?'

রোগী বললেন, 'মানে খুব সোজা। আমার নাম হলো অনল। আমার খুড়তুতো ভাইয়ের নাম সরল, সে মহা বদমাস আর মাতাল।

সে আমি হতে পারব না। ডাক্তারবাবু দয়া করে আমাকে সরল হতে বলবেন না।' রোগী হাত জোড় করলেন।

★ ★ ★

এই অবান্তর নিবন্ধ আরম্ভ করেছিলাম গানের কলি দিয়ে। এতগুলি হাস্যকর আখ্যানের অন্তে আরেকটি গানের কলি মনে পড়ছে, পুরনো এক বাংলা গান, সুদূর দিনের পৃথিবী থেকে ভেসে আসছে,

'মন চলো নিজ নিকেতনে।'

মনের পক্ষে নিজ নিকেতনে যাওয়া খুব সহজ সাধ্য নয় তাই আমরা মনের অসুখে ভুগি, মনের অসুখ নিয়ে তুচ্ছ হাসাহাসি করি।

পরিবর্তন

একটি সুবিখ্যাত আন্তর্জাতিক মাসিকপত্রে 'জীবন যে রকম' (Life's like that) নামে একটি জনপ্রিয় ফিচার আছে। প্রতিমাসেই সেখানে বিভিন্ন চমকপ্রদ আখ্যানমঞ্জরী প্রকাশিত হয় এবং সে সবই তথাকথিত সত্যঘটনা অবলম্বনে।

পরিবর্তন সংক্রান্ত এই নিবন্ধে ঐ আখ্যানগুলির একটি দুটিকে টেনে আনা আশা করি অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

ভণিতা আপাতত থাক। আসল গল্পে যাই।

লন্ডনপ্রবাসী এক ভারতীয় পরিবার বিলেত থেকে তাদের আস্তানা গুটিয়ে মার্কিন দেশে যাচ্ছে। পরিবারটি যেমন হয় বেশ ছোট আকারের—স্বামী, স্ত্রী এবং একটি পাঁচ বছরের কন্যা। মার্কিন যুক্তরাজ্যের লস এঞ্জেলেসের বিমানবন্দরে তাঁরা নেমেছেন, যখন বিমানবন্দর থেকে পরিবারটি বেরিয়ে আসছেন সামনে একটা ওজন নেয়ার যন্ত্র। মা এবং মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে, বাবা গেছেন তত্ত্বতালাস করতে শহরে যাওয়ার ব্যাপারে।

ওজনের যন্ত্রটা সামনে দেখে মা মেয়েকে বললেন, 'আমেরিকায় ঢোকার আগে তোর ওজনটা নিয়ে নিই।' মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওজন যন্ত্রে চেপে নিজের ওজনটা নিল। যন্ত্রের ভেতর থেকে কার্ড বেরিয়ে এল, সেটা দেখে সে তার মাকে বলল, 'আমার ওজন হলো তিরিশ ডলার।'

শুনে মাতৃদেবী রীতিমতো বিস্মিত হলেন, ডলারে আবার ওজনের হিসাব কি রকম, মেয়েটা তো খুব বোকা হচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কন্যাকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন, 'তিরিশ ডলার বলছো কেন, তিরিশ পাউণ্ড হবে তোমার ওজন।'

এ কথায় পাঁচ বছরের শিশু কন্যাটি কিন্তু প্রতিবাদ করল, 'তুমি জানো না এটা লন্ডন নয় এটা আমেরিকা। এখানে সব বদলে গেছে। সব পাউন্ড ডলার হয়ে যাবে।'

এ গল্পটা হয়তো সত্যি হলেও হতে পারে। এরকম আশ্চর্য সব সিদ্ধান্তে অনেক শিশুই অনায়াসে পৌঁছে যায়।

শিশুরা কোনো কিছুর পরিবর্তন দ্রুত অনুভব করতে পারে। আমি হাজারিবাগ শহরে কলকাতার এক হাওয়া-খেতে-যাওয়া পরিবারের নাবালক পুত্রের একটা কথা শুনে একবার খুব অবাক হয়েছিলাম। সেই ছেলেটি বলেছিল, যে হাজারিবাগের কাকেরা কলকাতার কাকের চেয়ে অনেক বেশি কালো।

হাজারিবাগের কাক আর কলকাতার কাক পাশাপাশি মিলিয়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু তার কথা শুনে হাজারিবাগের দু'একটা কাক ভালো করে লক্ষ্য করে দেখার পর আমারও কেমন যেন মনে হয়েছিল এগুলো যেন একটু বেশি কালো।

শিশুদের মতই মাতালদেরও অনুভব শক্তি খুব সূক্ষ্ম হয়। যে কোনো পরিবর্তন তারা চট করে ধরতে পারে। পানীয় জল বা সোডা বেশি দিলে কিংবা গেলাস থেকে সামান্য কিছুটা পানীয় ঢেলে নিলে যে কোনো মাতালই টের পায়। তবে পরিবর্তন সচেতন সেই প্রবাদপ্রসিদ্ধ মদ্যপের গল্পটি অবিস্মরণীয়।

বারে একসঙ্গে দুজনে মুখোমুখি বসে মদ্যপান করেছিল। একটু বেশিই করেছিল। হঠাৎ প্রথম মদ্যপ প্রথমে চশমা দিয়ে তারপর চোখ থেকে চশমা খুলে দ্বিতীয় মদ্যপের মুখের দিকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে তাকিয়ে দ্বিতীয় মদ্যপকে বলল, 'এই তুই আর মদ খাসনে।'

এই উপদেশে দ্বিতীয় মদ্যপ স্বভাবতই খুব বিরক্ত হলো এবং ভুরু কুঁচকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন ? কেন খাবো না ?' তখন প্রথম মদ্যপ বলল, 'তোর ভালোর জন্যই বলছি। তোর মুখটা একদম ঝাপসা হয়ে গেছে। তুই তাড়াতাড়ি বদলিয়ে যাচ্ছিস, তুই আর এখন মদ খাসনে।'

★ ★ ★

বিখ্যাত দার্শনিক বলেছিলেন যে পৃথিবীতে কিছুই পরিবর্তিত হয় না, শুধু আমরাই বদলিয়ে যাই। কথাটা যতটুকু দর্শন ততখানিই বাস্তব।

বাংলাভাষায় রচিত শেষতম বাল্যস্মৃতি 'যখন ছোট ছিলাম' নামক অসামান্য গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় এই পরিবর্তনের একটা অতি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।

'যখন ছোট ছিলাম' বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় আছে,…'ইস্কুল ছাড়ার বছর দশেক পরে কোনো একটা অনুষ্ঠানে, বোধহয় পুরনো ছাত্রদের সম্মেলনে—আমাকে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে যেতে হয়েছিল। হলঘরে ঢুকে মনে হয়েছিল—এ কোথায় এলাম রে বাপ ! এ ঘর কি সেই ঘর—যেটাকে এত পেল্লায় বলে মনে হত ? দরজায় যে মাথা ঠেকে যায়। শুধু দরজা কেন, সবই যেন ছোট ছোট মনে হচ্ছে—বারান্দা, ক্লাসরুম, ক্লাসের বেঞ্চিগুলো।

'অবিশ্যি হবে নাই বা কেন। যখন স্কুল ছেড়েছি তখন আমি ছিলাম পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, আর এবার যে ফিরে এলাম, এখন আমি প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। স্কুল তো আছে যেই কে সেই,

বেড়েছি শুধু আমিই ।'...

একটা ইংরেজি গল্প এবার বলি । পরিবর্তনের ইংরেজি হলো চেঞ্জ । আবার চেঞ্জ মানে চলতি ভাষায় খুচরো, যেমন দশ টাকার চেঞ্জ, এক টাকার চেঞ্জ । এটা চেঞ্জের গল্প ।

একটা সিকি নিয়ে খেলা করছিল একটি বাচ্চা ছেলে । এক সময় তার মা খেয়াল করলেন যে বাচ্চা ছেলেটি খেলছে ঠিকই কিন্তু তার হাতে বা কাছাকাছি কোথাও সিকিটি দেখা যাচ্ছে না । যে কোনো জিনিস গিলে ফেলার দিকে শিশুদের একটা ঝোঁক থাকে, এরও ছিল । ফলে, শিশুটির মার মনে খটকা দেখা দিল । 'সর্বনাশ, ছেলে সিকিটিকে গিলে ফেলেনি তো ?'

অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে পারিবারিক ডাক্তারকে ডাকা হলো । এই ডাক্তার নিয়মিতই এই শিশুটিকে জন্ম থেকে দেখে আসছেন । তিনি আসার পর শিশুটির মা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তারবাবু খোকাকে দেখুন তো ওর মধ্যে কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন কিনা ?' অর্থাৎ সিকিটি ওর মধ্যে আছে কিনা ?

পুনশ্চঃ অপরিবর্তনীয় সেই বহুলিখিত, বহুকথিত, বহুপঠিত গল্পটি অবশেষে বলি । এখন আর গল্পাকারে বলা শোভন হবে না, নাট্যাকারে বলছি ।

বাজারের রাস্তায় দুই ব্যক্তির মুখোমুখি দেখা । প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জাপটিয়ে ধরে যাকে বলে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন, 'ভাবিনি দেখা হলে চিনতে পারব ।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (দম নিতে নিতে) 'হুঁ ।'

প্রথম ব্যক্তি : (আবেগময় কণ্ঠে) 'কতদিন পরে দেখা ।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি : 'হুঁ ।'

প্রথম ব্যক্তি : 'কত পালটিয়ে গেছিস । আগে কত রোগা ছিলি এখন মোটা হয়ে গেছিস ।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি : 'হুঁ ।'

প্রথম ব্যক্তি : 'আগে মাথাভর্তি চুল ছিল । এখন এত বড় একটা টাক ।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি : 'হুঁ ।'

প্রথম ব্যক্তি : 'তোর গায়ের রঙ কত ফর্সা ছিল এখন এত কালো হয়ে গেছিস ।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি : 'হুঁ ।'

প্রথম ব্যক্তি অতঃপর আরো আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আরো আবেগতাড়িত দীর্ঘনিঃশ্বাস নিলেন । তারপর—

প্রথম ব্যক্তি : 'কি রে উপেন, কি করে এত বদলিয়ে গেলি ? তোকে যে আরেকটু হলে আমি বোধহয় চিনতেই পারতুম না ।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (প্রথম ব্যক্তির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে যথাসাধ্য ছাড়াতে ছাড়াতে) 'ছেড়ে দিন । আমি উপেন নই ।'

প্রথম ব্যক্তি : (রীতিমতো বিস্মিত) 'সে কি রে ? তুই উপেন নোস । তোর তাহলে কি নাম ?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি : 'আমার নাম ভূপেশ ।'

প্রথম ব্যক্তি : (ভূপেশের চিবুক ধরে অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে) 'নামটাও পালটিয়ে ফেলেছিস ?'

বিশ্বাস-অবিশ্বাস

এক বিদেশি কবি লিখেছিলেন,

'বিশ্বাসহীন বেঁচে থাকা
আর ঘন কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালানো
দুটোই এক ব্যাপার।'

এই বিশ্বাস, অনেক সময়েই হয়তো ভগবানে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস, কিন্তু সব সময়ে তা নয়। আরো অনেক বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে, সুদিন আসবে, দেশ স্বাধীন হবে, ছেলে মানুষ হবে, নাতবৌ সংসারে আসবে। ছোট বড়, সামান্য বৃহৎ, ক্ষুদ্রের চেয়েও ক্ষুদ্র, মহতের চেয়েও মহীয়ান বিশ্বাসকে আশ্রয় করে মানুষ বাঁচে।

আবার বিশ্বাসকে ভর করেই মানুষ প্রাণ দেয়। অটল অচল সেই বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস কখনো আল্লা হো আকবর, কখনো বা চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, আবার কখনো নিতান্তই বন্দেমাতরম।

বিশ্বাসের কোনো সূত্র নেই, সংজ্ঞা নেই। যদি তুমি কিছু বিশ্বাস করলে তো করলে, সে ভূত কিংবা ভগবান কিংবা এ দুয়ের মধ্যে যাই হোক। আর যদি না করো নাই করলে, বিশ্বাস যত সহজ অবিশ্বাসও তত অনায়াস।

খরার দেশে বৃষ্টির সেই আশ্চর্য গল্পটা মনে আছে? প্রচণ্ড খরা চলছে সারা এলাকা

জুড়ে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছর শেষ হতে চলল এক বিন্দু বৃষ্টি নেই, আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই। সারাদিন রোদে পোড়া আকাশ তামার থালার মত বিবর্ণ, নিচে রুক্ষ মাটির পৃথিবীতে ফুল নেই, ফল নেই, ফসল নেই।

অবশেষে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল বরুণদেবের উপাসনা করবে, বৃষ্টির দেবতার কাছে সবাই করজোড়ে প্রার্থনা করবে বারিধারার জন্যে। পাঁজি পুঁথি ঘেঁটে একটি উপযুক্ত সন্ধ্যালগ্ন পাওয়া গেল সে জন্যে। নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় প্রার্থনার নির্দিষ্ট স্থানে এলাকার সমস্ত লোক একত্র হলো দেবতার কাছে প্রার্থনার জন্য।

সবাই ঠিকঠাক এসেছে। শুধু এক হাস্যকর চরিত্র একটি ছাতা নিয়ে এসেছে সঙ্গে। 'সন্ধ্যাবেলা ছাতা দিয়ে কি হবে ?' সকলের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবে সেই চরিত্রটি বলল, 'আগে বল, তোমরা ছাতা আনোনি কেন ?' সবাই বলল, 'ছাতা ? ছাতা দিয়ে কি হবে ? সন্ধেবেলা কি রোদ উঠবে ?'

হাস্যকর চরিত্রটি বলল, 'রোদ কেন ? আমরা এসেছি বৃষ্টির প্রার্থনায়। বৃষ্টি তো আসবে। তখন ভিজতে হবে তোমাদের।'

সেদিন প্রার্থনা শেষে সত্যিই অঝোরধারায় বৃষ্টি নেমেছিল। সব অবিশ্বাসী প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল জলধারায়। শুধু সেই হাস্যকর মানুষটি ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে একাকী বাড়ি ফিরেছিল।

★ ★ ★

বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রসঙ্গে দার্শনিকরা অবশ্য এক সময়ে খুবই বাড়াবাড়ি করেছেন। যেমন করছেন একালের চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীরা।

সেই যে দার্শনিক বলেছিলেন, 'পাখিরা যে উড়তে পারে আর আমরা যে উড়তে পারি না তার একমাত্র কারণ হলো পাখিরা বিশ্বাস করে যে তারা উড়তে পারবে এবং সেই বিশ্বাসেরই অন্য নাম ডানা বা পাখা।

এই দর্শন তত্ত্ব পাঠ করে সত্যি যদি কোনো মানুষ মনে করে যে সেও পাখির মত উড়তে পারবে তবে তার পরিণাম সাংঘাতিক হতে পারে।

মাতালদের সেই পুরনো গল্পটাই আবার স্মরণ করা যেতে পারে।

এক ব্যক্তি নার্সিংহোমে হাত-পা মাথা ব্যান্ডেজ করা গুরুতর আহত অবস্থায় শায়িত। তাকে তার বন্ধু দেখতে এসেছে। আহত ব্যক্তির নাম রাম আর বন্ধুটির নাম শ্যাম।

রাম শ্যামকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই আমার এ দশা হলো কি করে রে ?'

শ্যাম বলল, 'তোর নিজের দোষে।'

রাম বলল, 'কি দোষ করেছিলাম আমি ?'

শ্যাম বলল, 'সেই যে আমরা ক্লাবের দোতলায় বসে মদ খাচ্ছিলাম কাল রাতে। রাত বারোটার সময় হঠাৎ তোর কি মতলব হলো, তুই বললি যে, আমি এখন ইচ্ছে করলেই পাখি হতে পারি, পাখির মত উড়তে পারি।'

রাম বলল, 'সর্বনাশ।'

শ্যাম বলল, 'সর্বনাশই তো হলো। ক্লাব শুদ্ধ লোক বলল, অসম্ভব, মানুষের পক্ষে পাখির মত ওড়া অসম্ভব।'

রাম বলল, 'তারপর ?'

শ্যাম বলল, 'তারপর আর কি ? তুই সকলের সঙ্গে বাজি ধরলি। আর তারপর ক্লাবের বারান্দায় গিয়ে দোতলা থেকে হাত দুটো ছড়িয়ে শূন্যে উড়ে যেতে চেষ্টা করলি। আর সঙ্গে সঙ্গে নিচের বাঁধানো উঠোনে পড়ে হাত-পা-মাথা ভাঙলি।'

রাম করুণ কণ্ঠে বলল, 'তুই আমার এতদিনের পুরনো বন্ধু, তুই আমাকে বাধা দিলি না ?'

শ্যাম বলল, 'কি আর বাধা দেবো ? আমারও নেশাটা খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল। কেমন বিশ্বাস হয়েছিল যে তুই সত্যিই উড়তে পারবি। আমি যে নিজেও তোর পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার ওপরে বাজি ধরেছিলাম।'

বিশ্বাস নিয়ে এ এক ধরনের সমস্যা। মদ খেয়ে বা না খেয়ে নিজের উপর অন্ধ বিশ্বাস করে বহুলোক সর্বনাশ ডেকে আনেন। কবি লেখেন,

'গাছের হলুদ পাতার মত
একে একে,
আমার বিশ্বাসগুলি
একে একে,
জীবনের ডাল থেকে ঝরে যাচ্ছে।'

পুনশ্চঃ বিশ্বাস সংক্রান্ত শেষতম গল্পটি মারাত্মক। গল্পটি যেহেতু পরলোকগত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিয়ে সুতরাং নিশ্চয়ই খুব পুরনো। কিন্তু এ গল্পটা আমি আগে কখনো শুনিনি, কোথাও পড়িওনি।

কথাটা হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে তখন তার সীমানা ছিল দিগন্তবিস্তৃত বলা হতো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। কথাটার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি আছে মনে হলেও আসলে এটা এক অর্থে ভৌগোলিক সত্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মহাদেশগুলির মধ্যে এতদূর প্রসারিত ছিল যে যখন তার এক অংশে সূর্য অস্ত যেতো ঠিক তখনই অন্য এক অংশে সূর্য উদিত হতো। ফলে পুরো রাজ্যে কখনোই সূর্য অস্ত যেতো না।

আইরিশদের সঙ্গে চিরদিনই ইংরেজদের মন কষাকষি। বাদ-বিসম্বাদ। একজন আইরিশ সুযোগ পেলেই ইংরেজদের সম্পর্কে কটু ও অপমানজনক মন্তব্য করে।

সুতরাং এ কথা যখন আইরিশরা শুনল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, তখন একজন আইরিশ বলল, যে, 'এটা খুবই ভালো কথা। খবরটা শুনে খুব স্বস্তি পাওয়া গেল।'

ভূতের মুখে রামনামের মতো একজন আইরিশের মুখে ইংরেজদের এই প্রশস্তি বা স্তুতিবাক্য শুনে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ এরপর একটু থেমে গলা নামিয়ে সেই আইরিশ বলেছিল, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যে সূর্য অস্ত যায় না, এটা প্রকৃতই খুবই সুখবর বিশেষ করে এই সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের জন্যে। কারণ, সূর্যাস্তের পর ইংরেজদের মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। সূর্যাস্ত না হওয়াই লোকদের পক্ষে নিরাপদ।'

দুর্ঘটনার আগে ও পরে

ডেভিড কপারফিল্ড নামক সেই বহুপঠিত, সুবিখ্যাত উপন্যাসে চার্লস ডিকেন্স মহোদয় দুর্ঘটনা বিষয়ে লিখেছিলেন যে, 'সবচেয়ে সুশৃঙ্খল পরিবারে যেমন দুর্ঘটনা ঘটবে, তেমনি ঘটবে বিশৃঙ্খল পরিবারে।'

ডিকেন্স সাহেব অন্য এক সূত্রে এই কথাটি বলেছিলেন, তবে তাঁর ওই মন্তব্য সর্বোতোভাবে গ্রহণযোগ্য। দুর্ঘটনা কোন্ পরিবেশে, কখন ঘটবে সে বিষয়ে কারো পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। যদি বলা সম্ভব হয় তাহলে সেটাকে দুর্ঘটনা বলা যাবে না।

ইংরেজিতে 'গড্‌স অ্যাক্ট' (God's Act) বলে একটি কথা আছে। যা কিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাস্তায় একটি কুকুর ছানাকে বাঁচাতে পাশ কাটাতে গিয়ে যাত্রীসুদ্ধ গাড়ি খাদে পড়ে গেল কিংবা বাথরুমে পা পিছলিয়ে পড়ে তোমার সাধের কোমর দুমড়িয়ে গেল, এ সবই গড্‌স অ্যাক্ট। পুরনো বাড়ির ছাদ মাথায় ভেঙে পড়লো কিংবা লিফটের দড়ি ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেল এগুলোও হয়তো গড্‌স অ্যাক্টের পর্যায়ে পড়ে তবে এর মধ্যে হয়তো মানুষী তদারকির অভাব বা অবহেলা। উপেক্ষার ব্যাপার থাকতে তখন সেটা আর ঈশ্বরীয় নয়। বরং সেখানে দোষী বা দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারলে তাকে ফৌজদারির সোপর্দ করে দণ্ড সংহিতা অনুসারে সাজা দেওয়াও সম্ভব।

দুর্ঘটনার কাহিনীর সেই আদিম উদাহরণটি স্মরণ করছি। সবাই জানেন গল্পটা তাই খুব

ছোট করে লিখছি।

রাজপথের পাশে একটি অট্টালিকা নির্মিত হচ্ছে। এক রাজমিস্ত্রি সেই নির্মীয়মাণ অট্টালিকার দ্বিতল থেকে পা পিছলিয়ে পড়ে গেলেন রাজপথে এক পথচারীর ঘাড়ে।

যথাভাগ্য! সেই পদস্খলিত রাজমিস্ত্রির কিছু হলো না সেই দুর্ঘটনায়, পথচারী ভদ্রলোক কিন্তু ঘাড় ভেঙে নিহত হলেন। ভদ্রলোকের ছেলে রাজমিস্ত্রির বিরুদ্ধে মামলা আনলেন আদালতে। তাঁর বাবার মৃত্যুর বিচার চাই।

আদালত খুব মনোযোগ দিয়ে দুই পক্ষের এবং সাক্ষীদের সকলের সবকথা শুনলেন। তারপর অনেক বিবেচনা করে বললেন, 'এর আর কী করা যাবে। গড্স অ্যাক্ট। এতে কারো কোনো হাত নেই, আকস্মিক, নিতান্ত আকস্মিক এই দুর্ঘটনা, ঐ রাজমিস্ত্রিকে কী সাজা দেবো।'

কিন্তু মৃতের পুত্র ভয়ঙ্কর জেদ করতে লাগলেন, বললেন, 'আমার বাবার মৃত্যুর জন্যে এই রাজমিস্ত্রি দায়ী। ওকে আপনি কী করে খালাস দেবেন?'

আদালত বাদীকে বললেন, 'কিন্তু ঐ রাজমিস্ত্রির সঙ্গে তো আপনার বাবার কোনো শত্রুতা বা বিবাদ ছিল না। ওকি আর ইচ্ছা করে আপনার বাবার মাথার উপরে পড়েছে।'

কিন্তু মৃতের পুত্র ছাড়বে না, আরো জোর করতে লাগল। অবশেষে বিচারক সেই ঐতিহাসিক রায় দিলেন,'রাজমিস্ত্রি পথ দিয়ে হেঁটে যাবে আর দোতলা থেকে মৃত ব্যক্তির পুত্র তার উপরে লাফিয়ে পড়বে। এছাড়া এই মামলার আর কোনো সাজা যুক্তিযুক্ত হবে না।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উক্ত বাদী কখনোই ছাদ থেকে লাফ দিয়ে রাজমিস্ত্রির উপরে পড়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেনি।

এই সূত্রে ছাদ থেকে রাস্তার লোকের ঘাড়ে পড়ার ঘটনা সম্পর্কে এক মহাজনের বক্তব্য বলি।

সেই মহাজন বলেছিলেন যে কেউ যদি একদিন হঠাৎ পা পিছলিয়ে ছাদ থেকে রাস্তার কোনো লোকের ঘাড়ে পড়ে তবে সেটা হবে দুর্ঘটনা।

আর যদি সেই লোকটি পরপর দু'দিন ঐভাবে পা পিছলিয়ে একটা পথচারীর ঘাড়ে পড়ে তাহলে সেটা হবে ইংরেজিতে যাকে বলে কয়েনসিডেন্স (coincidence) একটা চমকপ্রদ মিলের ঘটনা।

অতঃপর যদি তার পরের দিনও ঐ ব্যক্তি উক্ত পথচারীর ঘাড়ে পড়ে তবে তখন আর তাকে দুর্ঘটনা বা কয়েনসিডেন্স বলে অভিহিত করা যাবে না। সেটা হবে অভ্যাস, একটি খারাপ অভ্যাসের নমুনা।

খবরের কাগজে দুর্ঘটনার সংবাদ ক্রমাগতই বের হয়। কখনো লোক ভর্তি ট্রাক খাদে পড়ে যায়, কখনো ট্রামে-বাসে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, কখনো বা বিধ্বংসী আগুনে বিশাল বাজার পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

দু'রকম খুচরো দুর্ঘটনার খবর দৈনিকে প্রায় নিয়মিতই ছাপা হয়। এক, ছাদ থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু এবং মোটর দুর্ঘটনায় যাত্রাদলের নায়ক নায়িকা আহত।

এই রকম সংবাদে ভুল করে একটি কাগজে এক যাত্রা দলের নায়িকার মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছিল। সে মহিলা কিন্তু মারা যাননি, দুর্ঘটনায় সামান্য আহত হয়েছিলেন। তিনি খবরের কাগজ অফিসে ফোন করলেন, ফোন করে বললেন, 'দেখুন, আমি জলজ্যান্ত বেঁচে আছি।

আর আপনারা আমার মৃত্যু সংবাদ আপনাদের কাগজে ছাপিয়ে দিলেন।'

খবরের কাগজের দপ্তর থেকে তাঁকে নাকি বলা হয়েছিল, 'ভুল হয়ে গেছে ম্যাডাম। যা হোক আমরা ভুলটা সংশোধন করে দিচ্ছি। কালকের কাগজেই আপনার জন্মসংবাদ ছেপে মৃত্যুটা শুধরে দিচ্ছি।'

তবে দুর্ঘটনার কাহিনী বহু সময়েই খুব তরলভাবে পরিবেশিত হয়।

এক কাল্পনিক কৃপণের একটাই মাত্র চামচে ছিল। সেই চামচের গা থেকে চিনি চেটে খেতে গিয়ে তিনি সেই চামচেটা গিলে ফেলেন। খবর পেয়ে পাড়ার ডাক্তার তাঁকে দেখতে আসেন, ঐ ঘটনার দু'দিন পরে।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে ?' ভদ্রলোক শুকনো মুখে বললেন, 'খুব অসুবিধে হচ্ছে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'কী অসুবিধে ?' ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে বললেন, 'এই দু'দিন ধরে চায়ের চিনি গুলতে পারছি না। আঙুল চুবিয়ে গুলতে গেলে আঙুলে গরম চায়ের ছ্যাকা লাগছে।' বলে ডান হাতের তর্জনী তুলে ডাক্তারকে দেখালেন।

পুনশ্চঃ একটি অভাবিত কথোপকথন :—

(অল্প আগে একটি পথদুর্ঘটনা ঘটে গেছে, দুটি গাড়ি মুখোমুখি ধাক্কা মেরেছে, দুটিরই হেডলাইট ভেঙেছে, সামনের বনেট দুমড়িয়ে গেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। দুই গাড়ির চালক এবং পুলিশ সার্জেন্ট, সেই সঙ্গে বহু পথচারী জটলা করছে, কেউ হতাহত হয়নি এটাই সুখের কথা।)

সার্জেন্ট সাহেব : (প্রথম ড্রাইভারের প্রতি) আপনি এবার যেতে পারেন।

দ্বিতীয় ড্রাইভার : আমি ?

সার্জেন্ট সাহেব : আপনাকে থানায় যেতে হবে ?

দ্বিতীয় ড্রাইভার : কেন ?

সার্জেন্ট সাহেব : কেন আবার কী ? এই দুর্ঘটনার জন্যে আপনিই দায়ী, তাই আপনাকে থানায় যেতে হবে।

দ্বিতীয় ড্রাইভার : আপনি বলছেন কি। আমি ছিলাম রাস্তার বাঁ দিকে আর ঐ ভদ্রলোক ডান দিকের থেকে এসে ওভারটেক করতে গিয়ে ধাক্কা দিলেন। এখনো আমার গাড়িটা বাঁ দিকে রয়েছে।

সার্জেন্ট সাহেব : তা থাকুক। আপনিই দায়ী, আপনাকেই থানায় যেতে হবে।

দ্বিতীয় ড্রাইভার (মারমুখী হয়ে) : আশ্চর্য ! কারণটা বলবেন কি ঐ ভদ্রলোক থানায় না গিয়ে আমি কেন থানায় যাবো ?

সার্জেন্ট সাহেব (গম্ভীর মুখে) : সত্যিই কারণটা জানতে চান ? তা হলে শুনুন ঐ ভদ্রলোক হলেন আমাদের পুলিশ কর্তার শালা আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভগ্নিপতি। এবার চলুন থানায়।

পণ্ডিত

'পণ্ডিত' শব্দটি সংস্কৃত হলেও ইরেজি ভাষার সূত্রে এখন সারা পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। ইংরেজি অভিধানে বহুকাল হলো শব্দটি চুকে গেছে। ভারতীয় প্রায় সব ভাষাতেই শব্দটি সচল।

আধুনিক বাংলা ভাষায় 'পণ্ডিত' শব্দটি অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই বিদ্রূপার্থে ব্যবহৃত হয়। আগেও যে হতো না তা নয়, টুলো পণ্ডিত বা বুনো পণ্ডিত এ জাতীয় বিশেষণযুক্ত কথা স্পষ্টই মনে করিয়ে দেয় যে পণ্ডিত শব্দের একটা হেয়ভাবে ব্যবহারও ছিল।

যে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পণ্ডিত উপাধিতে ভাস্বর ছিলেন কিংবা তারপরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অথবা অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত বলে সম্মানিত হতেন সেই যুগেই 'কানা-কানা খানা-খানা কেমন লাগে কুমির ছানা' গল্পের শেয়ালপণ্ডিতমশাই ঘরে ঘরে জনপ্রিয়।

এই সময়েই এক স্বনামধন্য পণ্ডিত, খুব সম্ভব অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহোদয় পণ্ডিতের এক নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন।

কয়েক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁকে এক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। যাতে তিনি সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে রাজি হন সেই জন্যে তাঁরা বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত ইত্যাদি নানারকম বিশেষণে তোয়াজ ও তোষামোদ করতে লাগলেন।

বিদ্যাভূষণ মহোদয় পণ্ডিত হলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এইসব শুনে বললেন

যে, 'হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই বলেছেন, আমি অবশ্যই পণ্ডিত, তবে আমি হলাম সেই ধরনের পণ্ডিত—সর্ব কর্মং পণ্ডয়তি য সঃ—অর্থাৎ সব কাজ পণ্ড করে দেয় যে।' এই বলে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের তিনি সভাপতি হতে রাজি না হয়ে বিদায় করে দিলেন।

পণ্ডিতদের সম্পর্কে চলতি অধিকাংশই তাদের বোকামির গল্প। বেশি লেখাপড়া জানা লোকের বৈষয়িক বা জাগতিক বুদ্ধির অভাব থাকে—এরকম একটা ধারণা বহু দিন ধরেই চলছে।

এর বিপরীতধর্মী বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন এক পণ্ডিতের আখ্যান বলি। গল্পটা অন্য আকারেও অবশ্য প্রচলিত আছে।

আগেকার দিনে জমিদার বাড়িতে বৎসরান্তে পুজোর সময় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের বন্দোবস্ত ছিল। পণ্ডিতেরা পুজোর আগে ধনীগৃহে গিয়ে বার্ষিকী নিয়ে আসতেন। তাঁদের নামের তালিকা জমিদার বাড়ির নায়েবের খাতায় লেখা থাকত। সেই তালিকা দেখে যার যা প্রাপ্য বৎসরান্তে দেওয়া হত।

এক পণ্ডিতের ঐ বার্ষিকীর খাতায় নাম ছিল। পরপর কয়েক বছর নানা কারণে তিনি বার্ষিকী নিতে জমিদার বাড়িতে আসতে পারেননি। এ সব ক্ষেত্রে অর্থাৎ কেউ দু'তিন বছর বার্ষিকী নিতে না এলে তাঁর নাম খাতা থেকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হোত।

এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সুতরাং দু'তিন বছর পরে যখন পণ্ডিত আবার বার্ষিকী নিতে এলেন, এসে দেখলেন তাঁর নাম কাটা গেছে। গোমস্তা-নায়েবরা বললেন এ বিষয়ে তাঁরা কিছু করতে পারবেন না। তখন বাধ্য হয়ে পণ্ডিতমশায় জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। জমিদারবাবু সদাশয় ব্যক্তি, তাছাড়া সে বছরই তিনি সদ্য পিতামহ হয়েছেন, তাঁর প্রথম পুত্রের একটি পুত্র জন্মেছে। তিনি পণ্ডিতমশায়ের সব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে নায়েববাবুকে ডেকে আবার তাঁর নাম বার্ষিকীর খাতায় তুলে নিতে নির্দেশ দিলেন।

নায়েববাবু পণ্ডিতমশায়কে বাইরের সেরেস্তা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাতা খুলে তাঁর নাম লিখতে বসলেন। পণ্ডিতমশায়কে নাম জিজ্ঞাসা করাতে পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লিখুন, শ্রীযুক্ত বৃষ ভট্টাচার্য।'

এ রকম নাম শুনে নায়েবমশায় বিস্মিত হলেন, বললেন, 'বৃষ মানে তো ষাঁড়, গরু। এটা আবার কি করে মানুষের নাম হলো।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন, এটা আমার নাম নয়, কিন্তু এই নামটাই লিখুন।' নায়েবের মুখে তাঁর এই অনুরোধে প্রশ্নবোধক একটা ভাব ফুটে উঠল, তখন পণ্ডিতমশায় বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন ভবিষ্যতে আর যাতে নাম কাটা না যায় সে জন্যে এই নামটাই বলছি, আপনারা তো হিন্দু হয়ে গরু কাটতে পারবেন না। কী করে আমার বৃষ নাম কাটা যায় সেটা আমি দেখব।'

পুরনো দিনের লোককথায় পণ্ডিত কাহিনীর অন্ত নেই। তখনকার সমাজজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পণ্ডিতমশায়। তিনিই শিক্ষক, তিনিই পুরোহিত কখনো গুরুদেব, তিনিই বিধায়ক এমনকি কখনো কখনো তিনি জীবনদাতা কবিরাজ বা চিকিৎসক।

বিদ্যাসাগর মহোদয় এঁদের কথা লিখেছেন, মজা করেই লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় পর্যন্ত তরল কাহিনীতে পণ্ডিতমশায়কে বারবার এনেছেন। শরৎচন্দ্র তো 'পণ্ডিতমশায়' নামে আখ্যানই রচনা করেছেন।

মহাজন কথিত গল্পগুলির মধ্যে একটি চমকপ্রদ গল্প আমরা স্মরণ করছি।

দুই ভাই। বড় ভাই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। বেদ, উপনিষদ তাঁর নখাগ্রে। ছোট ভাই তেমন কিছু নন, তাঁর সম্বল পুরোহিত দর্পণ, যজমানি ব্যবসা তাঁর জমজমাট, গ্রাম-গ্রামান্ত থেকে লোকজন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসে, শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে তারা তাঁকে নিয়ে যায় বিবাহে, শ্রাদ্ধে, উপনয়নে, অন্নপ্রাশনে।

একবার তিনি দূরের এক গ্রামে একটা বিয়ে দিতে গেছেন, সেই সময় পাশের গ্রামের লোকেরা তাঁর কাছে একটা বিধান নিতে এল, ধোপাদের বাড়ির একটা শিশু মারা গেছে তাকে পোড়ানো হবে—না মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

ছোট ভাইকে না পাওয়ায় তারা বড় ভাইকে ধরল, 'ঠাকুরমশায় আপনি তো শাস্ত্রজ্ঞ দিগ্‌গজ পণ্ডিত, আপনিই এর বিধান দিন।'

বড় ভাই পড়লেন ঘোরতর ফ্যাসাদে। তিনি তাক থেকে বড় বড় পুঁথি নামিয়ে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ এমনকি রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের এবং শেষ পর্যন্ত কালিদাস বাণভট্টের অনেক পৃষ্ঠা ওলটালেন কিন্তু কোথাও কোনো সূত্র পেলেন না। তখন নিজের মনে সাত-পাঁচ অনেক কিছু ভেবেচিন্তে বললেন, 'পুঁতে ফেলাই উচিত হবে।'

লোকেরা বিধান নিয়ে চলে গেল। তারা যখন ফিরে যাচ্ছে ছোট ভাই তখন বিয়ে দিয়ে ফিরছেন, পথে দেখা। এদের মুখে সব কথা শুনে ছোট ভাই বুঝলেন বড় ভাই ভুল নির্দেশ দিয়েছেন,কারণ এক্ষেত্রে পুড়িয়ে ফেলাই আচার-সম্মত। তিনি দ্রুত দাদার ভুল সংশোধন করে বললেন, 'দাদা ঠিকই বলেছেন তবে না পুঁতে পুড়িয়ে ফেলাই ভালো। পুঁতলেও চলে কিন্তু তার চেয়ে পোড়ানো ঠিক হবে। বাচ্চাটা পুঁতে ফেলার বয়েস পার হয়ে গেছে।'

ভাই বাড়ি এসে দাদাকে বললেন, 'দাদা, তুমি ভুল বিধান দিয়েছিলে, ওরা যদি না পুড়িয়ে পুঁতে ফেলত খুব অনাচার হতো।' দাদা বললেন, 'কোনো অনাচার হতো না আমি ভেবে-চিন্তেই পুঁততে বলেছিলাম।'

ছোটভাই বললেন, 'এত ভাবনাচিন্তা করে ভুল করলে?'

দাদা বললেন, 'যদি পোড়াতে বলতাম আর ওরা পুড়িয়ে ফেলত, তাহলে আসল ভুল হতো যখন তুমি এসে বলতে যে না পুঁততে হবে। আমি পুঁতে রাখতে বললাম এই কারণে যে তুমি যদি এসে বলো পোড়াতে হবে তবে মাটি খুঁড়ে বাচ্চাটাকে তুলে পুড়িয়ে ফেললেই হবে কিন্তু একবার পোড়ানো হয়ে গেলে আর পোঁতা যেত না।'

এই অগ্রজ পণ্ডিতমশায়কে নিশ্চয় এরপরে আর কেউ নির্বোধ বলবে না।

অমল শৈশব

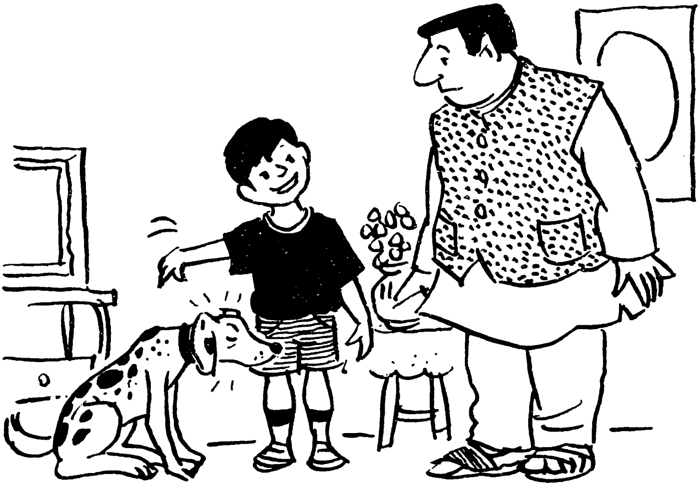

শৈশব শব্দটির আগে অমল বিশেষণটি যিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তিনি হয়তো কবি স্বভাবের লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাস্তব জ্ঞান ছিল না।

প্রথমে একটা গল্প বলে নেই, তারপরে ব্যাপারটা বোঝাব।

চারটি শিশু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল যদি তারা ভোরবেলা উঠে বালিসের নিচে এক লক্ষ টাকার একটা বাণ্ডিল পেয়ে যায় তা হলে কে কী করবে।

একটি শিশু বলল, 'আমি ঐ টাকা দিয়ে সারা জীবন শুধু আইসক্রিম আর চকোলেট কিনে খাব।'

দ্বিতীয় শিশু একটু নরম গোছের, সে বলল, 'টাকাটা আমি মা-বাবাকে দিয়ে দেবো।'

তৃতীয় শিশুটি অন্য ধরনের, সে জানালো, 'টাকাটা আমি তুলে রাখব, বড় হয়ে খরচ করব নিজের ইচ্ছে মতো।'

এবার চতুর্থ শিশুটির কথা শোনা যাক। সেই আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং মূল সমস্যা। সে অনেক ভেবে চিন্তে বলল, 'আমি টাকা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুমাব।'

এই অদ্ভুত কথায় প্রত্যেকেই খুব অবাক হলো এবং জিজ্ঞাসা করল, 'আবার ঘুমাবে কেন?' চতুর্থ শিশুটি খুব বিজ্ঞের মত বলল, 'আবার ঘুমের থেকে উঠে বালিসের নিচে খুঁজব আরো এক লক্ষ টাকা রয়েছে কি না।'

এই চতুর্থটি অনেক সাবালকের চেয়েও সেয়ানা। তার শৈশবের আগে অমল শব্দটি ব্যবহার করার আগে একটু ভাবতে হবে।

অন্য একটি শিশুর কথা বলি, তার কাছে আমি জব্দ হয়েছিলাম। কথায় কথায় তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুমি কি সাঁতার কাটতে পারো ?' সে অম্লান বদনে জবাব দিয়েছিল, 'কখনো কখনো পারি।' এ রকম চমকপ্রদ কথা শুনে আমি বাধ্য হয়ে জানতে চাই, 'হয় সাঁতার জানো, না হয় সাঁতার জানো না। কখনো কখনো সাঁতার কাটতে পারো এ কথা বুঝতে পারছি না।' শিশুটি বলল, 'ব্যাপারটা খুবই সোজা। যখন জলে নামি তখনই সাঁতার কাটতে পারি। অন্য সময় তো পারি না। তাই কখনো কখনো পারি বলেছি।'

তবে তুলনামূলকভাবে এই নাবালকদ্বয় সেই মার্কিন শিশুটির কাছে কিছুই নয়। মার্কিন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিনে ব্যাঙ্ক-অফিস এ সব ছুটি থাকে। এই মার্কিন শিশুটি তার পিতৃদেবকে প্রশ্ন করেছিল, 'তোমরা যে কথায় কথায় বলো জর্জ ওয়াশিংটন খুব সৎ ছিলেন, তা হলে তাঁর জন্মদিনে সব ব্যাঙ্ক বন্ধ করে রাখা হয় কেন ?'

আরেক সাহেব শিশুর কথা বলি। সে জন্মেছে এক গোঁড়া খৃস্টান পরিবারে। গোঁড়া খৃস্টানেরা মনে করেন রবিবার হলো গির্জায় যাওয়ার দিন, প্রার্থনার দিন। ও দিন কাজ করলে পাপ হয়। আর পাপ করলে স্বর্গে যাওয়া যাবে না।

একদিন এই শিশুটি তার এক সমবয়সী বন্ধুকে এই কথা বলছিল। সেই বন্ধুটির বাবা পুলিশে কাজ করে, সে যখন শুনল রবিবার কাজ করলে পাপ হয়, সে খুব ভয় পেয়ে বলল, 'তা হলে ভাই আমার বাবার কি হবে ? আমার বাবা যে পুলিশে কাজ করে, রবিবার ডিউটি করতে হয়। আমার বাবা কি স্বর্গে যাবে না ?'

তখন প্রথম শিশুটি অতিশয় বিজ্ঞের মতো বলল, 'তোর বাবা স্বর্গে গিয়ে কি করবে ? স্বর্গে তো আর মারামারি, কাটাকাটি, চুরি ডাকাতি নেই। স্বর্গে পুলিশের কোনো কাজ নেই। তোর বাবাকে যেতে হবে না।'

এই সব মহামতি শিশুদের আমরা যত কিছু চিন্তা ভাবনা করতে পারি, তাতে এদের কিছু এসে যায় না। আর তা ছাড়া ভালোভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে এদের মা বাবারা না হলেও এদের ঠাকুমা-দিদিমারা এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে যথেষ্টই গর্বিত।

আজকাল কিছুদিন হলো অল্প বয়েসী ছেলে-মেয়েদের বিয়ে একটু বেড়েছে। কলেজ ছেড়ে, চাকরিতে ঢুকেই অনেক ক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ফলে কম বয়েসী ঠাকুমা-দিদিমার সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে।

যৌবন এখনো যায়-যায়-করেও-যায়নি এমন এক নবীনা ঠাকুমা সেদিন আমাকে নাতিদের নানা কীর্তি কাহিনী বলছিলেন। অনেকক্ষণ শোনার পর জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম নাতিদের বয়েস কত হলো। তিনি মৃদু হাস্যে জানালেন, 'যে নাতিটি নকশাল তার বয়েস হলো সাত, সেই বড়। আর ছোটটি পুলিশ সার্জেন্ট, তার বয়েস হলো সাড়ে পাঁচ।'

কোমল মতি শিশুদের বুদ্ধি বা জীবিকা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করব না, ব্যাপারটা নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এবার এদের বিদ্যা নিয়ে একটু অলোচনা করি।

সেই পণ্ডিত শিশুটির কথা অনেকদিন আগেই লিখেছিলাম যাকে মাস্টারমশায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'চাঁদ কাছে না লন্ডন কাছে ?' সে নিশ্চিত উত্তর দিয়েছিল, অতি সংক্ষিপ্ত সেই উত্তর, মাত্র এক শব্দে 'চাঁদ'।

এরপর তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন সে ভাবছে 'চাঁদ লন্ডন শহরের চেয়ে কাছে ?' তখন সে বলেছিল, 'কারণ আকাশের চাঁদ চোখে দেখা যায়, কিন্তু লন্ডন শহর এত দূরে যে চোখেই পড়ে না ।'

এই শিশুটিরই এক উত্তরসূরীকে আমি প্রশ্ন করলাম এই সেদিন, 'বলো দেখি বিড়াল বংশের চারটি প্রাণীর নাম ।'

আমি আশা করছিলাম সে ব্যাপারটা বুঝে বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ এই সব জীবজন্তুর নাম করবে । কিন্তু আমি তাকে যা ভেবেছিলাম সে তার থেকেও অনেক বেশি বুদ্ধিমান । সে যা বলল তা শুনে আমার দুই চোখ ভুরু ডিঙিয়ে কপালে উঠল । সে বলল, 'বিড়াল বংশের চারটি প্রাণী হলো হুলো বিড়াল, মেনি বিড়াল, এবং তারপর একটু ইতস্তত করে, একটু চিন্তা করে যোগ করল, 'আর দুটো বিড়াল ছানা ।'

অন্য একটি বাচ্চা কিছুদিন আগে দাবি করছিল যে তার বিড়াল নিজের নাম বলতে পারে । কে যেন তার কাছে জানতে চেয়েছিল, 'তোমার বিড়ালের নাম কি ?' শুনে সে বলল, 'আমার বিড়ালের নাম মিয়াও । তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলেই সে 'মিয়াও, মিয়াও বলে ।'

এর চেয়েও খরবুদ্ধি অন্য এক শিশুকে আমি দেখেছি । সে বলেছিল যে তার কুকুর ছানা রীতিমত অঙ্ক কষতে পারে । যখন বললাম, 'প্রমাণ করে দেখাও ।' সে তার কুকুরকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই টাইগার বল্‌তো দশ থেকে দশ বিয়োগ করলে কি হবে ?' অবোধ টাইগার এই প্রশ্ন শুনে চুপ করে তাকিয়ে রইল । আমি তখন শিশুটিকে চেপে ধরলাম, 'কই কি হলো ?' শিশুটি বলল, 'ঠিকই তো হয়েছে । উত্তর শূন্য বলে চুপ করে আছে ।'

এই ছেলেটিই আরেকবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বলুন তো, একটা ছাতার নিচে পাঁচটা মেয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে । কিন্তু কেউ বৃষ্টিতে ভিজলো না, কি করে সম্ভব হল ?'

অনেক ভেবে আমি বললাম, 'নিশ্চয় ছাতাটা খুব বড় ।' সে বলল, 'না তা নয় । বৃষ্টি হচ্ছিল না তখন, তাই কেউ ভেজেনি ।'

অপোগণ্ডদের নিয়ে এতগুলি বস্তাপচা গল্পের শেষে এখন একটি চির শিশুর গল্প বলি ।

এই চির শিশুটি সকাল বেলা থেকে তার মাকে বলছে, 'মা আজ ইস্কুলে যাব না ।' তার মা জোর করছে, 'না যেতেই হবে, না গেলে চলবে না ।'

চির শিশুটি খেপে গিয়ে বলল, 'না আমি যাব না । কিছুতেই যাব না । ইস্কুলের ছেলে-মেয়েরা কেউ আমাকে ভালোবাসে না । মাস্টার মশায়-দিদিমণিরা এমনকি দারোয়ান-দপ্তরি কেউ আমাকে পছন্দ করে না । আমি কিছুতে যাব না ।' তখন মা ধমকিয়ে উঠল, 'দ্যাখো খোকা ছেলেমানুষি করো না । তোমাকে যেতেই হবে । তার কারণ হলো তুমি ছোট শিশু নও । তোমার বয়েস পঁয়তাল্লিশ হয়েছে । আর তুমিই ইস্কুলের হেড মাস্টার ।'

দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনা। রম্য নিবন্ধের এই ভয়াবহ নামকরণ দেখে সম্পাদক মহোদয়ের চোখ হয়তো কপালে উঠবে।

প্রথম রবিবাসরেই দুর্ঘটনা?

কিন্তু কি আর করা যাবে, এতো কম সময়ে এত তাড়াতাড়ির মধ্যে দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি ঘটতে পারে।

দুর্ঘটনার আখ্যানের গোড়ায় একটা মনোহর কথোপকথন দিয়ে শুরু করি। নব্য প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে কথা হচ্ছে,

নব্য প্রেমিক : বাবা কী করে টের পেলেন যে কাল সন্ধেবেলা আমরা তাঁর গাড়িটা লুকিয়ে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

নব্য প্রেমিকা : কাল লেকে ঢোকার সময়ে বাঁ দিকের মোড় ঘুরতে গিয়ে একটা লোককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলে মনে আছে?

নব্য প্রেমিক : হ্যাঁ, সেই যে মোটা মতন, ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোকটা রাস্তার ওপরে ছিটকে পড়ে গিয়ে আমাদের গাড়ির দিকে আঙুল তুলে খুব চেঁচাতে লাগল। সেই লোকটা কি তোমার বাবাকে বলে দিয়েছে, ও কি গাড়িটা চিনতে পেরেছিল?

নব্য প্রেমিকা : চেনা না চেনার কি আছে। ওটা তো ওরই গাড়ি। ওই লোকটাই তো

বাবা।

এর পরে প্রেমিকার পিতৃদেব ভাবী জামাতাকে নিজের গাড়িটি উপঢৌকন দিয়েছিলেন কিনা তা আমরা জানি না কিন্তু গাড়ি চাপা পড়ার আরো একটা গল্প আছে। সেটাও কথোপকথন, তবে আদালতীয়।

আদালতে বসে গাড়ি চাপা দেওয়ার মামলার বিচার হচ্ছে। এক প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার ষাট বছরের এক ভদ্রলোককে রাস্তায় চাপা দিয়েছে।

আসামী পক্ষের উকিল আদালতকে বললেন, হুজুর, সম্পূর্ণ দোষ ওই পথচারীর। সে বেআক্কেলের মত হাঁটছিল। আমার মক্কেল পনের বছরের অভিজ্ঞ ড্রাইভার। তিনি পনের বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছেন। তিনি চাপা দেবেন কেন ?

এই বক্তব্য শুনে বাদী পক্ষের উকিল উঠে দাঁড়ালেন, ধর্মাবতার আমার মক্কেলের ষাট বছর বয়েস। সে আজ উনষাট বছর ধরে নিজের পায়ে হাঁটছে। হাঁটায় তার এত দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা। সে হঠাৎ বে-আক্কেলের মত পথ হাঁটতে যাবে কেন ? সব দোষ ঐ ড্রাইভারের। আমার মক্কেলের হাঁটার অভিজ্ঞতার তুলনায় ওর ড্রাইভারির অভিজ্ঞতা সিকি ভাগ। আপনিই বিচার করুন।

হাকিম সাহেব বিচার করতে থাকুন। ততক্ষণে আমরা একশো বছর পিছিয়ে যাই।

উনিশ শতকের শেষার্ধের উত্তর কলকাতার একটি রাজপথ। রাস্তা দিয়ে এক ডাক্তার হেঁটে যাচ্ছেন। একটা টগবগে টাট্টু ঘোড়া বাহিত ফিটন গাড়ি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। ঘোড়াটি খুবই তেজি ও চঞ্চল, ক্রমাগত দাপাচ্ছে, নাক দিয়ে গরম শ্বাস ফোস্ ফোস্ করে বেরোচ্ছে।সে এক মুহূর্তও শান্ত হয়ে দাঁড়াতে চাইছে না।

ফিটন গাড়ির ভেতর থেকে জমিদারবাবু মুখ বাড়িয়ে ডাক্তারববুকে বললেন, ডাক্তারবাবু কোথায় যাচ্ছেন ?

ডাক্তারবাবু বললেন, এই সামনে শোভাবাজারে।

জমিদারবাবু বললেন, হেঁটে যাবেন কেন ? আমার গাড়িতে উঠুন, আমিও ঐ দিকেই যাচ্ছি।

অগত্যা ডাক্তারবাবু ফিটনে উঠলেন। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চিৎপুরের মোড়ের কাছাকাছি একটা জায়গায় হঠাৎ দু পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে টাট্টু ঘোড়াটা কোচম্যান এবং জমিদার ও ডাক্তারবাবু এই দুই আরোহী সমেত গাড়িটা উলটিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল।

ভাগ্যিস কারো বিশেষ কোনো চোট লাগেনি। গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ডাক্তারবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনার এই পাগলা ঘোড়ার গাড়িতে তুলে আপনি আমাকে মেরে ফেলতে বসেছিলেন। কি ভাবে পাজি ঘোড়াটা গাড়ি উলটিয়ে দিল। ভাগ্যিস হাত পা ভাঙেনি।

জমিদারবাবুর হাঁটুটা একটু ছড়ে গিয়েছিল, সে জায়গাটা দেখিয়ে তিনি বললেন, ডাক্তারবাবু আপনার ব্যাগ থেকে একটু আয়োডিন বার করে, যদি আয়োডিনের বোতলটা ভেঙে না গিয়ে থাকে, এখানে একটু লাগিয়ে দিন তো।

ডাক্তারবাবু গজগজ করতে করতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ খুলে আয়োডিনের বোতলটা বার করে তুলো দিয়ে কাটা জায়গাটা লাগাতে লাগাতে বললেন, ওই ঘোড়াটিকে আর কখনো

গাড়িতে জুততে যাবেন না।

আয়োডিনের জ্বালায় উঃ আঃ করতে করতে জমিদারবাবু বললেন, ঘোড়াটাকে পুষছি, দানাপানি খাওয়াচ্ছি, সহিস রেখেছি আর গাড়িতে জুতব না তা তো হয় না। তবে ওকে যখন গাড়িতে লাগাই আমি সব সময়ই চেষ্টা করি সঙ্গে একজন ডাক্তার রাখতে !

এরপর এক অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনার কথা বলি। আমি গল্পটা ফরাসী জোক বুকে (ইংরেজী অনুবাদে) এক ভাবে পড়েছি। বাংলায় শিবরাম চক্রবর্তী চমৎকার অন্য ভাবে লিখেছিলেন। ফরাসী গল্পটা বলি।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং এ একটা লোক কাটা পড়েছে। লেভেল ক্রসিং থেকে সামান্য এগিয়ে মোড়ের মুখে একটি মুক্তবায়ু পানশালায় বসে রক্ত মদিরা পান করতে করতে মঁশিয়ে গবেট এই দুর্ঘটনার সংবাদ শুনলেন এবং শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একটু আগেই তিনি নিজে ঐ লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে এসেছেন।

যে ব্যক্তি দুর্ঘটনার সংবাদ নিয়ে এসেছে তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যে লোকটা কাটা পড়েছে সে লম্বা কেমন ? লোকটি বলল, বেশ লম্বা। আপনার মত হবে।

একথা শুনে মঁশিয়ে গবেটের মুখ খুবই ফ্যাকাশে হয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটির স্বাস্থ্য ? লোকটি ফের বলল আপনারই মতো। বেশ মোটাসোটা।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মঁশিয়ে গবেট কপালের ঘাম মুছলেন, তার মুখ আরো সাদা হয়েছে, তিনি কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, লোকটার পরনে কি ছিল ? এবার উত্তর পাওয়া গেল, নীল সুট। নিজের নীল সুটের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে মঁশিয়ে গবেট থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। যে লোকটি বলছিল তার বর্ণনা তখনো শেষ হয়নি বলল, পায়ে কালো ফিতে ওয়ালা জুতো।

এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মঁশিয়ে গবেট, যাক, আমি নই। রক্ষা পেয়ে গেছি। আমার তো লাল জুতো।

সব সময় দুর্ঘটনা যে ঘটবেই এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় মনে হয় এইবুঝি দুর্ঘটনা বা দুঃসময় একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে গেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পার পেয়ে যাই।

সে যা হোক অঘটিত দুর্ঘটনা সম্পর্কিত আমাদের এই গল্পটি একটু অন্য জাতের।

এক ভদ্রলোক শিশুদের খুব ভালোবাসেন। তিনি একদিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখলেন একটি শিশু হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

ছেলেটির কান্না দেখে ভদ্রলোকটির মনে খুব মায়া হল। তিনি পাশে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে কান্না থামাতে বললেন। ছেলেটি কান্না একটু থামানোর পর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন কাঁদছে।

শিশুটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি পঁচিশ পয়সা হারিয়েছি। সেই দুঃখে কাঁদছি।

এই কথা শুনে ভদ্রলোক নিজের পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে সেটা খুলে একটা সিকি নিয়ে সেই সিকিটা ছেলেটিকে দিলেন। দিয়ে বললেন, এই তোমার পঁচিশ পয়সা পেলে। এবার বলো তুমি পঁচিশ পয়সা কি করে হারালে ?

এই প্রশ্ন শুনে ছেলেটি বলল, আমাকে আরো পঁচিশ পয়সা দিতে হবে। আপনার জন্য

আমার পঁচিশ পয়সা লাভ না হয়ে পঁচিশ পয়সা ক্ষতি হয়েছে।

শিশুটির কথা শুনে ভদ্রলোক অবাক। যা হোক তিনি মানিব্যাগ থেকে আরেকটা সিকি বার করে তাকে দিয়ে জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি বলো তো?

দুটি সিকি পরপর পেয়ে উল্লসিত হয়ে শিশুটি বলল, ঐ যে ফুটপাতের বাঁ ধারে যেদিক দিয়ে আপনি আসছিলেন ওখানে একটা কলার খোসা দেখতে পাচ্ছেন তো, ঐ খোসাটা আমি ফেলে রেখেছি। আপনি যখন এদিকে আসছিলেন তখন আমি আর দাদা বাজি ধরেছিলাম। আমি বলেছিলাম, আপনি কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যাবেন। দাদা বলেছিল না তা হবে না। তখন দুজনে বাজি ধরলাম, আপনি পিছলিয়ে পড়ে গেলে দাদা আমাকে পঁচিশ পয়সা দেবে আর না পড়লে আমাকে পঁচিশ পয়সা দিতে হবে।

এরপর একটু থেমে মুচকিয়ে হেসে ছেলেটি বলল, আপনি তো আর পা পিছলিয়ে পড়লেন না। আমি বাজি হেরে গেলাম। পঁচিশ পয়সা তো পেলামই না, বরং দাদা আমার পঁচিশ পয়সা কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

শিশু বৎসল, দয়ালু ভদ্রলোকটি অতঃপর পিছন ফিরে ফুটপাতের বাঁ ধারে অপেক্ষা রত কলার খোসাটিকে সভয়ে নিরীক্ষণ করে নিজের সৌভাগ্যকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে সন্তর্পণে হাঁটা শুরু করলেন।

অবশেষে দুর্ঘটনা বীমা।

দুর্ঘটনা বিষয়ে রচনা লিখব অথচ দুর্ঘটনা বীমা বিষয়ে কিছু লিখব না তা হতে পারে না।

নগেনবাবু তাঁর মটর গাড়ির দুর্ঘটনা বীমা করিয়েছিলেন। সেই গাড়ি একবার দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে গেল। নগেনবাবু আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে গাড়ির বীমা যখন করা আছে গাড়ির দামটা উদ্ধার করা যেতে পারে।

যে কোম্পানিতে গাড়িটা বীমা করা ছিল সেখানে গিয়ে নগেনবাবু দুর্ঘটনার পুলিশ রিপোর্ট ইত্যাদি দিয়ে গাড়ির দাম দাবি করলেন।

বীমা কোম্পানীর লোকেরা বলল যে আপনার কাগজপত্র সবই ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে তো নগদ টাকা দেওয়া যাবে না, আমাদের সে নিয়ম নেই। আপনি যে গাড়িটা বীমা করেছিলেন, যেটা দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক সেই গাড়ির মতো একটা গাড়ি আপনাকে দেওয়া হবে।

এই কথা শুনে নগেনবাবু সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে বিচলিত হয়ে উঠলেন।

কারণটি গুরুতর।

নগেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর যুগ্ম দুর্ঘটনা বীমা করা আছে। এখন নগেনবাবু যদি, ঈশ্বর না করেন, কোনো কারণে কোন দুর্ঘটনায় স্ত্রীর আগে মৃত্যু মুখে পতিত হন তা হলে কি হবে?

বীমা কোম্পানি কি টাকা না দিয়ে নগেনবাবুর স্ত্রীকে নগেনবাবুর মতই দেখতে শুনতে আরেকটা বাবু যোগাড় করে দেবে?

নগেনবাবু গুরুতর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

আমরাও চিন্তায় রইলাম।

সংবাদ সাহিত্য

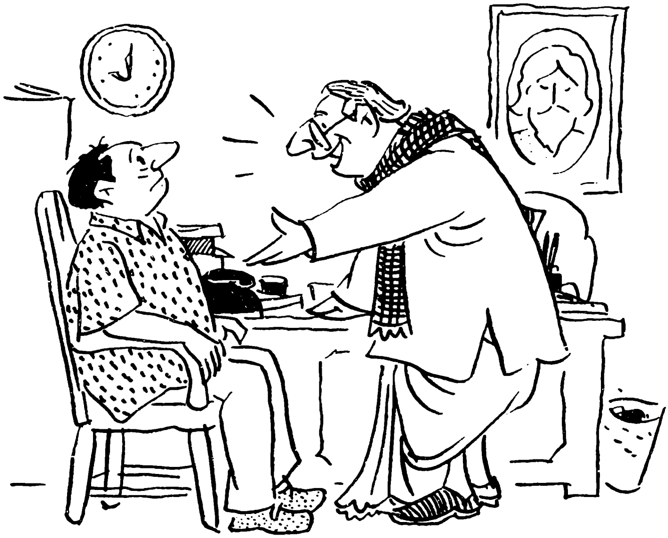

অনেকদিন আগে জি কে চেস্টারটন লিখেছিলেন, 'সাংবাদিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি শ্রীযুক্ত অমুক চন্দ্র তমুকের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন যখন লোকেরা জানেই না যে শ্রীযুক্ত অমুক চন্দ্র তমুক তখনো বেঁচে আছেন।'

নিবন্ধের শুরুতেই এই ক্ষুদ্র অথচ বক্র উদ্ধৃতি দেখে যে সব বুদ্ধিমতী পাঠিকা ভাবছেন যে এবার আমি সাংবাদিক বা সাহিত্যিকদের এক হাত নেবো তাঁরা কিন্তু ঠিক ভাবছেন না। আমার আদৌ এ রকম কোনো ইচ্ছা নেই। তাছাড়া এত সাহসই বা কোথায় আমার ? তার চেয়ে সাংবাদিকদের দু'একটা পুরনো গল্প বলি।

এ গল্প সেই গত দশকের মাঝামাঝি সময়ের। জরুরি অবস্থার ঘোরতর দুর্দিনের গল্প।

এক সাংবাদিক বিনা বিচারে জেলে বন্দী ছিলেন। সে সময়ে এটা অবশ্য খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। সে যা হোক ঐ সাংবাদিক ভদ্রলোক ভালোই জানতেন এবং সব সময়েই বুঝতে পারতেন যে তাঁর কাছে চিঠিপত্র যা কিছু আসছে সবই গোয়েন্দা পুলিশ এবং জেল কর্তৃপক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ, বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা করে দেখছেন। তা ছাড়া তাঁর যে সব চিঠি বাইরে যাবে সেগুলোও ঠিক একই ভাবে খুঁটিয়ে দেখা হবে। সরকার বিরোধী কিছু তার মধ্যে আছে কিনা।

কে আর পছন্দ করে যে তার নিজের চিঠি অন্যে খুলে পড়বে। সুতরাং সেই সাংবাদিক

একদিন তাঁর স্ত্রীকে চিঠিতে লিখলেন, 'আমার কাছে যে সমস্ত চিঠি আসে এবং আমি যে সমস্ত চিঠি পাঠাই সবই এখানে খুলে তন্নতন্ন করে পাঠ করা হয় জিনিসটা খুবই ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর। তুমি আমাকে আর বিশেষ দরকার না হলে চিঠি লিখতে যেও না। আমিও লিখব না।'

এই লিখে সাংবাদিক ভদ্রলোক চিঠিটা খামে ভরে আঠা লাগিয়ে স্ত্রীর ঠিকানা লিখে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মমত পেশ করলেন পাঠিয়ে দেবার জন্য।

ঠিক তিন দিনের মাথায় কারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি একটা চিঠি পেলেন, যার বয়ান অনেকটা এই রকম।

মহোদয়,

আপনার স্ত্রীকে লেখা গত পনেরোই তারিখের পত্রের বক্তব্য সঠিক নয়।

আপনাকে আমরা জানাতে চাই যে আমরা রাজবন্দীদের কোনো চিঠিই খুলে পড়ি না।

ইতি,
ভবদীয়
কারাধ্যক্ষ

সাংবাদিকদের জেলে পাঠাতে পারলে অনেক ক্ষমতাবান লোকই খুব স্বস্তি পাবেন। কিন্তু সব সময় সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেটা যে ঐ ক্ষমতাবানের দয়ামায়া বা চক্ষুলজ্জা কিংবা সামাজিক ন্যায়নীতির জন্যে তা কিন্তু নয়। দেশাচার, কালচার, জনমত, নিজের দুর্বলতা এগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায় এ সব বাসনা চরিতার্থ করার পথে। সমালোচককে কেউই পছন্দ করেন না। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা। কিন্তু তাঁদের কিছু করার থাকে না বলেই চুপ করে থাকেন।

সে যা হোক বহু সাংবাদিকেরই মনের বাসনা যে তাঁর লেখায় তিনি আগুন জ্বালিয়ে দেবেন যে রকম রুশো বা ভলটেয়ারের কলমের মুখে ফরাসি বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল। যে রকম হয়েছিল মুকুন্দ দাসের গানে কিংবা তারও আগে বিপিন পাল আর সুরেন ব্যানার্জির বক্তৃতায়।

কিন্তু লেখায় আগুন জ্বালানো অত সোজা ব্যাপার নয়। আমার মনের আগুন কাগজকলমের মধ্য দিয়ে আমি আরো হাজার জনের মনে ছড়িয়ে দেবো এ রকম আগ্নেয় কলম সকলের হাতে থাকে না। থাকলেও অনেক সময় লেখকের নিজের হাতেই সে আগুনের তাপে ফোসকা পড়ে যায়। অন্যে তার আঁচ বিশেষ পায় না।

এই রকম এক সাংবাদিক একদা তাঁর সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্যার, আমার লেখাগুলোয় কি আরো আগুন দিতে হবে ?' মিতভাষী সম্পাদক নিভে যাওয়া পোড়া চুরুটে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে যখন বুঝলেন আর ধোঁয়া বেরোবে না তখন চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে তরুণ সাংবাদিককে বললেন, 'তুমি বরং বিপরীতটা করো।'

তরুণ সাংবাদিকের কথাটার মানে বুঝতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। সম্পাদক যা বলেছেন তার সোজা অর্থ হলো 'লেখায় আগুন না দিয়ে আগুনে লেখা দাও।' অর্থাৎ 'তোমার লেখাগুলো পুড়িয়ে ফেলার যোগ্য।'

অন্য এক সম্পাদকের কথা জানি তাঁর কাছে এক লেখক কাগজের রবিবারের পাতায় ছাপার জন্যে একটি গল্প নিয়ে দেখা করে। গল্পটিতে সামান্য চোখ বুলিয়ে নিয়েই অভিজ্ঞ

সম্পাদক চমকিয়ে উঠলেন। তারপর ধীরে ধীরে গল্পের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে লেখককে প্রশ্ন করলেন, 'এ গল্প আপনিই লিখেছেন ?'

নবীন লেখক উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ প্রতিটি পংক্তি আমার লেখা দাড়ি, কমা-সেমিকোলন সমেত।' সম্পাদক উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের দিকে ঘুরে এগিয়ে এসে লেখককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বললেন, 'ও আপনিই তা হলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভালো হলো। আমি ভেবেছিলাম আপনি অনেকদিন আগে মারা গেছেন।'

সব সম্পাদক যে এরকম ভদ্র ব্যবহার করেন তা নয়, নিচের কথোপকথনটি লক্ষ্য করলেই সেটা বোঝা যাবে।

সময় প্রায় মধ্যযাম। নৈশভোজ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে বিদায় নিচ্ছেন। অতিথিদের মধ্যে এক সম্পাদকও ছিলেন, তিনি উঠব উঠব করছেন এমন সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এক সুবেশা রূপসী। তারপরের কথাবার্তা এই রকম :—

রূপসী : আপনিই অমুক কাগজের সম্পাদক না ? আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আপনিই তো তিনি ?

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রূপসী : আচ্ছা কাগজের কাজ খুব ইন্টারেস্টিং না ?

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রূপসী : অনেক নামকরা ইন্টারেস্টিং লোকের সঙ্গে দেখা হয়, পরিচয় হয়।

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রূপসী : কত রোমাঞ্চকর খবর আসে। কত উত্তেজনা।

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রূপসী : কত নতুন নতুন লেখক-লেখিকা আসে। তাদের যখন আবিষ্কার করেন কত আনন্দ হয়, কত গৌরব হয়।

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রূপসী : তবে মাঝে মাঝে বাজে লেখা বা ভুল সংবাদ ছাপা হলে বেশ ঝামেলাও হয়।

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রূপসী : আবার অনেক সময় অনেক বাজে লোক এসে বিরক্ত করে। লেখা ছাপাতে চায়, সংবাদ ছাপাতে চায়।

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রূপসী : কখনও কখনও বাজে লোক গায়ে পড়ে উলটো পালটা কথা বলে। সময় নষ্ট করে দেয়।

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রূপসী : (একটু চিন্তা করে) আমি বোধহয় আপনার সময় নষ্ট করছি।

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রূপসী : আমি তাহলে এবার যাই।

সম্পাদক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

* * *

পুনশ্চ : এক ভদ্র মহিলা খবরের কাগজের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশের জন্য পর পর কয়েকটা গল্প পাঠান। দুঃখের বিষয়, প্রত্যেকটি গল্পই অমনোনীত হয় এবং স্ট্যাম্প দেয়া ছিল বলে সেগুলি ডাকে ভদ্র মহিলার কাছে ফেরত যায়।

যখন সপ্তম গল্পটি ফেরত গেল তখন ভদ্রমহিলা একটা চালাকি করলেন। তিনি অষ্টম গল্পটি পাঠানোর সময় গল্পের তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে দশম পৃষ্ঠা পর্যন্ত যত্ন করে আঠা দিয়ে জুড়ে দিলেন যাতে লেখাটা পড়তে গেলে ঐ জোড়াটা খুলে পড়তে হয়।

যথারীতি অষ্টম গল্পটিও ভদ্র মহিলার কাছে ফেরত গেল এবং ভদ্রমহিলা দেখলেন যে তাঁর গল্পের আঠা দিয়ে জুড়ে রাখা পৃষ্ঠাগুলো সত্যিই খোলা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা তীব্র ভাষায় চিঠি দিলেন ঐ পত্রিকার সম্পাদককে, 'আপনারা লেখা না পড়ে ফেরত দেন। আমার গল্পের তিন থেকে দশ পৃষ্ঠা জোড়া ছিল সেটা আপনারা খুলেও দেখেননি। ছিঃ ছিঃ, আপনার কোন অধিকারে কাগজ চালান। আপনাদের লজ্জা করে না।'

এই চিঠি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক মহিলাকে একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিল।

মাননীয়াসু,

একটা মাছ যে পচা সেটা জানার জন্যে পুরো মাছটা খাওয়ার দরকার পড়ে না, যে কোনো একটা টুকরো থেকে সামান্য একটু ভেঙে খেলেই যথেষ্ট।

ইতি—

রাতের কলকাতা

'রাতের কলকাতা' কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা আমিষ-আমিষ ভাব, আঁশটে গন্ধ। মনে পড়ছে, অনেক দিন আগের বটতলার একটা অশ্লীল বইয়ের এইরকম নাম ছিল।

কিন্তু আমার পক্ষে সেরকম কিছু লেখা সম্ভব হবে না। 'রাতের কলকাতা' নামের সুযোগে নিষিদ্ধপল্লী কিংবা ভ্রষ্ট মদ্যপের কেচ্ছা বর্ণনায় আমার তেমন রুচি নেই।

সুতরাং শুদ্ধ ও পবিত্রভাবেই রাতের কলকাতায় প্রবেশ করা যাক। প্রথমে যাব কালীঘাট মন্দিরে। কালীঘাট আমার প্রিয়তম, নিকটতম জায়গা। আমার প্রথম যৌবনের অমল ধবল পাল লাগানো দিনগুলি সেখানেই ভাসমান ছিল।

তখনকার কলকাতায় লোডশেডিং অবশ্যই অনুপস্থিত ছিল, তবে রাস্তাঘাট এত আলো ঝলমলে ছিল না। রাস্তায় অন্ধকার ছিল না, কিন্তু চোখধাঁধানো আলোও ছিল না, আমাদের কালীঘাটের রাস্তায় তখনও টিমটিমে গ্যাসের বাতি, (নাকি বিদ্যুতের আলো এসে গেছে) তবে সে যাই হোক নিয়ন-ফ্লুরেসেন্টের যুগ আসেনি।

কালীঘাট মন্দিরের ভেতর আরও টিমটিমে ব্যাপার, পুজো-পার্বণে, দু-চারদিন ছাড়া সারা বছর সন্ধ্যা না হতে হতেই কেমন আধো আলো, আবছায়া ভাব।

আমার স্বর্গত অগ্রজের মাথায় সদাসর্বদা নানারকম বুদ্ধি ও পরিকল্পনা খেলা করত। দাদার ভাল নাম ছিল শেখর রায়, ইংরেজিতে নাম সই করত এস রায়। দাদা সারা কালীঘাট

অঞ্চলকে এস রায় এবং এস রায় নট এই দুই ভাগে ভাগ করেছিল। অনেকদিন ধরে অসীম অধ্যাবসায়ের সঙ্গে চকখড়ি দিয়ে সারা পাড়া দাগিয়ে দাদা নিজের অংশ ঠিক করে নিয়েছিল। মাত্র কয়েকটা বাড়ি ও দোকান, একটা সিনেমা হল নিজের ভাগে রেখে বাকি সমস্ত কালীঘাট এলাকা দাদা এস রায় নট করে দিয়েছিল। তবে এরই মধ্যে কালীঘাট মন্দিরটা নিজের হেপাজতে রেখেছিল।

দাদা একবার ঠিক করল রাতের কালীঘাট মন্দিরের কিছু উন্নতি করা প্রয়োজন। চারদিকে কম আলো, ঝুপড়ি, চালাঘর, ঘোড়ার গাড়ি এই সব নিয়ে সন্ধ্যার পরে তখনকার কালীঘাটে একটা গ্রাম্য চেহারা ফুটে উঠত।

এই গ্রাম্যতা সম্পূর্ণ করার জন্যে দাদা ঠিক করল রাতের কালীঘাট মন্দিরে কিছু জোনাকির আমদানি করতে হবে।

প্রথমে দাদা বহু জায়গায়, বহু লোকের কাছে অনুসন্ধান করল জোনাকির চাষ করা সম্ভব কিনা। দাদা এ প্রশ্নের কোথাও কোনও সদুত্তর পেল না, কিন্তু নিজে নানা বিদঘুটে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হল। সকলেই জানতে চায়, কেন জোনাকির চাষ, জোনাকি খাওয়া যায় কিনা, জোনাকি কোনও ওষুধ বানাতে লাগে কিনা।

এসব জিজ্ঞাসা এড়িয়ে অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা দাদা বালিগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে বারুইপুর লোকালে চেপে বারুইপুরে গিয়ে নামল। সঙ্গে একটা বড় ব্রাউন পেপারের শক্ত ঠোঙা। বারুইপুর স্টেশনের উল্টো দিকে ঝোপঝাড়, বাঁশবন, ডোবা। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। এখনকার বারুইপুরের চেহারা অন্যরকম ছিল।

দাদা সেই ঝোপঝাড় ঘুরে, সাপের কামড়ের ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে রাশি রাশি জোনাকি ধরে ঠোঙায় ভরে রাত দশটায় শেষ বারুইপুর লোকালে কলকাতা ফিরে এল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যখন কালীঘাটে গিয়ে পৌঁছাল তখন তাঁর নিজের মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, বহু চেষ্টা করেও ভেতরে প্রবেশ করা গেল না।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ঠোঙা নিয়ে যখন মন্দিরের মধ্যে দাদা জোনাকি ছাড়তে গেল তখন একটা জোনাকিও বেঁচে নেই। ঠোঙার মধ্যে দম বন্ধ হয়ে এবং/কিংবা অনাহারে দেহত্যাগ করেছে।

এবার দাদা চেতলা হাটে গিয়ে একটা খুব জ্যালজেলে বাঁদীপোত গামছা কিনল। যার সুতোর ফাঁক দিয়ে হাওয়া চলাচল করবে কিন্তু জোনাকিগুলো বেরিয়ে যেতে পারবে না।

সেদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় দাদা বারুইপুর থেকে গামছা ভর্তি জোনাকি নিয়ে মন্দিরে এসে ছেড়ে দিল। কিছু কিছু মরে গিয়েছিল কিন্তু বাকিগুলো ছেড়ে দেওয়া মাত্র ঝলমল-ঝলমল করে উড়তে উড়তে মন্দিরের পিছন দিয়ে পালিয়ে গেল।

বলা বাহুল্য তাদের আর দেখা যায়নি, তারা আর ফিরে আসেনি। কিন্তু অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যে রাতের কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে আমার অগ্রজ জোনাকির বিচ্ছুরণ উপহার দিয়েছিল, এর তুলনায় অন্যান্য গল্প তুচ্ছ।

তবু নিবন্ধের খাতিরে অন্য দু-একটা গল্প বলতেই হয়। গত বছর বড়দিনের রাতে এদিক ওদিক ঘুরে যখন বাড়ি ফিরছি তখন পরের দিন এসে গেছে। অন্তত একটা তো বাজেই। দেখি বাড়ির সামনে গেটের কাছে একটা বিশাল চেহারার সাহেব শুয়ে রয়েছে। বোধহয় খুব নেশা করেছে। গেট খোলার জন্যে সাহেবকে না জাগিয়ে উপায় ছিল না।

একটু ধাক্কাধাক্কি করতেই সাহেব ঘুম থেকে উঠল। উঠে চোখ কচলিয়ে, একটা হাই তুলে ইয়াঙ্কি ইংরেজিতে বলল, 'আমি কোথায় ? এটা কোন জায়গা ?'

আমি বললাম, 'এটা থিয়েটার রোড, কাছেই চৌরঙ্গী। তুমি কোন হোটেলে উঠেছ।' সাহেব তার ময়লা জিনসের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, 'আজ কত তারিখ ?'

আমি বললাম, 'আজ বড়দিন। পঁচিশে ডিসেম্বর।' সাহেব কাগজটা আরও একটু ভাল করে দেখে বলল, 'দেন ইট ইস ক্যালকাটা।' আমি বললাম, 'ঠিক তাই।'

সাহেব সারা পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে কবে কোথায় থাকছে সমস্ত ঘুলিয়ে ফেলেছে। আমি যখন বললাম, 'ঠিক তাই', সাহেব আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'চৌরঙ্গী কোন দিকে ?' আমি সামনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে সাহেব শিস দিতে দিতে সেদিকে চলল। সেদিকে তখনও বড়দিনের হই-হুল্লোড়, বাজি-বেলুন আর ফুর্তির ফোয়ারা উপচিয়ে পড়ছে।

পুনশ্চ :

রাতের কলকাতার একটা অন্যরকম ঘটনা মনে পড়ছে। সেদিনও বেশ রাত হয়ে গেছে। পার্ক স্ট্রিট দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এপাড়াটা সন্ধ্যার পরে তেমন ভাল নয়। অনেক সময় ছিনতাই-টিনতাই হয়। তাই এদিকে হঠাৎ কখনও এলে পকেটে বেশি টাকাপয়সা বা হাতে হাতঘড়ি রাখি না, এতে ঝুটঝামেলার ভয় কমে। সেদিন রাতে হাঁটতে হাঁটতে সামনে এক ভদ্রলোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা ক'টা বাজে বলবেন ?' আসলে কতক্ষণ আড্ডা দিয়েছি খেয়াল ছিল না, এখন রাস্তায় বেরিয়ে দেখছি চারদিক চুপচাপ, নিঝুম। চিন্তা হল, খুব বেশি রাত করে ফেলেছি বুঝি। না হলে সময় নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা নেই।

যে ভদ্রলোককে সময়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি আমার প্রশ্ন শুনে একবার বাঁদিকে একবার ডানদিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'অলিম্পিয়া বন্ধ হয়ে গেছে স্কাই রুম এখনও খোলা আছে। তার মানে সাড়ে দশটা বেজে গেছে, এগারটা বাজেনি। ধরে নিন পৌনে এগারটা।'

আমি এই আশ্চর্য সময় সমীক্ষা দেখে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম যে সময় সব বার খোলা থাকে বা বন্ধ থাকে, কিংবা বিষ্যুদবার ড্রাই ডে-তে, সময় বোঝেন কি করে ?

ভদ্রলোক পাঞ্জাবির হাতাটা সরিয়ে একটা ঝকঝকে রিস্টওয়াচ দেখিয়ে বললেন, 'তখন বাধ্য হয়ে এটার ব্যবহার করি।'

বিদ্যাসাগর

হুঁ হুঁ দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং
দেয়ঞ্চ করকম্পনে।
শিরসি চালনে দেয়ং
ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে।

এই উনবিংশ শতকীয় আশ্চর্য সংস্কৃত শ্লোকটি আসলে নিমন্ত্রণ বাড়ির পরিবেশনকারীদের উদ্দেশ্যে একটি উপদেশ।

ছড়াটির সরল অর্থ হলো পরিবেশন করার সময় ভোজনকারী যদি হুঁ হুঁ করে তাহলেও তাকে দেবে, হাঁ হাঁ করলেও তার পাতে খাবার দেবে, হাত নাড়লেও দেবে, মাথা নাড়লেও দেবে শুধু তখনই দেবে না যখন সে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

প্রচলিত আছে যে এই শ্লোকটি স্বয়ং বিদ্যাসাগরের রচনা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজে রান্না করে লোকদের নিজে পরিবেশন করে খাওয়াতেন। ভালো করে খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বহস্তে পাঁঠার মেটের অম্বল রান্না করে খাইয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই রান্না খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী করে রাঁধলেন? এমন সুস্বাদু অম্বল জীবনে খাইনি।'

সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর নিরম্বু ইয়ার্কি দিয়ে, নিতান্ত হাসিঠাট্টায় সময় কেটে যাচ্ছে আমার। এরকম কঠিন সত্যিকথা ভাবলে এককে সময় মনের মধ্যে কেমন হু হু করে ওঠে, মনে হয় একটা জীবন শুধু মস্করা করেই চলে গেল।

এ সপ্তাহে কিঞ্চিৎ পাপস্খালনের চেষ্টা করছি। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে এই পুণ্যপ্রয়াস।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর পার হতে চলল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যাসাগর বা দয়ার সাগরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সব রকমের সংস্কারমুক্ত চিরকালের আধুনিক মানুষ। শুধু পাণ্ডিত্য বা প্রতিভা নয় তাঁর ছিল অসামান্য এক নাগরিক গুণ, রসবোধ। সুপণ্ডিত, সুশিক্ষিত ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন, এখনও ইতস্তত লভ্য কয়েকটি কাহিনী এবারের উপজীব্য।

বলা বাহুল্য, এই কাহিনীগুলির সত্যাসত্য বিচারের দায় বা যোগ্যতা আমার নেই। পাঠক-পাঠিকাকে সরল মনেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সঙ্গে মনে মনে খাপ খাইয়ে এ গল্পগুলো বিশ্বাস করতে হবে।

বিদ্যাসাগর বিষয়ে অনেক প্রচলিত কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্র মিত্র তাঁর সুলিখিত এবং সুবিখ্যাত 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে। সে গ্রন্থ অ্যাকাডেমি পুরস্কারও পেয়েছিল।

কিন্তু আমি গবেষক নই, ঐতিহাসিকও নই। নিতান্ত অভ্যাসবশত এবং চক্ষুলজ্জার অভাবে সপ্তাহান্তে এই সামান্য রচনা, কেউ আশা করি আমাকে এসব গল্পের সত্যিমিথ্যে প্রমাণ দিতে বলবেন না।

তবু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিষয়ে লেখার একটা সামান্য অজুহাত আমার আছে। এই মহাপুরুষের সঙ্গে আমার বিশেষ একটা পারিবারিক সম্পর্ক আছে। অবশ্য সেটা রক্তের সম্পর্ক নয়, তারিখের সম্পর্ক। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ ও সময় এবং আমার বিবাহের দিনক্ষণ একই আর তাঁর জন্মের তারিখেই একই সময়ে আমার সন্তানের জন্ম। এ প্রসঙ্গ অবশ্য খুবই হাস্যকর শুধু মিল রয়েছে বলে উল্লেখ করলাম। দয়া করে কেউ ঘাঁটাঘাটি করবেন না।

বিদ্যাসাগরের গল্পে আসি। বিদ্যাসাগর মশায়ের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিরামিষাশী ছিলেন, মাছ, মাংস খেতেন না। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র এবং তাঁর পৌত্র বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণকে খুব স্নেহ করতেন। এই স্নেহের মাত্রা এত বেশি ছিল যে তিনি নিজে কখনই তাদের কোনো কারণেই শাসন করতেন না। শুধু তাই নয় অন্য কেউ তাঁর ভয়ে ওদের কাউকে শাসন করতে সাহস পেত না।

ব্যাপারটা জানার পর বিদ্যাসাগর বাবাকে এসে বললেন, 'বাবা, আপনি না নিরামিষাশী ?' এই আশ্চর্য প্রশ্ন শুনে ঠাকুরদাস অবাক হয়ে গেলেন। তখন বিদ্যাসাগর বললেন, 'আপনি যদি সত্যিই নিরামিষাশী হবেন তবে ঈশান আর নারাণের মাথাদুটো চিবিয়ে খাচ্ছেন কেন ?'

সেটা শিক্ষিত শহুরে বাঙালির ব্রাহ্ম হওয়ার যুগ। ঘরে ঘরে উজ্জ্বল কৃতী যুবকেরা ব্রাহ্ম হচ্ছে, ঘর ভাঙছে, পুরনো সংসারের কাঠামো ভেঙে যাচ্ছে, ইতস্তত নতুন কাঠামো গড়ে

উঠছে।

ব্রাহ্মণ সন্তান রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম হলেন। ব্রাহ্ম হয়ে কাশীতে গিয়ে উপবীত ফেলে এলেন। বাবা বারবার নিষেধ করলেন, অনেক তর্ক, কলহ, বিবাদ অবশেষে তিনি পৈতৃক গৃহ ছেড়ে আলাদা বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

এই সময় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একদিন রামতনু লাহিড়ীর দেখা। ঈশ্বরচন্দ্রকে রামতনু অনুরোধ করলেন একটি রাঁধুনি বামুন ঠিক করে দিতে।

বিদ্যাসাগর বললেন, 'তুমি নিজে পৈতে ফেলে দিয়ে এসেছ সেই কাশীতে গিয়ে। তুমি আবার বামুনঠাকুর দিয়ে কী করবে ? বাবুর্চি-খানসামা হলে চলবে না ?'

রামতনু বললেন, 'আমার জন্যে চলবে। আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার স্ত্রী হেঁশেল ঘরে এমনকি বাড়ির মধ্যে বামুন ছাড়া ঢুকতে দেবে না।'

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, 'এখন স্ত্রীর কথায় বামুন খুঁজতে বেরোতে পারলে অথচ বাপের কথায় গলায় পৈতেগাছাটা পর্যন্ত রাখলে না।'

অন্য একটা গল্প। বিদ্যাসাগরের রসিকতা নয়। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রসিকতা।

সেই সময়ে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি বিবিধ সামাজিক আচার সংস্কারে মেতে উঠেছেন। তখন বিদ্যাসাগরের এক বন্ধু বারাসতে থাকতেন নাম কালীকৃষ্ণ। কালীকৃষ্ণ বাড়ির তৈরি কিছু আমের আচার বিদ্যাসাগরকে পাঠিয়ে দিলেন। আচার খেয়ে

বিদ্যাসাগর খুব সন্তুষ্ট। পরে কালীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁর আমের আচারের যথেষ্ট সুখ্যাতি করলেন। আচারের সুখ্যাতি শোনার পর সুরসিক কালীকৃষ্ণ বললেন, 'তা হলে ঈশ্বরচন্দ্র, তুমি বুঝতেই পারছ আমাদের সব আচার খারাপ আচার নয়।'

সর্বশেষে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথোপকথনের কিঞ্চিৎ সরস অংশ উদ্ধৃত করছি। আমার সূত্র শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত নামক মহাগ্রন্থের তৃতীয়ভাগ, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদ্ধৃতিগুলি নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত, শুধু সরসতার উদাহরণ রূপে পেশ করছি।

[এক] শ্রীরামকৃষ্ণ : আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর : (সহাস্যে) তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান। (হাস্য)।

[দুই] শ্রীরামকৃষ্ণ : সিদ্ধ তো তুমি আছই।

বিদ্যাসাগর : মহাশয়, কেমন করে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ : (সহাস্যে) আলু পটল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়। তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া। (হাস্য)।

বিদ্যাসাগর : (সহাস্যে) কলাইবাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়। (সকলের হাস্য)।

[তিন] শ্রীরামকৃষ্ণ : (সহাস্যে) একবার বাগান দেখতে যাবেন রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর : যাবো বইকি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ : আমার কাছে ? ছি ! ছি !

বিদ্যাসাগর : সে কি ! অমন কথা বল্লেন কেন ? আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : (সহাস্যে) আমরা জেলে ডিঙি। (সকলের হাস্য)। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর : সহাস্যবদন, চুপ করিয়া আছেন,ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : (সহাস্যে) তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর : (সহাস্যে) হ্যাঁ এটি বর্ষাকাল বটে ! (সকলের হাস্য)।

পুরানো সেই দিনের কথা

সরস বিদ্যাসাগরের গল্প আগে বলেছি। শুধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র নন, উনিশ শতকীয় বাঙালির সামাজিক জীবনে রসিকতার একটি মূল্যবান ভূমিকা ছিল। রসবোধ সমাজের সাংস্কৃতিক জগতে মর্যাদা পেত।

আবার বিদ্যাসাগরকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। কোনো একটা কাজে বিদ্যাসাগর পথ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছেন, রীতিমত হনহন করে। বিদ্যাসাগরের মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, প্রশস্ত ললাট, পায়ে চটি, পোশাকে-আচারে উৎকল দেশীয় মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।

রাস্তায় একদল ছেলে খেলা করছিল, বিদ্যাসাগর তাদের পাশ দিয়ে হনহন করে হেঁটে যেতে তাদের মধ্যে একজন ছেলে মন্তব্য করল, 'দ্যাখ, উড়ে যাচ্ছে।'

বিদ্যাসাগর থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, ছেলেটিকে ধরলেন, 'কি হে খোকা, তুমি আমাকে উড়ে বলছ?' ছেলেটি খুবই সপ্রতিভ, নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সংশোধন করে বললে,'না, আমি তাতো বলিনি। আপনি এই রকম ছুটে যাচ্ছেন, তাই বলছিলাম যেন উড়ে যাচ্ছেন।'

শোনা যায়, বুদ্ধিমান ছেলেটির এই জবাব শুনে ঈশ্বরচন্দ্র প্রীত হয়ে হেসেছিলেন এবং তার রসবোধের প্রশংসা করেছিলেন। বালকটিকে নাকি তিনি মিষ্টিমুখও করেছিলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মধুসূদনের গুণগ্রাহী ছিলেন। অফিসের কাজ শেষ হলে অনেকদিন ছুটির পর মধুসূদন পাইকপাড়ায় রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ওখানে যেতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়িতে বসে মধুসূদন লিখছিলেন, হঠাৎ লেখা থামিয়ে মধুসূদন রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন, 'সন্ধ্যা হলো, এখন আমার সন্ধ্যা আহ্নিকের ব্যবস্থা করুন।'

রাজা অবাক। মধুসূদন অব্রাহ্মণ, তাছাড়া সেই কবে খৃস্টান হয়েছেন তাঁর আবার সন্ধ্যা আহ্নিক কিসের। বিস্মিত রাজা কবিকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার আবার সন্ধ্যা আহ্নিক কিসের ?'

কবি লিখতে লিখতে স্মিতহাস্যে বললেন, 'গেলাস রূপ কোষায় দু আউন্স কারণরূপ পেগের গঙ্গাজলে আচমন কার্য সমাপন দ্বারা আহ্নিকাদি অনুষ্ঠান করতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর দেরি করবেন না।'

রাজবাড়িতে এ ধরনের আহ্নিক করার উপকরণের অভাব সেদিন হয়নি। হাসিমুখে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সেই সন্ধ্যায় মধুসূদন দত্তের অভিনব আহ্নিকের আয়োজন করেছিলেন।

সেবার মধুসূদন ঢাকায় গেছেন। ঢাকার যুবকেরা তাঁকে সংবর্ধনা দিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে বললেন, 'আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহাগৌরবান্বিত হই তেমনি আপনি ইংরেজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।'

মধুসূদন উত্তর দিলেন, 'আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মাইকেল মধুসূদনের গাত্রবর্ণ ছিল খুবই কালো। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য পাঠ করে নবদ্বীপ তীর্থ থেকে এক মুগ্ধ বৈষ্ণব কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন কবিকে দেখতে। মধুসূদনের কৃষ্ণবর্ণ দেখে সেই বৈষ্ণব বলেছিলেন, 'বাবা তুমি শাপভ্রষ্ট। গৌর অবতারে কালো অঙ্গ গৌর করে এসেছিলে। এবার আবার কালো রূপে মধুসূদন হয়ে এসেছ।'

সেই মধুসূদন ঢাকার সংবর্ধনায় সাহেব হয়ে যাওয়ার উল্লেখে আরও বলেছিলেন, 'আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন।...'

...'আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক-একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি। এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যখন বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি।...

...'আরো আমি শুদ্ধ বাঙালি নহি। আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।'

★ ★ ★

অতঃপর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় মহোদয় ছিলেন বঙ্কিমের বৈবাহিক। দুজনের মধ্যে পরস্পর রসিকতার সম্পর্ক। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের একটা বাতিক ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যেখানে শেষ হয়েছে তার পরে একটা উপসংহার যোগ করে উপন্যাসের ঘটনা এবং চরিত্রগুলির পরিণতি দেখাতেন। এ ধরনের রচনা উৎকৃষ্ট মানের হওয়া সম্ভব

নয়। তা হয়ও নি। বঙ্কিমচন্দ্রও পছন্দ করেননি ব্যাপারটা। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বাধ্য হয়ে দামোদরকে জানালেন, 'আপনি আমার উপন্যাসের উপসংহার লিখে আমাকে সংহার করেছেন।'

অন্য এক বার দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'শান্তি' নামে একটি উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন। বই পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দামোদরকে জানিয়ে ছিলেন,

প্রিয়তমেষু

শান্তি প্রাপ্ত হইলাম।

ইহলোকে পাইলাম। পরলোকেও ভরসা করি দামোদর বঞ্চিত করিবেন না।

ইতি—

বঙ্কিমচন্দ্রেরা তিন ভাই একবার এক বন্ধুগৃহে ব্রাহ্মণ ভোজনে যান, উপলক্ষ সাবিত্রী ব্রত।

ভোজনের পর দক্ষিণা, ব্রাহ্মণ বিদায়। দক্ষিণা গ্রহণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র দু' হাতই এগিয়ে দিলেন। বন্ধুটি প্রশ্ন করলেন, 'সেকি তুমি দু-হাতেই দক্ষিণা নেবে?'

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'না নিলে চলবে কেন ভাই। দেখছি চার আনা করে দক্ষিণা। তিন

ভাইয়ের রোজগার বারো আনা। অথচ আসা যাওয়ার গাড়ি ভাড়া একটাকা। বাকি চার আনা কি আমি পকেট থেকে দেবো নাকি?'

হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের আদালতেও রসবোধের অভাব ছিল না। একজনের স্ত্রী খুব সুন্দরী। সে বঙ্কিমবাবুর কোর্টে নালিশ করেছিল যে প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক প্রতিদিন জানলা খুলে তার স্ত্রীকে দেখে।

বঙ্কিমবাবু মামলা মিটিয়ে দিয়েছিলেন, এই বলে যে, 'হাওয়া আর চোখ কি কারোর বাধা মানে?'

★ ★ ★

এখানে একটু ঋণ স্বীকার করি, সম্প্রতি শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের 'সাহিত্যিক কৌতুকী' গ্রন্থটি হাতে এসেছে। সেই বইয়ে এ রকম অজস্র গল্পের ছড়াছড়ি। সেখান থেকেই আরও একটি কৌতুক কাহিনী পাঠকদের ভেট দিচ্ছি।

এই গল্পগুলি পুরনো দিনের বহু প্রচলিত গল্প। আগেই নানা জায়গায় ছাপা হয়েছে। হয়তো লোকমুখেও শোনা গেছে গল্প-গুজবে, আড্ডায়। গল্পগুলি অনেকেরই চেনা বা শোনা, শুধু নিবন্ধের খাতিরে পুনরুল্লেখ করতে হলো। ত্রুটি মার্জনীয়।

আবার হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাস। মামলার বিষয়বস্তুও ঐ একই। আদালতে এক ব্যক্তি নালিশ করেছে অন্য এক ব্যক্তির নামে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি নাকি প্রথম ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাকিয়ে তাকিয়ে তার স্ত্রীর রূপসুধা পান করে।

বঙ্কিম বাদীকে প্রশ্ন করলেন, 'সাক্ষী আছে?'

বাদী বললেন, 'ঠিক সে অর্থে কোনো সাক্ষী নেই। তবে হুজুর আমার স্ত্রীই লোকটাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে। সেই সাক্ষী।'

বাদীর এই বক্তব্য শুনে বঙ্কিমচন্দ্র হাসলেন, হেসে বললেন, 'তা হলে তো দেখা যাচ্ছে আপনার স্ত্রীরও পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করা অভ্যাস আছে। নতুবা তিনি কেমন করে জানলেন যে এই ব্যক্তি তাঁর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে।'

সোনার সংসার

অনেকদিন আগে এই নামে একটা বাংলা সিনেমা হয়েছিল। সে বহুকাল আগের কথা। মফঃস্বল দূর শহরের টিনের চালার নিচে এক জোড়াতালি আদ্যিকালের সিনেমা হলে ফোল্ডিং চেয়ারের ফিমেল ক্লাস সিটে মায়ের কোলে চড়ে সেই ছবি আমি দেখেছিলাম।

সেই ছবির গল্পের বিন্দুবিসর্গও আজ আর আমার মনে নেই। এই মহাভারতীয় নিবন্ধের হাস্যকর আখ্যানগুলির সঙ্গে সেই সোনার সংসারের কোনো সম্পর্ক নেই।

দু'একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব যাকে রকের ভাষায় গাঁজাখোরি গল্প বলে তাই দিয়ে এই সোনার সংসারের ছবি আঁকছি।

আগের দিন রাতে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেছে। পরদিন সকালে রাস্তায় মহেশের সঙ্গে গণেশের দেখা। গণেশ মহেশকে বলল, 'কি সাংঘাতিক কথা শুনছি। কাল রাতের ঝড়ে নাকি তোমার টিনের দোচালা ঘর উড়ে গেছে।' নির্বিকার মহেশ বলল, 'শুধু দোচালা ঘর নয়, সেই ঘরের সঙ্গে আমার বৌকেও উড়িয়ে নিয়ে গেছে। ভাগ্যিস আমি চণ্ডীমণ্ডপে তাস খেলছিলাম। খুব বেঁচে গেছি।'

মহেশের এই কথা শুনে গণেশ স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার বৌকে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল?'

মহেশ আরো নির্বিকার ভাবে বলল, 'একরকম ভালোই হয়েছে।' গণেশ গালে হাত

দিয়ে বলল, 'কি সাংঘাতিক কথা। বৌ উড়ে গেল। সেটা ভালো হয়েছে।'

মহেশ বলল, 'অনেকদিন হলোই আমার বৌ 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে না,' 'একটু বাইরে বেরোনো হচ্ছে না' এই সব বায়না করছিল। ভালোই হয়েছে, একটু উড়ে আসুক।'

ঠিক এর বিপরীত গল্পটি খুবই করুণ এবং মর্মান্তিক।

এক ভদ্রলোক অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। ভদ্রলোকের এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যখন এই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেলেন তখন ভদ্রলোকের গৃহিণী ইলিশ মাছের কাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাচ্ছেন।

নীরবে কাঁটা চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে একবারও চোখের পলক না ফেলে সদ্য বিধবা খেয়ে যেতে লাগলেন। মুখে কোনো শোকের ছায়া নেই, চোখে এক বিন্দু জল নেই। মৃতের সহকর্মী এমন দৃশ্য জীবনে দেখেননি। তিনি একটু সরল প্রকৃতির লোক, থাকতে না পেরে অবশেষে প্রতিবাদ করলেন, 'এ কি রকম স্ত্রী আপনি, আপনার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনেও আপনি মাছের কাঁটা চিবিয়ে খাচ্ছেন?' শেষ কাঁটাটা মুখে ফেলে দ্রুত চিবোতে চিবোতে মহিলা বললেন, 'দেখছেন তো কত তাড়াতাড়ি করছি। আগে চিবোনোটা শেষ হোক। তারপর দেখবেন কান্নাকাটি কাকে বলে। সাতপাড়ার লোক জানতে পারবে যে আমার স্বামী মরেছে।'

বড় বেশি বিয়োগান্ত হয়ে গেল এই কাহিনীটি। এ সব গল্প মধুর করে লেখার মতো যোগ্যতা আমার নেই। স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শোনার পরে কেউ যদি অবলীলাক্রমে ইলিশ মাছের কাঁটা চিবোয় তা হলে সেই দুঃখের গল্প মজা করে বলার প্রতিভাও আমার নেই।

সুতরাং আবার প্রকৃত মজার গল্পে ফিরে যাই। আবার সোনার সংসার। আবার স্বামী স্ত্রী।

প্রথম গল্পটি আসল রাজযোটকের গল্প। স্ত্রীর সন্দেহবাতিক আর স্বামীর কিঞ্চিৎ চরিত্র দোষ।

স্বামী দৈনিক কাজ থেকে ফিরে আসার পর স্ত্রী তন্ন তন্ন করে স্বামীর কোটের কলার, বুক, কাঁধ, এমনকি পিঠ পর্যন্ত খুঁজে দেখেন সেখানে কোনো রমণীর কেশ লেগে আছে কিনা।

বলা বাহুল্য, কখনো কখনো সত্যিই দু'একটি রমণীসুলভ দীর্ঘ কেশ ভদ্রমহিলা খুঁজে পান এবং তারপর শুরু হয় তুমুল চেঁচামেচি, গালাগাল, কান্নাকাটি। স্বামী নিজের দোষ মেনে নিয়ে এ সব ঝামেলা মুখ বুজে সহ্য করেন। কিন্তু চরিত্রদোষ তো সহজে বদলাবার নয়। স্বামী বেচারা খুব চেষ্টা করেও নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না।

কিন্তু অবশেষে তিনি সেই অসাধ্য সাধন করলেন। প্রায় দু' সপ্তাহ তিনি রমণীকূল থেকে দূরে দূরে রইলেন। স্ত্রী কিন্তু তাঁর তন্ন তন্ন তল্লাসি তখনও অব্যাহত রেখেছেন। তবু তাঁর নজরে পড়ছে না একটিও দীর্ঘ কেশ স্বামীর কোটে বা অন্য কোথাও।

অতঃপর একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামী অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর ভদ্রমহিলা অক্লান্ত পরিশ্রম করেও যখন একটিও কেশ উদ্ধার করতে পারলেন না, ক্ষোভে অভিমানে ফেটে পড়লেন স্বামীর ওপরে, 'ছিঃ ছিঃ, তোমার রুচি এখন এত নিচে নেমেছে। অবশেষে তুমি টেকো মেয়েছেলের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছ। ছিঃ ছিঃ।'

দাম্পত্য আলাপের সূত্রে অন্য এক প্রসঙ্গে যাচ্ছি। এ গল্পটাও অবশ্য প্রথমটির মতো ঝড়ে বাড়ি উড়ে যাওয়া নিয়ে।

স্বামী-স্ত্রী বাসায় শুয়ে আছেন। দু'জনেই গভীর নিদ্রামগ্ন, এমন সময়ে গভীর রাতে প্রবল ঝড় উঠল। বাতাসের ভীষণ শব্দে স্ত্রীর ঘুম ভাঙল। তাঁরা একটা টালির বাংলো মতন বাড়িতে থাকেন। ঝড়ের ধাক্কায় একেকবার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে বুঝি টালির ঘরটা উড়ে যাবে।

খুব ভয় পেয়ে স্ত্রী ঘুমন্ত স্বামীকে ডেকে তুললেন, 'ওগো, আমার কেমন ভয় হচ্ছে। সাংঘাতিক ঝড় হচ্ছে।' ঘুম জড়িত কণ্ঠে স্বামী বললেন, 'তাই কি হয়েছে ?' স্ত্রী বললেন, 'যেরকম জোরে হাওয়া বইছে, হঠাৎ বাড়িটা বাতাসের ধাক্কায় উড়ে না যায়।' চোখ না খুলে স্বামী স্ত্রীকে ধমক দিলেন, 'কি জ্বালাতন করছ মাঝ রাতে। ঘুমোও তো। বাড়ি উড়ে যাবে, আমাদের কি ? এ বাড়িটা তো আমাদের নয়। আমরা তো ভাড়াটে।'

★ ★ ★

এবার দুই স্বামীর কথোপকথন। দু'জনে বন্ধু, একই আড্ডায় ছুটির দিনে তাস খেলেন। প্রথম জন তাস খেলতে খেলতে দ্বিতীয়জনকে বললেন, 'আমার বৌ কাল রাতে একটা মজার স্বপ্ন দেখেছে, ওর এক লক্ষপতির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।'

এই গল্প শুনে দ্বিতীয় বন্ধু শুকনো হেসে বললেন, 'এ তবু ভালো। তোমার বৌ রাতে ঘুমের মধ্যে লক্ষপতির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে স্বপ্ন দেখেছে। আর আমার বৌ।...'

প্রথম বন্ধু এই অসম্পূর্ণ উক্তি শুনে প্রশ্ন করল। 'কেন তোমার বৌ কি স্বপ্ন দেখল ?'

দ্বিতীয় বন্ধু আরো শুকনো গলায় বললেন, 'আমার বৌ স্বপ্ন-টপ্ন দেখে না। সাদা চোখে দিনের আলোয় ভাবে তার স্বামী লক্ষপতি।' এই বলে কাতরভাবে তিনি শেষ করলেন, 'একেবারে পথে বসিয়ে দিলে ভাই।'

পুনশ্চঃ এই মুহূর্তে আরো দু'টি গল্প মনে পড়ছে। তার প্রথমটি পুরনো, হয়তো আগেও বলেছি।

দু'টি গল্প প্রায় একই। প্রথম গল্পটিতে এক ব্যক্তি পাগলা গারদে গেছে খোঁজ করতে সেখান থেকে দু' একদিনের মধ্যে কোনো পাগল পালিয়েছে কি না ? লোকটিকে প্রশ্ন করতে জানা গেল যে তার বৌ পালিয়ে গেছে যেন কার সঙ্গে। পাগল ছাড়া পৃথিবীতে আর কে তার বৌকে নিয়ে পালাবে। তাই খোঁজ করতে এসেছে পাগলা গারদে এর মধ্যে কোনো পাগল পালিয়েছে কি না।

দ্বিতীয় গল্পটিতেও বৌ পালিয়েছে। স্বামী থানায় ডায়েরি করতে এসেছেন। দারোগা সব শুনে প্রশ্ন করলেন, 'কার সঙ্গে পালিয়েছে ?' স্বামী বললেন, 'আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে।' দারোগা বললেন, 'কি নাম তার ?' স্বামী বললেন, 'নাম বলতে পারব না।' দারোগা হতবাক, ধমক দিয়ে বললেন, 'এই বললেন, আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।' স্বামী হাত কচলিয়ে বললেন, 'যার সঙ্গেই আমার বৌ পালিয়ে থাক, তাকে চিনি বা না চিনি সে অবশ্য আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এত উপকার এ জীবনে আমার আর কেউ করেনি।'

সমস্যা

এই কিছুদিন আগে একজন আধুনিক কবি লিখেছিলেন,

'সেই যে লোকটা বলেছিল,
তার কোনো সমস্যা নেই।
আসলে সেই লোকটা
নিজেই একটা সমস্যা।'

এই কবিটিকে আমি ভালো করে চিনি না কিন্তু যদি কখনো সামনা-সামনি দেখা হয় তার সঙ্গে, আমার একটু বোঝাপড়া করার আছে।

আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। আলো নেই, জল নেই টেলিফোন বাজে না। আমাদের দরকারি চিঠি ডাকে হারিয়ে যায়। মাছের বাজারে আমরা ঢুকতে ভয় পাই। মেয়ের পরীক্ষার রেজাল্টটা বেরোয় না। ছেলের চাকরির দরখাস্তের উত্তর আসে না। সকালবেলা হরিণঘাটার দুধের গাড়ি আসে না। বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়াতে বলেন অন্যথায় বাড়ি ছাড়তে বলেন। রাস্তায় বেরিয়ে বাসে উঠতে পারি না, উঠতে পারলে নামতে পারি না।

আমাদের সমস্যার শেষ নেই।

অথচ এ হেন সময়ে অবশেষে একজন সমস্যাহীন লোকের সন্ধান দিয়ে কবি নিজেই তাকে নিয়ে উপহাস করলেন। কবির সঙ্গে আমার বিশেষ বোঝাপড়া করার আছে।

আপাতত গোলমাল থাক। সমস্যা সংক্রান্ত নির্ভেজাল গল্পটি আগে বলি।

জাহাজডুবির পর প্রায় সবাই মৃত অথবা নিরুদ্দেশ। শুধু একজন যাত্রী কিছুটা ভাগ্যের জোরে, আর কিছুটা ভালো সাঁতার জানার দৌলতে সাঁতরিয়ে, প্রচুর সাঁতরিয়ে অবশেষে একটি নির্জন দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়।

দ্বীপটি খুব খারাপ নয়। মানুষজন অবশ্য নেই, তবে হিংস্র জীবজন্তুও তেমন নেই। গাছে পাকা ফল আছে, মিষ্টি জলের ঝরণা আছে। ভালোই দিন কেটে যাচ্ছিল জাহাজডুবির যাত্রীটির।

এর মধ্যে একদিন সেই ডুবে যাওয়া জাহাজের সন্ধানে আরেকটি জাহাজ এল সভ্য পৃথিবী থেকে। অকুস্থলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই জাহাজের লোকেরা আগের জাহাজের কোনো চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারল না। অবশেষে একেবারে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের আড়ালে নির্জন দ্বীপটি নজরে পড়ল তল্লাসকারী জাহাজের ক্যাপটেনের।

তখন সেই দ্বীপের পাশে গিয়ে জাহাজটা ভিড়িয়ে দিলেন তিনি। জাহাজের ডেক থেকে ক্যাপটেন সাহেব নিরুদ্দেশ যাত্রীটিকে দেখতে পেলেন। ঘাসের বিছানায় সে পরম আরামে চোখ বুজে এলিয়ে পড়ে রয়েছে। তার হাতের কাছেই নানারকম জানা অজানা লাল-সবুজ ফল।

দ্বীপের পাশে যে একটা জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছে লোকটি সেটা খেয়াল করেনি। সে ভাবতেও পারেনি তাকে উদ্ধার করার জন্যে জাহাজ এসেছে। সে শান্তিতে চোখ বুজে আছে।

জাহাজের ক্যাপটেনের লোকটিকে দেখে খুব মায়া হলো, একবার ভাবলেন ও এখানে বেশ আছে, শান্তিতে আছে, তাই থাকুক, আমরা ফিরে যাই। কিন্তু সেটা কর্তব্যে অবহেলা করা হবে, তাই লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে একবার জাহাজের সিটি বাজালেন। তন্দ্রাবিষ্ট লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে জেগে উঠল এবং জাহাজ দেখে দৌড়ে দ্বীপের কিনারে চলে এল।

জাহাজের ক্যাপটেন কিন্তু তখনই তাকে জাহাজে তুললেন না, তাকে বললেন, 'তুমি তো এখানে দেখছি চমৎকার আছ। ঝামেলাভরা পৃথিবীতে আবার সেই সমস্যা জর্জরিত জীবনে ফিরে গিয়ে কী হবে।' লোকটি এই কথা শুনে দোনামনা করতে লাগল, তার মনেও কেমন দ্বিধা দেখা দিল।

ঠিক এই সময়ে ক্যাপটেন সাহেব তাঁর খাস কামরা থেকে বিগত কয়েক সপ্তাহের এক গাদা খবরের কাগজ দ্বীপবন্দী লোকটির দিকে ছুঁড়ে দিলেন, দিয়ে বললেন, 'এই কাগজগুলো একবার পড়ো। এসব খবর পাঠ করার পরেও যদি সংসারে ফিরে যেতে চাও বলবে।'

লোকটি খবরের কাগজগুলো বগলদাবা করে দ্বীপের গহনে চলে গেল। তারপর সে আর ফিরে আসেনি। চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে জাহাজটি ফিরে যায়।

★ ★ ★

অতঃপর আরেকটি দার্শনিক সমস্যার গল্প বলি। এক ব্যক্তি হাওড়া স্টেশনের অনুসন্ধান

কাউন্টারে গিয়ে প্রশ্ন করলেন 'মশায়, এখান থেকে বর্ধমান যেতে কতক্ষণ লাগে ?' কাউন্টার শীতল কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আড়াই ঘণ্টা।'

এবার ঐ ব্যক্তি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা বর্ধমান থেকে এখানে আসতে কতক্ষণ লাগে ?' এবার কাউন্টার উত্তপ্ত হলো, 'এ প্রশ্নের মানে কি ? এখান থেকে বর্ধমান যেতে যদি আড়াই ঘণ্টা লাগে তবে বর্ধমান থেকে এখানে আসতেও আড়াই ঘণ্টা লাগবে। এই সামান্য কথাটা বুঝতে অসুবিধে কোথায় ? কী সমস্যা ?'

প্রশ্নকারী নির্বিকারভাবে বললেন, 'সমস্যা আছে।' কাউন্টারে ভিড় ছিল না, তাই কাউন্টার প্রশ্নোত্তরের খেই হারিয়ে ফেলেনি, তাছাড়া তার মনে কৌতূহলও দেখা দিয়েছে।

সুতরাং কাউন্টার আবার জানতে চাইল, 'কী সমস্যা ?' প্রশ্নকারী মৃদু হেসে বললেন, 'সমস্যা নয় ? একবার ভেবে দেখুন তো, জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাসে আসতে লাগে ন'মাস আর অক্টোবর থেকে ঐ জানুয়ারিতে ফিরতে লাগে মাত্র তিনমাস। যাতায়াত কি সর্বদা একসময়ে হয় ? হাওড়া থেকে বর্ধমান আড়াই ঘণ্টায় গেলেই বর্ধমান থেকে হাওড়ায় আড়াই ঘণ্টায় আসবে এমন কোনো কথা নেই।'

এই প্রশ্নকারীর যেমন সমস্যা আছে, তেমনিই সমস্যা সকলেরই আছে এবং থাকবে। এবার আমরা সমাধানের কথা ভাবি। এক সাহেব বুদ্ধিজীবী সমস্যা সমাধান নিয়ে একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যদি ন'টা টুপি থাকে আর দশটা মানুষ থাকে তবে একজন মানুষের মাথা কেটে সে সমস্যার সমাধান না করে অনেক ভালো হবে আর একটা টুপি বানিয়ে সে সমস্যার দূর করা।

তবে সব সময়ে সমস্যা দূর করতে চাইলেই যে সেটা দূর করা যায় তা নয়। মিশরদেশীয় আখ্যানটি স্মরণ করছি।

এক গৃহস্থের একটা বেতো ঘোড়া ছিল। সেটা এত বুড়ো হয়ে গিয়েছিল যে কোনো কর্মে লাগত না। শুধু শুধু সেটাকে দানাপানি খাওয়াতে হতো।

গৃহস্থের বাড়ির পিছনে একটা শুকিয়ে যাওয়া কুয়ো ছিল। সেটায় কোনো জল ছিল না, একেবারে শুকনো, খটখটে। পড়বি তো পড়, একদিন সেই বেতো ঘোড়াটা সেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

একটু চেষ্টা করার পর গৃহস্থ যখন বুঝতে পারল ঘোড়াটাকে কুয়ো থেকে তোলা অসম্ভব, সে এক বুদ্ধি করল, সে ঠিক করল মাটি ঢেলে কুয়োটাকে ঘোড়া সমেত বুজিয়ে দেবে, তাতে একসঙ্গে মজা কুয়ো আর বেতো ঘোড়ার সমস্যার সমাধান হবে।

সে কোদাল দিয়ে অন্য জায়গা থেকে মাটি কেটে ঝুড়িতে করে এনে শুকনো কুয়োয় ঢালতে লাগল। কিন্তু ফল হলো হিতে বিপরীত অথবা বিপরীত ক্রমে ঘোড়ার পক্ষে বিপরীতে হিত।

গৃহস্থ কুয়োর মধ্যে যত মাটি ফেলে, ঘোড়া তত মাটির ওপরে উঠে দাঁড়ায়, এই করতে করতে সেই ঘোড়া একসময়ে কুয়োর ওপরে উঠে বেরিয়ে এল। কুয়ো বোজানো হলো বটে কিন্তু গৃহস্থের বেতো ঘোড়ার সমস্যা রয়েই গেল।

* * *

পুনশ্চ

লেখার শেষে একটা অলৌকিক সমস্যার কথা বলি।

কয়েকদিন আগে এক বাড়িতে গেছি। বাড়ির ছোট মেয়েটি বাইরের ঘরে পুতুল নিয়ে খেলছে। তার কোলে দু-টো পুতুল। আমি তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি খুকু খবর কি?' খুকু ঠোঁট উলটিয়ে জবাব দিল, 'আর খবর। খুব বিপদ হয়েছে।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তোমার আবার কি বিপদ?' কোলের ডল পুতুলের মাথা আঁচরাতে আঁচরাতে সাত বছরের খুকু গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই দুটোকে নিয়েই পারছি না। এদিকে এই পুজোর সময় আমার আবার বাচ্চা হবে।'

ভুলের মাশুল

এক সাহেব বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন, 'অভিজ্ঞতা হলো সেই জিনিস, একই ভুল দু-বার করলে যখন আমরা ধরতে পারি যে এ ভুলটা আগেও একবার করেছিলাম।'

তিনি আরো বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে মানবজন্মে ভুল না করে উপায় নেই। যে মানুষ ভুল করে না সে কিছু করেও না, এবং সেটাই একটা বড় ভুল।

কথাগুলো একটু যেন জটিল হয়ে গেল। লঘু নিবন্ধের গোড়াতেই জটিলতা এনে আমি নিজেই বেশ ভালো একটা ভুল করে ফেললাম।

ভুলের বিষয়ে এযাবৎ আমি অনেক কিছুই উল্টোপাল্টা লিখেছি। এত সব হাবিজাবি অখাদ্য লেখার পর এখন আর কিছুতেই মনে থাকে না, খেয়াল করতে পারি না কোন্ গল্পটা আগে লিখেছি, কোন্টা মোটেই লিখিনি।

পরমা মান্যবতী সুবুদ্ধি পাঠিকা মহোদয়া, আমি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এইবার আপনি টিপটিপ কিংবা মিটমিট করে হাসছেন, অর্থাৎ আপনি ধরে ফেলেছেন আমার উদ্দেশ্য এবং বিধেয়।

অর্থাৎ দুয়েকটা পুরনো গল্প ভুল করে 'ভুলের মাশুল' নিবন্ধে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেবো। এই রকম আপনি ভাবছেন।

না। তা করব না।

একই গল্প বার বার লিখে লিখে লেখায় ঘেন্না ধরে গেছে আমার। কিন্তু প্রত্যেকবার নতুন গল্পই বা কোথায় পাব ?

ভুলের একটা গল্প আছে সেটা মোটেই নতুন নয়, গল্পও নয়, একেবারে খাঁটি সত্য কাহিনী। এবং আগেও লিখিনি।

আমার একটা পুরনো হাতঘড়ি আছে (কিংবা ছিল, এখন আর নেই)। ঘড়িটা আজকাল তেমন ভালো চলে না, অনেক সময় এগিয়ে যায়, অনেক সময় পিছিয়ে যায়, তার চেয়েও খারাপ, অধিকাংশ সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নট নড়ন-চড়ন নট ফট।

ঘড়িটা আমার পৈতের সময় আমার দিদিমা দিয়েছিলেন। সে অনেককাল আগের কথা। এতদিন পরে সেসব কথা থাক। শুধু একটা কথা লিখে রাখি, আমার এই কাঠখোট্টা জীবনে বিশেষ যে সামান্য কয়েকটি দুর্বলতা অবশিষ্ট আছে এখনো, তার মধ্যে ঐ প্রাচীন হাতঘড়িটির প্রতি দুর্বলতা একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছে।

যখন ঘড়িটা কম বেশি হয়, আমি ঠিকঠাক মানিয়ে নিই, উপযুক্ত মত কম বেশি মিলিয়ে নিই। যখন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যায়, আমি হাতে নিয়ে জোরে জোরে ঝাঁকি দিই, আবার চলা শুরু করে।

একেক দিন শুধু ঝাঁকি দিলে হয় না, একটা বৈদান্তিক মন্ত্র আছে, চরৈবেতি, চরৈবেতি, ঘড়িটার বেল্ট ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এই মন্ত্রটা বার বার আওড়াতে হয়, অবশেষে ঘড়িটায় প্রাণের স্পন্দন ফিরে আসে, আবার টিকটিকানি শুরু হয়।

সেদিন কিছুতেই ঘড়িটায় দম ফিরে আসছিল না, বহুক্ষণ ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে চরৈবেতি চরৈবেতি করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ হাত ফসকিয়ে ঘড়িটা মেঝেতে পড়ে গেল। তারপরে যখন আর কিছুতেই চালু হলো না, বাজারের ঘড়িওয়ালার কাছে ঘড়িটাকে সারাতে নিয়ে গেলাম।

ঘড়িওয়ালাকে বললাম, 'দেখুন ভুল করে ঘড়িটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

ঘড়িওলা ঘড়িটা খুলে দেখে আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'ঘড়িটাকে হাত থেকে ফেলে দেওয়ায় ভুল কিছু হয়নি। বরং তারপর আবার তুলে আনাই ভুল হয়েছে।'

শুধু এই নয়, আমার নিজের জীবনে আরো বহুরকম ভুল আছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লাভ নেই।

বরং তার থেকে একটি মর্মান্তিক ভুলের কাহিনী বলি।

বড়বাজারের এক ব্যবসায়ীর গদিতে এক কর্মচারী নতুন নিযুক্ত হয়েছেন। দুঃখের কথা, এই কর্মচারী কাজে যোগ দেওয়ার দুয়েক দিনের মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ঐ ব্যবসায়ী গদির ভিতরে তাঁর মানিব্যাগটি হারিয়ে ফেললেন। ব্যবসায়ীর অভ্যাস ছিল গদিতে বসে পকেট থেকে বার করে সামনের ক্যাশবাক্সের একপাশে মানিব্যাগটি রাখতেন।

কিন্তু সেদিন হলো কি, বিকেলের দিকে ব্যবসায়ীটি দেখলেন মানিব্যাগটি যথাস্থানে নেই। স্বভাবতই সন্দেহ গিয়ে পড়ল নতুন কর্মচারীটির ওপরে। এতদিন কখনো মানিব্যাগ চুরি যায়নি, আজ যখন চুরি গেছে—নতুন লোকটিই নিয়েছে, তাকেই ধরা হলো।

সেই হতভাগা কর্মচারীকে প্রচুর জেরা করা হলো, এমন কি সার্চ পর্যন্ত করা হলো কিন্তু মানিব্যাগটির কোনো হদিস মিললো না। অবশেষে যখন মালিক ঠিক করলেন যে ঐ নবনিযুক্ত কর্মীটিকে পুলিসের হাতে তুলে দেবেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাড়ি থেকে ফোন

এল এবং তাঁর স্ত্রী জানালেন যে তিনি আজ ভুল করে তাঁর মানিব্যাগটি শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ফেলে এসেছেন। ভদ্রমহিলা আরো বললেন যে, অনেকক্ষণ ধরেই তিনি এ কথাটা জানানোর জন্য চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফোনে লাইন পাননি।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কঠোর হলেও অমানুষ নন, এই ফোন পাওয়ার পর তিনি কেমন বিচলিত বোধ করলেন। তিনি তাঁর ভুলের কথা গদিঘরের সবাইকে বললেন, তদুপরি নবনিযুক্ত কর্মচারীটির কাছে হাতজোড় করে বললেন, 'কিছু মনে করো না ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে।'

এরপরে সেই কর্মচারী ভদ্রলোক যা বলেছিলেন সেটা স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, 'আমি কিছুই মনে করিনি। আপনিও ভুল করেছিলেন, আমিও ভুল করেছিলাম।'

এই কথা শুনে ব্যবসায়ীটি বললেন, 'আমি তো ভুল করেছিলাম। কিন্তু আপনি কি ভুল করেছিলেন?'

কর্মচারীটি বললেন, 'আপনার ভুল হয়েছিল আমাকে চোর ভেবেছিলেন। আর…।'

ব্যবসায়ীটি বাধা দিলেন, 'আর?'

'আর আমার ভুল হয়েছিল আমি আপনাকে ভদ্রলোক ভেবেছিলাম।' এই বলে কর্মচারী ভদ্রলোক বহু কষ্টে পাওয়া সামান্য চাকরিটি ছেড়ে চলে গেলেন।

কিন্তু সব সময়ে এত সহজে ছেড়ে যাওয়া যায় না।

একটি বাচ্চা ছেলে বারংবার চেষ্টা করেছিল হাত ছেড়ে পালাতে। কিন্তু সে পারেনি। তার কোনো দোষ নেই।

সেটা ছিল এক দোলের দিন। রাস্তায় বাচ্চা ছেলেরা হৈ-হুল্লোড় করে রঙ দিয়ে খেলা করছিল। ভূষিকালো থেকে ক্যাটক্যাটে লাল বা বেগুনি অজস্র রঙে মাখামাখি হতে হতে বেলা বারোটা নাগাদ বাচ্চাগুলো ভূতের মতো দেখতে হয়ে গেল। বাড়ির জানালা দিয়ে অনেক ডাকাডাকি করেও বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে না পেরে একটি বাচ্চার মা রাস্তা থেকে তাঁর ছেলেকে জোর করে ধরে আনলেন।

ছেলেটি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল মহিলার হাত ছাড়াতে। কিন্তু খুব শক্ত হাতে মহিলাটি ধরেছিলেন তাকে, সে কিছুতেই পিছলে যেতে পারল না, মহিলাটি তাকে পাকড়াও করে সোজা বাথরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রচুর জল ও সাবান দিয়ে পরিচর্যা করার পর যখন ছেলেটির আসল চেহারা বেরোলো তখন মহিলা অবাক, এ তো তাঁর ছেলে নয়। দোলের রঙ মেখে এমন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে সব বাচ্চা—তিনি ধরতেই পারেননি যে অন্য একটা বাচ্চাকে নিজের ছেলে ভেবে ধরে নিয়ে এসেছেন।

ভদ্রমহিলা যখন তাঁর ভুল ধরতে পারলেন তখন ছেলেটি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আর বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আর কোনো দিন আপনার ছেলের সঙ্গে রং খেলব না।'

অতঃপর আরো দু-টি মারাত্মক ভুলের গল্প বলি। দু-টি গল্পই তস্কর ও নারীঘটিত এবং রসিক ব্যক্তি মাত্রেই অন্য আকারে গল্প দুটো কোথাও না কোথাও শুনেছেন।

প্রথম গল্পটি ক্লাবে তাসের টেবিলে শোনা। অনেক রাত্রে তাস বাঁটতে বাঁটতে এক

ভদ্রলোক বললেন, 'কাল রাতে যখন এখানে তাস খেলছিলাম, তখন আমাদের বাসায় চোর ঢুকেছিল।'

সেই শুনে তাঁর তাসের পার্টনার জিজ্ঞাসা করলেন, 'চোর কিছু পেয়েছে?'

তাস বাঁটা শেষ করে একটি অতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন, 'তা পেয়েছে,' বলে চুপ করে গেলেন।

স্বভাবত পুনরায় প্রশ্ন হলো, 'কি পেল?'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'প্রচুর। আমার স্ত্রী ভুল করে ভেবেছিলেন আমি বুঝি বাড়ি ফিরলাম। প্রথমে তিনি একপাটি হাইহিল জুতো ছুঁড়ে মারলেন। চোরটা তো আমার মতো অভিজ্ঞ নয়, মাথা সরিয়ে নেয়ার আগে নাকে গিয়ে হিলটা লাগল। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত, লোকটা চোখে সরষের ফুল দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সেই অবস্থায় অব্যর্থ লক্ষ্যে তার মাথায় পড়ল লেডিস ছাতার স্টিলের বাঁট।' একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বলো, আর কি চাই?'

দ্বিতীয় গল্প ঐ একই, শুধু একটু রকমফের।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় তস্কর, সাক্ষীর কাঠগড়ায় মহিলা অর্থাৎ ঐ তাস-খেলোয়াড়ের সহধর্মিণী। হাকিম সাহেব সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাননীয়া ভদ্রমহিলা, আমি আপনার সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না। যেভাবে একাকী আপনি ঐ চোরকে ধরেছেন, তারপরে পুলিশের হেফাজতে তুলে দিয়েছেন সবই অতুলনীয়, কিন্তু আপনি আমাকে বলুন এমন নৃশংসভাবে কে এই আসামীকে প্রহার করল? এর নিচের পাটির সামনের তিনটে দাঁত ভাঙা, একটা চোখ কালো হয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, কপালে কাটা দাগ—সেখানে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে রয়েছে। এতো নির্যাতন এর ওপরে কে করল?'

ভদ্রমহিলা শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমিই মেরেছি একে।'

আদালত স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'একটা চোরকে এমন নৃশংসভাবে মারতে পারলেন আপনি?'

ভদ্রমহিলা অধিকতর শান্তকণ্ঠে বললেন, 'অন্ধকারে আমি ঠাহর করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম আমি আমার স্বামীকে পেটাচ্ছি। ভুল করে যে চোরটাকে মারছি তা মোটেই বুঝতে পারিনি।'

খানদান

হিন্দি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে বহু ব্যবহারে খানদান শব্দটির চরম অধঃপতন হয়েছে। সাধারণ দরিদ্র দর্শকদের চোখের সামনে খানদানি বাড়ির আভিজাত্য ও মহত্ত্ব, জৌলুস ও বিক্রম সেই সঙ্গে ঝালরবাতি, নর্তকি এবং রঙিন সুরার মোহ বিস্তার করা হয় এই সব সিনেমায়। দর্শকদের এসব দেখতে নিশ্চয় ভালো লাগে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাউসফুল যায় প্রাচীন অভিজাত বংশের অলীক কাহিনী নিয়ে রচিত এই চলচ্চিত্রগুলি।

খানদান শব্দটি খাঁটি ফার্সি। ফার্সি ভাষা থেকে ভারতীয় ভাষায় এসেছে। হিন্দি, বাংলা, উর্দু, উত্তর ভারতীয় প্রায় সব ভাষাতেই আছে এই শব্দটি।

শব্দটির অভিধানগত অর্থ হলো বংশ, বিশদভাবে উচ্চবংশ। এর বিশেষণ হলো খানদানি, যার মানে উচ্চবংশীয় বা অভিজাত।

অভিজাত সমাজের ধরন-ধারণ আলাদা। সে নিয়ে সাধারণের কৌতূহলের অন্ত নেই। তাদের কার্যকলাপ, জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি, তাদের অন্দরমহলের গুজব কেচ্ছার গল্পে সাধারণ জীবনযাত্রার বাইরের একটা অন্য মাত্রা আছে।

আবার অন্যদিকে অবস্থা পড়ে যাওয়া খানদানি চরিত্র বা পরিবার নিয়ে যে সব গল্প শোনা যায় সে খুবই নির্মম।

একটি ঢাকাই গল্প স্মরণ করা যেতে পারে। হৃত দৌলত ঢাকার এক নবাব অর্থাভাবে

চালের খুদ দিয়ে ফেনাভাত রেঁধে তাই দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। কিন্তু সেদিন দুপুরবেলা তাঁর সঙ্গে দু-জন লোক দেখা করতে এসেছে, তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন এদিকে উনুন অর্থাৎ আখা থেকে খুদের ফেনাভাত নামানো হয়েছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সে আর খাওয়া যাবে না। বাড়ির ভিতর থেকে খানসামা এসে বলল, 'হুজুর আখাউরা থেকে ক্ষুদিরাম ফেনীবাবুকে নিয়ে এসেছে ওরা এখনই শীতলপুরে যাবে, আপনি তাড়াতাড়ি দশ মিনিটের জন্যে ভিতরে আসুন।'

খানদানির জন্যে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌল্লাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। যুদ্ধে হেরে পালানোর সময় মনিমুক্তাখচিত পাদুকা ফেলে যেতে পারেননি। সেই পাদুকা দেখেই নদীর ঘাটে লোকে তাঁকে চিনতে পারে, তিনি ধরা পড়ে নিহত হন।

মহাভারতখ্যাত হুতোমপ্যাঁচার নক্সার লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন খাঁটি বনেদি বংশের সন্তান, একেবারে খানদানি। তাঁর পোশাক আশাক ছিল নিতান্ত সাদাসিধে। তখন কলকাতায় ঢাকাই উড়ানি খুব ফ্যাশন, তবে তার দাম খুব বেশি। সবাই কিনতে পারে না। কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসেছেন এক নব্য ধনী। তাঁর গায়ে ঢাকাই উড়ানি। এদিকে কালীপ্রসন্নের গায়ে সাধারণ একটা চাদর। সেই নব্য ধনী তাঁর চাদরটি একবার খুলছেন, একবার জড়াচ্ছেন—এইভাবে কালীপ্রসন্ন এবং অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কালীপ্রসন্ন বাড়ির ভেতর থেকে সরকার, নায়েব, ভৃত্য এদের ডাকলেন, এরা যখন বাইরে বেরিয়ে এল দেখা গেল এদের প্রত্যেকের গায়ে রয়েছে ঐ ধনী ব্যক্তিটির চেয়েও দামি ঢাকাই উড়ানি।

খানদানি কায়দা একদিনে আয়ত্ত হওয়ার নয়। চলাফেরা খাওয়া দাওয়া শোয়াবসা সব বিষয়ে তার আলাদা ব্যাকরণ।

বিলিতি খানদানি কায়দা সম্পর্কে, বিশেষ করে খাওয়ার টেবিলে কী করণীয় সে বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সারদানন্দ স্বামীকে একদা কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রায় একশো বছর আগের উপদেশ, কিন্তু এখনও এর দাম আছে। যদি বিলিতি অভিজাত কায়দায় কেউ রপ্ত হতে চান তাঁর জন্যে উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

'ওরে, ডান হাতে ছুরি ধরতে হয় আর বাঁ-হাতে কাঁটা দিয়ে মুখে তুলতে হয়।...ছোট ছোট গরস করবি।...

'খাবার সময় দাঁত জিব বার করতে নেই। কখনও কাশবি না। ধীরে ধীরে চিবোবি।...'

'খাবার সময় বিষম খাওয়া বড় দুষণীয়। আর নাক ফোঁস ফোঁস কখনো করবে না।'

স্বামী বিবেকানন্দের এই উপদেশ পড়ে যদি কারো খটকা লাগে, তাকে জানাই আমার সোর্স হলেন স্বয়ং মহামহিম মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর 'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

খানদানি ভদ্রতার ব্যাপারে ভারতীয় সমাজে লখনৌর নবাব এবং আমির-ওমরাহরা ইতিহাসে সুবিদিত। শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত সতরঞ্জ কী খিলারি বইতে তার কিছু নমুনা দর্শকরা দেখেছেন।

একটি অবিস্মরণীয় গল্প আছে নাকি ভদ্রতা নিয়ে। গল্পটা অনেকেই জানেন, তাই নির্যাসটুকু বলছি।

এক নবাবের বেগমসাহেবা গর্ভবতী হয়েছেন দীর্ঘদিন। মাসের পর মাস যায়, বছরের পর বছর যায় তিনি আর সন্তান প্রসব করেন না। অবশেষে হেকিম সাহেবকে ডাকা হলো,

তিনি সব দেখে বললেন, 'একটি নয়, বেগম সাহেবার পেটে রয়েছে দু-টি পুত্রসন্তান। সেই হয়েছে অসুবিধে।'

অসুবিধেটা কি ? সেটা আর কিছুই নয় সাবেকি নবাবি ভদ্রতার পরিণাম। দু-জনেই নবাবের সন্তান, দুজনেরই রক্তে রয়েছে খানদানি। সৌজন্যবোধ, কেউই মাতৃগর্ভ থেকে আগে বেরোবে না, এ অন্যকে বলছে, 'আপ পহেলা যাইয়ে', আবার অন্যজন একে বলছে, 'আপ পহেলা যাইয়ে।'

ভদ্রতা করতে করতে বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, দু-জনারই দাড়িগোঁফ গজিয়ে গেছে কিন্তু এখনও এদের জন্মগ্রহণ করা হলো না। দু-জনেই পরস্পরকে হাতজোড় করে বলে যাচ্ছেন, 'আপ পহেলা যাইয়ে।' 'আপনি আগে চলুন।'

অতি ব্যস্ততার মধ্যে খানদানি গল্পের খেই হারিয়ে ফেলছি। অন্য কোনো সময় ধীরে সুস্থে পুরনো খানদানি গল্প বলা যাবে। এখন একটু বিপরীত দিকে অভদ্রতায় যাচ্ছি।

আপাতত নিতান্ত একটি অখানদানি গল্প, অভদ্রতার আখ্যান দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করছি। গল্পটা অনেকেরই নিশ্চয়ই জানা, সুতরাং এ রকম ভদ্র নিবন্ধের শেষে এ রকম একটি গল্প, কেউ যদি মনে করেন অভদ্রতা হচ্ছে, দয়া করে মার্জনা করবেন।

রাস্তার পাশে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে একটি বারো-তেরো বছরের উঠতি কিশোর সিগারেট টানছিল আর নতুন শেখা ধূমপানের আনন্দে ঠোঁট দিয়ে ছোট ছোট ধোঁয়ার রিং করে সামনে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শিক্ষয়িত্রী গোছের এক মধ্যবয়সী ভারিক্কি ভদ্রমহিলা।

কিশোরটির মুখ থেকে বেরোনো নিখুঁত ধোঁয়ার রিংগুলি ভদ্রমহিলার নাকে চোখে মুখে লাগছিল। তিনি একটু সরে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে বললেন, 'এইটুকু বাচ্চা ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছো আর ধোঁয়া ছুঁড়ে দিচ্ছো আমার মুখে। তুমি ভদ্রতা শেখোনি ?'

বুক টান টান করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটি বলল, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলছেন, আপনি কি ধরনের ভদ্রমহিলা ? আপনি আবার ভদ্রতার কথা তুলছেন ?'

পুনশ্চঃ আরো একটি অভদ্রতার গল্প এবং এটাই শেষ।

ঘটনাটি এই শহরের এক রেস্তোঁরায় কিছুকাল আগে ঘটেছিল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না কিন্তু যিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি রীতিমত বিশ্বাসযোগ্য এবং তাঁর কাছ থেকে আমি সরাসরি শুনেছি।

এক ভদ্রলোক রেস্তোঁরা থেকে খেয়ে চলে যাওয়ার সময় বেয়ারাকে মাত্র পঞ্চাশ পয়সা বখশিস দিলেন। এত অল্প বখশিস পেয়ে বেয়ারাটি খুব অপমানিত বোধ করল, সে প্লেট থেকে আধুলিটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোককে ফেরত দিয়ে বলল, 'নিয়ে যান লাগবে না।'

ভদ্রলোক বেয়ারাকে বললেন 'একি অভদ্রতা ?' বেয়ারা রেগে গিয়ে বলল, 'অভদ্রতা আমি করিনি, আপনি করেছেন। সামান্য পঞ্চাশ পয়সা বখশিস অভদ্রতা হলো না ?'

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'আর কত হলে অভদ্রতা হবে না ?' বেয়ারা গম্ভীর মুখে বলল, 'অন্তত আরো পঞ্চাশ পয়সা।' এবার জবাব দিলেন ভদ্রলোক, 'তা হবে না। আমি তোমার সঙ্গে দু-বার অভদ্রতা করতে পারব না।'

মহাজ্ঞানী মহাজন

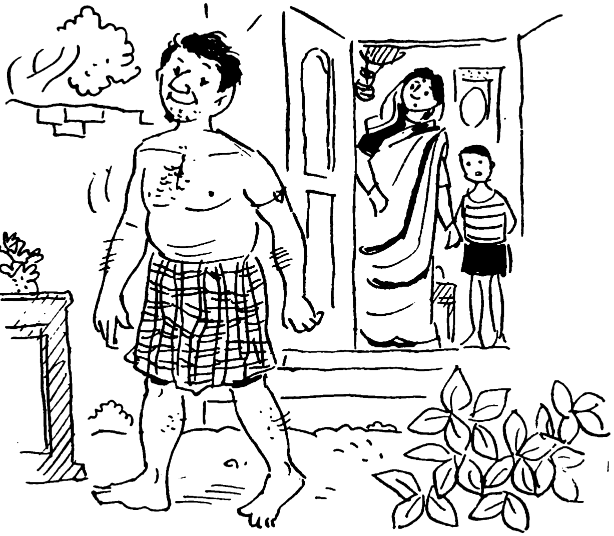

প্রাচীন প্রবাদ বাক্য বলেছে যে মহাজনেরা যে পথে গিয়েছেন, সেই পথই আমাদের পথ।

গত শতকের বাঙালি কবি একটি বহুপঠিত ইংরেজি কবিতার বঙ্গানুবাদে বলেছিলেন যে মহাজ্ঞানী মহাজনেরা যে পথে গমন করেছেন, আমরাও সেই পথে গিয়ে বরণীয় হব।

উক্ত প্রবাদ এবং কবিবাক্য শিরোধার্য করে এই নিবন্ধে আমরা শুধু মহাজন আখ্যান স্মরণ করব। বলাবাহুল্য, আমার সম্বল সেই সব সরস কাহিনীগুলি যার কোনো কোনোটি বহুশ্রুত কিন্তু যার আবেদন এখনও অব্যাহত।

এ ধরনের আলোচনা পরম রসিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দিয়েই আরম্ভ করা উচিত। তার আগে একথা উল্লেখ করতেই হবে যে বাংলা ভাষায় অদ্যাবধি যতগুলি সরস গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে অনন্যতম হলো শ্রীম লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। পরমপুরুষের বাক্যের প্রাঞ্জলতা এবং চিন্তার সরসতার গঙ্গাযমুনা মিলন হয়েছে এই অমর গ্রন্থে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অথবা স্বামী সারদানন্দের সেই স্মরণীয় পুস্তক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ পরম রসিকের কৌতুকছটায় ঝলমল করছে। কিন্তু এসব গ্রন্থের বাইরেও রামকৃষ্ণের আরো গল্প নানা পুস্তকে স্মৃতিচিত্রে, জনচিত্তে এবং লোকমুখে আজও ছড়িয়ে রয়েছে।

আপাতত দু-টি গল্প স্মরণ করা যাক। লেখার সুবিধের জন্য এই গল্পগুলি এবং এই নিবন্ধের অন্যান্য গল্পও আমি নিজের ভঙ্গিতে লিখছি। কোনো ত্রুটি হলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিশ্চয় আমাকে মার্জনা করবেন।

প্রথম গল্পটি অসামান্য। অহেতুক সাধনার অর্থহীনতা একটি ছোট গল্পে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা শুধু রামকৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব।

নদী পার হওয়ার সনাতন গল্প। একজন তার বাড়ি ছেড়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে চোদ্দ বছর নির্জনে সাধনা করল এবং সেই সাধনা দ্বারা কিছু ফলও অর্জন করল। সে বাড়ি ফিরে এসে তার বড় ভাইকে বলল, 'দাদা, আমি চৌদ্দ বছর নির্জনে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছি।' দাদা বললেন, 'তাই নাকি, কি সিদ্ধিলাভ করেছিস ?' তখন সে জানালো, 'আমি পায়ে হেঁটে নদী পার হতে পারি। জলের উপর হাঁটতে শিখেছি।'

দাদা হেসে ফেললেন, 'চৌদ্দ বছর ধরে এত কষ্ট করে নির্জনে সাধনা করে তুই এটা কিরকম সিদ্ধি অর্জন করলি ? এর তো মাত্র আধ পয়সা দাম !'

দাদার কথা শুনে মন খারাপ করে ছোটভাই বলল, 'নদীর উপর হেঁটে পার হওয়া, এর দাম মাত্র আধ পয়সা।' দাদা আবার হাসলেন, হেসে বললেন, 'এর থেকে বেশি কি হবে ? আধ পয়সাই তো লাগে খেয়ায় চড়ে নদী পার হতে। সবাইতো আধ পয়সা খরচ করে করে নদী পার হয় আর তোকে কিনা সেজন্যে চৌদ্দ বছর তপস্যা করতে হলো।'

পরের গল্পটি মর্মান্তিক ও বৈরাগ্যবিধুর।

একজনের স্ত্রী একদিন বাপের বাড়ি থেকে এসে তার স্বামীকে বলল, 'জানো আমার দাদা সন্ন্যাসী হবে।' তাই শুনে সে জিজ্ঞাসা করল 'কি করে বুঝলে ?'

স্ত্রী বলল, 'দাদা আস্তে আস্তে সন্ন্যাসীর যা কিছু দরকার কৌপীন, কমণ্ডলু খড়ম এই সব সংগ্রহ করছে।' স্বামী হেসে ফেলল, বলল, 'দূর পাগলি, তোর দাদা কোনো দিনও সন্ন্যাসী হতে পারবে না। অতসব জোগাড়যন্ত্র করে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।'

সরলা প্রকৃতি স্ত্রী বলল, 'তা হলে কী করে সন্ন্যাসী হওয়া যায় ?' স্বামী বলল, 'ওরে বোকা, সন্ন্যাসী হওয়া দেখবি ?' এই বলে কাপড়চোপড় খুলে ফেলে গামছা পরে স্ত্রীকে মা বলে ডেকে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। আর কোনোদিন সে সংসারে ফেরেনি।

রামকৃষ্ণের এই গল্প টলস্টয় লিখতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ পারতেন। কিন্তু আর কারো পক্ষে বোধহয় সম্ভব ছিল না।

★ ★ ★

রামকৃষ্ণের পর বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ সম্পর্কে যাঁদের ধারণা 'হে ভারত ভুলিও না' কিংবা 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী' তাঁদের অন্তত একবার, মহেন্দ্রনাথ দত্তের, 'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থটি পড়তে অনুরোধ করব। যে কোনো পুরনো গ্রন্থাগারে, যদি বাড়িতে না থাকে, বইটি পাওয়া যাবে।

'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে সরস স্বামী বিবেকানন্দের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় তবে তার বাইরেও রয়েছে স্বামীকে জড়িয়ে অজস্র কৌতুকময় কাহিনী।

বিবেকানন্দ মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটতেন। একদিন সকালে দেখা গেল তিনি বাঁ দিকে সিঁথি কেটেছেন। প্রবাসী সঙ্গীদের সে দিকে দৃষ্টি পড়ায় স্বামীজী একটু হাসলেন। জানলার

কাচের বাইরে রাস্তায় লোকজন সব দেখা যাচ্ছিল। মেমসাহেবেরা সেজে গুজে সকাল বেলায় রাস্তায় বেরিয়েছে যে যার কাজে, সে দিকে তাকিয়ে স্বামীজী একটি কৌতুকপূর্ণ গান রচনা করলেন,

'ছাতি হাতে টুপি মাথায়
আসবে যত ছুঁড়ী
মুখে মেখেছে তারা
ময়দা ঝুড়ি ঝুড়ি।'

বিবেকানন্দীয় রসিকতার একটি তুলনাহীন গল্প বলি। গল্পটি ঘটি-বাঙাল সম্পর্কের মতো অতি জটিল বিষয়ে।

কোনো গঙ্গাহীন দেশে (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে) কলকাতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ি যায়। সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির। আর শাশুড়ির বেজায় জেদ। 'আগে একটু দুধ খাও।'

জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার। দুধের বাটিতে যেই চুমুক দেয়া অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ি আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা। তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে। এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে। আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা, শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।'

শুধু এই রকম তির্যক গল্পই নয়। নিত্যনৈমিত্তিক নানা বিষয়ে তাঁর রসিকতা ছিল কখনও কখনও মর্মান্তিক।

বিলাতে বাসকালে দেশাই উপাধিধারী এক গুজরাতি যুবক প্রায়ই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এরকম আরো অনেকেই আসতো। কিন্তু এঁর একটা দোষ ছিল যে ইনি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখে এনে স্বামীজীকে শোনাতেন।

অবশেষে একদিন খুবই বিরক্ত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেশাইকে বললেন, 'যে কাজ করতে এসেছ সেই কাজ মন দিয়ে করগে যাও। সংস্কৃতে কবিতা লিখবার জন্যে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে আসবার কোনো দরকার ছিল না, ওতো বাড়িতে বসেই হতো।'

সর্বশেষে স্মরণীয় হলো নিজের সন্ন্যাস সম্পর্কে স্বামীজীর উক্তি। সারদানন্দ স্বামীকে তিনি বলেছিলেন, নিজের সম্পর্কে, 'আমি সব পথ চেষ্টা করে দেখেছি। মাস্টারি করবার চেষ্টা করেছি। ওকালতি করবার চেষ্টা করেছি। দেখলুম সব পথ বন্ধ। তারপর এই পথটা দেখলুম। এই পথটা আমার খুলে গেল। এতেই সাকসেস (Success) হলো। মানুষকে সব পথ চেষ্টা করতে হয়। তা হলে একটা পথ খুলে যাবে। তাতেই সে সফল হবে।'

স্বামী বিবেকানন্দের মতো মনীষীর পক্ষেই এ কথা বলা সম্ভব। এবং এর পরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না।

স্বেচ্ছাসেবক

'স্বেচ্ছা' শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার সম্পর্কে আমার সামান্য আপত্তি আছে। আগেও আপত্তি জানিয়েছি, আরও আপত্তি জানাচ্ছি।

যেখানে ইচ্ছা বললেই হয়ে যায় সেখানে স্বেচ্ছা কেন ? খবরের কাগজে দেখি, বেতারে শুনি, দূরদর্শনে দেখি এবং শুনি স্বেচ্ছায় রক্তদান। স্বেচ্ছা কথাটা কোথা থেকে এল ? কেউ যদি স্বেচ্ছায় রক্তদান না করে সে তো মারাত্মক, রীতিমতো ভয়াবহ ব্যাপার।

এর পরে হয়তো দেখা যাবে শ্রীযুক্ত অমুক স্বেচ্ছায় নেতৃত্বদান করেন তমুক মিছিলে, শ্রীমান অ এবং শ্রীমতী আ স্বেচ্ছায় পরিণয়জালে আবদ্ধ হয়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে যা হোক আমাদের বিষয়বস্তু স্বেচ্ছা নয়, স্বেচ্ছাসেবক ইংরেজিতে যাকে বলে ভলানটিয়ার।

আজকাল স্বেচ্ছাসেবকের অভাব নেই। যে কোনও সভায় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গেলে দেখা যাবে বুকে ব্যাজ লাগিয়ে দলে দলে ভলানটিয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ গেটে দাঁড়িয়ে, কেউ হল বা সভার মধ্যে, কেউ মঞ্চে উঠে তত্ত্বাবধান করছে। তার মধ্যে পাড়ার বেকার যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছেন মাননীয় বিচারপতি বা বিখ্যাত চিত্রতারকা। প্রত্যেকেরই বুকে সেফটিফিন বা ক্লিপ দিয়ে রঙিন বিচিত্র বর্ণ ব্যাজ লাগানো, তাতে লেখা 'গ্যান্ডেরিয়া বান্ধব সমিতি ১৯৮৭ হীরক জয়ন্তী উৎসব', অথবা 'সারা ভারত খো খো সম্মেলন

রামপুরহাট', নিদেনপক্ষে 'ভারতীয় আরতিতে সন্ধ্যা সঙ্ঘ।'

সবাই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত এবং গর্বিতভাবে জামা, পাঞ্জাবি বা কোটের বুকপকেটে ব্যাজ ঝুলিয়ে তদ্বির-তদারকি, মাতব্বরি করে যান। এই ব্যাজ হল সর্দারির পাসপোর্ট। তবে অনেক সময় বিশেষ করে অনুষ্ঠানাদিতে এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, ব্যাজধারী ভলানটিয়ারের তুলনায় দর্শকের সংখ্যা অনেক কম।

যে কোনও পুজো সুভেনির খুললেই তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পৃষ্ঠায় কর্মকর্তা এবং পৃষ্ঠপোষকদের তালিকার পরেই দেখা যায় দীর্ঘ এক-দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা। এই সব তালিকা যথেষ্ট পরিমাণ বিস্তৃত, এতে কাউকেই বাদ দেওয়া হয় না। এক পাড়ায় হয়তো সাতজন বাচ্চু এবং পাঁচজন খোকন আছে, পর পর সাতবার বাচ্চু এবং পাঁচবার খোকন লেখা হয়েছে, যাতে কেউই এই ভেবে দুঃখিত না হয় যে, তার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাতে ভয়াবহ কাণ্ড হতে পারে। কারণ, তার বাবাই হয়তো প্রতিমা নিয়ে আসার এবং বিসর্জনের লরিটা সরবরাহ করেন কিংবা তার কাকা এনে দেয় পুজো সুভেনিরের জন্যে নামী সিগারেট কোম্পানির ব্যাক পেজ বিজ্ঞাপন।

এই স্বেচ্ছাসেবক বা ভলানটিয়ারদের তালিকায় যাদের নাম আছে, তার মধ্যে ছেলেমেয়ে উভয়ই আছে, তবে অধিকাংশই বালখিল্য, এখনও এরা ডাকনামেই পরিচিত এবং উপাধি ব্যবহারের যোগ্য হয়নি। কোনও বিশেষ কারণ না থাকলে পাড়ায় প্রায় এরকমই সবারই নাম ছাপা হয়ে যায় এই তালিকায়। সুতরাং, পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত বা বিখ্যাত হয়েছে এমন বহু ব্যক্তির নাম প্রথম ছাপার অক্ষরে পাড়ার পুজো সুভেনিরে বেরিয়েছিল, এরকম ঘটা বিশেষ বিচিত্র নয়।

সে যা হোক, এই তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবকরা, এই মুনাই, বুবাই, টুপাই ইত্যাদিরা এদের নাম স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মুদ্রিত হলেও এরা গণ্যের মধ্যে আসে না। এদের বড়জোর পুজোর দিনগুলোতে অথবা বিসর্জনের দিনে একটা ব্যাজ পরতে দেওয়া হয়, অনেকের ভাগ্যে তাও জোটে না। পুজো বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাইরেও রাজনৈতিক মঞ্চে বা মিছিলেও বহু স্বেচ্ছাসেবক। তবে এদের বিষয়ে পরিহাস করার সাহস আমার নেই। পুরনো ফটোগ্রাফে প্রাচীন দিনের কংগ্রেস অধিবেশনের গান্ধী টুপি মাথায় দেওয়া, ঋজু, শক্ত চিবুক ভলানটিয়ারদের ছবি দেখা যায়। তাদের মুখচোখে একটা নম্র দৃঢ়তা, একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ ছিল। একালের রাস্তা আটকানো, তোলা আদায়কারী, চাঁদাবাজ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা অবশ্যই অসঙ্গত হবে।

রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবকদের কথায় কাজ নেই। বরং চাঁদার প্রসঙ্গে যখন এসে গেছি সেখানেই যাই।

একটি ঘটনার কথা জানি। কোনও এক এলাকায় কিছুদিন হল নতুন একটি পরিবার এসেছে। সেই পরিবারের কর্তা ঠিক কী যে করেন সেটা ভাল করে কেউ এখনও জানতে পারেনি। তবে জিনিসপত্র, ফার্নিচার, পর্দা, দৈনিক বাজার সেই সঙ্গে বাড়ির লোকের সাজপোশাক, জামাজুতো দেখে রীতিমতো সচ্ছল মনে হয়।

পাড়ায় পুজোর ভলানটিয়ার মহোদয়েরা বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলতে বেরিয়েছেন। অবশেষে এই নতুন পরিবারটির বাড়িতেও তাঁরা এলেন। তখন সন্ধেবেলা, দরজায় কড়া নাড়তে বাড়ির ভেতর থেকে একটি বালক বেরিয়ে এল। এসে চাঁদার খাতা হাতে ভলানটিয়ারদের

দেখে বলল, 'বাবা বাড়ি নেই।'

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায়ও ওই একই ব্যাপার ঘটল, অর্থাৎ, 'বাবা বাড়ি নেই।' ভলানটিয়ার দল একটু ঘুরে ফেরার পথে আবার এলেন, তখনও 'বাবা বাড়ি নেই।'

এই রকম দু-চার দিন রাত দশটা, সাড়ে দশটা পর্যন্ত চেষ্টা করেও গৃহস্বামীকে ধরা গেল না। ভলানটিয়ারদের সন্দেহ হলো, মিথ্যে কথা বলছে না তো চাঁদা এড়ানোর জন্যে। কারণ, এ রকম হামেশাই হয়। ভলানটিয়ারদের মনোভাব অনুমান করেই বোধহয় অবশেষে একদিন বালকটি বলল, 'খালি খালি সন্ধ্যাবেলায় আসেন কেন ? বাবাকে সন্ধ্যাবেলা পাওয়া যাবে না। সকালের দিকে সময় করে আসবেন, ঠিক পেয়ে যাবেন।'

সত্যিই তাই, পরের দিন সকালে যেতেই বাড়ির কর্তাকে পাওয়া গেল। কিন্তু চাঁদার কথা বলতেই কর্তা যা বললেন অভিজ্ঞ চাঁদা আদায়কারীরা পর্যন্ত সে রকম কথা জন্মেও শোনেনি।

গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ও, আপনারা পাড়ার পুজোর জন্যে চাঁদা তুলতে এসেছেন ? তা একটা কথা জানতে চাই, আপনারা কি বখশিস নেন ?'

সাতসন্ধ্যা ঘুরে যাওয়া ভলানটিয়ার মহোদয়েরা এই রকম কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, সবচেয়ে তিরিক্ষে মেজাজের যিনি দলনেতা তিনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'পাড়ায় নতুন এসেছেন একটু ভেবেচিন্তে, সাবধানে কথা বলবেন। আপনার কাছে বখশিস কে চাইছে মশায়, আমরা চাঁদা, পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছি।'

গৃহস্বামী হাত জোড় করে বললেন, 'আমি তো সেই জন্যেই জানতে চাইছি আপনারা বখশিস নেন কিনা ?'

নবাগতের এই রকম ঔদ্ধত্য দেখে চাঁদা আদায়কারীরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, পেটানো দরকার না 'পেটো' দরকার এই সিদ্ধান্তে আসার আগেই গৃহস্বামী বললেন, 'আপনারা শুধু শুধু রাগ করবেন না, আগে আমার কথাটা শুনুন।'

ভলানটিয়ারদের একজন একটু ঠাণ্ডা মেজাজের তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার কথাটা কী শুনি ?'

ভদ্রলোক তখন বললেন, 'দেখুন আমি চৌরঙ্গিতে একটা বারে বেয়ারার কাজ করি। আমার যা কিছু উপার্জন, সবই ওই বখশিস। তাই চাঁদা দেওয়ার আগে জানতে চাই, বলুন জানা উচিত কিনা, আপনাদেরও মানসম্ভ্রম আছে আপনাদের চাঁদা যাই দিই, সে তো ওই বখশিস, সেটা কি আপনারা নেবেন ?'

চাঁদা আদায়কারী স্বেচ্ছাসেবকদের মানসম্ভ্রম বিষয়ে অন্য একটি পুরনো গল্প আছে।

কাহিনীটি সেই আমলের যখন পুজোর স্বেচ্ছাসেবক মানে চাঁদা আদায়কারীরা আজকের মতো এতটা বেপরোয়া বা মারমুখী ছিলেন না। তখন গৃহস্থকে তাঁরা সমীহ করে চলতেন এবং চাঁদা নিয়ে নিরীহ নাগরিকের উপর অহেতুক জুলুমবাজি চলত না।

সেই সময় পুজো কমিটির এক ঘরোয়া সভায় ভলানটিয়ারদের চাঁদার খাতা বিলি করা হচ্ছে, কে কোন্ অঞ্চলে চাঁদা আদায় করবে সেই এলাকা ভাগ করে দিচ্ছেন সম্পাদক।

সম্পাদক রীতিমতো ভারিক্কি, বয়েস প্রায় বছর পঞ্চাশ। হঠাৎ একজন ভলানটিয়ার চাঁদার খাতা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি ওই রামলাল রোডে চাঁদা তুলতে পারব না। ওখানকার লোকগুলো ভীষণ তেরিয়া, চাঁদা চাইলেই মারতে আসে। গত তিন বছর ওখানে

আমি চাঁদা তুলতে গিয়ে ঢের অপমান হয়েছি।' ভলানটিয়ারটির নাম প্রবোধ, তার মুখে এই কথা শুনে বিস্মিত হয়ে সম্পাদক চোখ থেকে চশমা নাকের উপর নামিয়ে তাকে বললেন, 'দেখ, প্রবোধ চাঁদা তুলতে গিয়ে অপমান আবার কী ? আজ ছত্রিশ বছর ধরে পুজো করছি। চাঁদা তুলতে গিয়ে লোকের বাড়িতে কত গালাগাল খেয়েছি, ঘাড় ধাক্কা খেয়েছি, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, দোতলা থেকে নোংরা জল, আবর্জনা মাথায় ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি যে আজ পর্যন্ত কেউ কোনও দিন আমাকে অপমান করতে পারেনি।'

স্বেচ্ছাসেবকদের চাঁদা আদায় নিয়ে আর একটা গল্প মনে পড়ছে, সেটা দিয়ে এই রচনা শেষ করা যাবে। তার আগে একটা আসল গল্প বলে নিই।

আসল গল্প মানে মদ খাওয়ার গল্প।

আগের বছর পুজোমণ্ডপে মদ খেয়ে ভলানটিয়ারেরা একটু বেলেল্লাপনা করেছিলেন। এ বছর সিদ্ধান্ত হয়েছে, না পুজোয় কোনও রকম মদ খাওয়া মোটেই নয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে ভলানটিয়ারদের মূল কর্তা দু-জন নিজেদের মধ্যে গোপনে ঠিক করলেন যে, এক বোতল ব্রান্ডি কিনে রাখা হবে, রাতবিরেতে কোনও স্বেচ্ছাসেবক কখনও যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে চাঙা করে তুলতে হবে তো। তাই এক বোতল মদ কিনে সিংহের ফাঁপানো কেশরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হল।

কোনও রকমে সপ্তমীর দিনটা গেল। অষ্টমীর রাতে আর থাকতে পারলেন না এক নম্বর কর্তা, দুই নম্বরকে বললেন, 'ওরে, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, বুক ধড়ফড় করছে, সিংহের কেশর থেকে বোতলটা বার করে আন তো।' দুই নম্বর অম্লান বদনে বললেন, 'বোতলটা আর নেই তো। এক নম্বর হতভম্ব হয়ে বললেন, 'সে কি ?' দুই নম্বর বললেন, 'হ্যাঁ কী আর করব, কাল যে আমারও শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল।'

এবার শেষ কাহিনী, আবার চাঁদা।

এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখা আমার। পুজোর আরতি হচ্ছে। পুজোর চাঁদা এ বছর ভাল ওঠেনি।একটা তামার থালায় কয়েকটা খুচরো পয়সা ফেলে সম্পাদক দু'জন ভলানটিয়ারকে সেই থালা হাতে দর্শকদের মধ্যে পাঠালেন যদি দর্শনী কিছু ওঠে। ঝনঝন করে পয়সা বাজাতে বাজাতে জনতার মধ্যে থালা ঘোরাতে লাগল ভলানটিয়ার দু'জন। দ্রুত ভিড় হালকা হয়ে গেল। একজন তাড়াতাড়ি সরতে গিয়ে থালাটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। সন্ত্রস্ত সম্পাদক অবস্থা দেখে ভলানটিয়ারদের নির্দেশ দিলেন, 'ওরে, পয়সা তুলতে হবে না। থালাটা কোনও রকমে রক্ষা কর, থালাটা শিগগির ফিরিয়ে আন।'

বক্তা ও বক্তৃতা

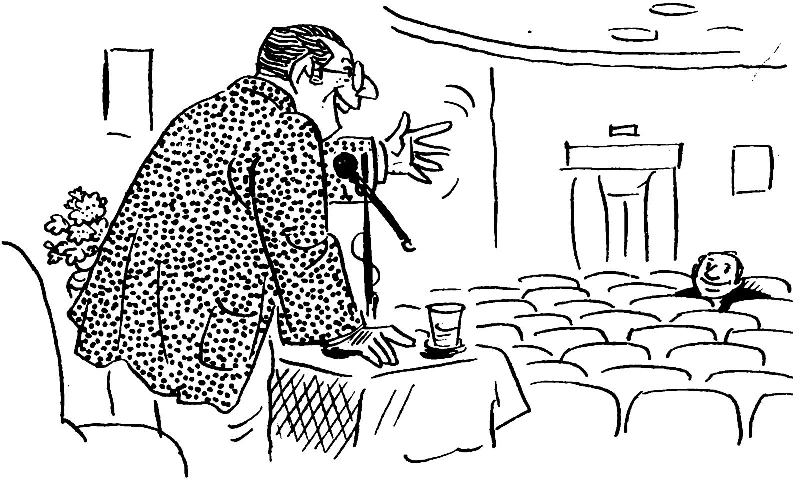

সেই গল্পটা তো সবাই জানেন। দীর্ঘ বক্তৃতার অন্তে এক বক্তা দেখলেন সভাকক্ষ সম্পূর্ণ শূন্য। শুধু একটি মাত্র লোক বসে রয়েছে। কোনো কোনো গল্পে এই লোকটি হলের দারোয়ান, চাবি হাতে অপেক্ষা করছে, বক্তৃতা শেষ হলে ঘরে তালা দেবে বলে। কোনো গল্পে সে হলো মাইকওলা, মাইকটা খালি হলে ফেলে যেতে পারছে না। আবার আরো পুরনো গল্পে ঐ লোকটি শতরঞ্জির মালিক, যে শতরঞ্জির ওপর দাঁড়িয়ে বা বসে বক্তা এতক্ষণ বক্তৃতা করছেন, বক্তৃতা শেষ হলেই সে শতরঞ্জিটা নিয়ে বাড়ি চলে যাবে।

এই গল্পটি বহুল প্রচারিত। নানা জায়গায় নানাভাবে এই গল্পটি আমি শুনেছি। এমনকি বিহারের অজ পাড়াগাঁয়ে দেহাতি হিন্দিতে এক স্কুল শিক্ষক আমাকে এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন। তাঁর গল্পে ঐ শেষ শ্রোতাটি ছিল একজন চৌকিদার, যার উপরে স্থানীয় থানা থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই সভা সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়ার।

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং কৌতুককর ছিল এক বিলিতি জোকবুকের গল্পটি। সেই গল্পটিও একটি বক্তৃতা সভা নিয়ে, একের পর এক বক্তা বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। বিষয় খুবই গুরুতর যথা পারমাণবিক অস্ত্রের নিরস্ত্রীকরণ অথবা আবহাওয়া দূষণ।

সে যাই হোক বক্তার অভাব হয় না এসব কোনো বিষয়েই। সুতরাং বক্তৃতা চলতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবশেষে একজন বক্তা তাঁর বক্তৃতা শেষ করার পর যথারীতি

দেখতে পেলেন হলের মধ্যে একজন মাত্র ব্যক্তি বসে রয়েছেন। ডায়াস থেকে নেমে বক্তা যখন এই শেষ শ্রোতাটিকে তাঁর ধৈর্যশীলতা এবং আগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ দিতে যাবেন, দেখা গেল সেই শ্রোতাটিও ডায়াসের দিকে এগিয়ে আসছেন। বক্তা ভাবলেন শ্রোতা বুঝি তাঁকে কিছু বলতে চান। কিন্তু দেখা গেল তা নয়। আসলে শ্রোতাটিও এই সভার একজন, নির্দিষ্ট বক্তা। তিনি আগের বক্তাকে বললেন, 'আমি আপনার পরের বক্তা। আর তো কেউ নেই। একটু বসে শুনে যাবেন।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'অবশ্য আমি খালি সভাতেও বক্তৃতা করতে পারি।'

বক্তৃতা করা অনেকের কাছে নেশার মতো। দু'চার দিন কোথাও বক্তৃতা দেওয়া বাদ পড়ে গেলে তাঁদের দমবন্ধ হয়ে আসে। তাঁরা হাঁফিয়ে ওঠেন। তাঁরা হিল্লি, দিল্লি, গৌহাটি, ভাগলপুর ঘুরে বেড়ান বক্তৃতা করার জন্যে। সব সময় যে উদ্যোক্তারা তাঁদের যাতায়াতের খরচ বহন করেন এমন নয়, বহু ক্ষেত্রেই বক্তারা নিজেদের পয়সা খরচ করে নিকট দূর জায়গায় জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা করে আসেন।

ঠিক এ জাতের নয়, এর চেয়ে একটু উঁচু জাতের এক বক্তা এক মফঃস্বল শহরে গিয়েছেন বক্তৃতা করতে। সেই শহরের সভার উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন বক্তা ট্রেনে আসবেন তাই তাঁরা দলবেঁধে গাড়ি আসার নির্দিষ্ট সময়ে রেল স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন বক্তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

কিন্তু বক্তা ভদ্রলোক নিজের গাড়িতে করে সড়ক পথে সেই শহরে আসেন। ফলে যখন তিনি সভামঞ্চে পৌঁছে গেছেন তখন অভ্যর্থনাকারীরা অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্যে রেল স্টেশনে।

পরে সভার শেষে এই ঘটনার জন্যে উদ্যোক্তারা যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সমিতির সভাপতি মহোদয় বক্তাকে বললেন, 'স্যার আপনি আসার সময় আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারিনি তার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু আপনি চলে যাওয়ার সময় সে ভুল হবে না। আমরা সবাই মিলে আপনাকে বিদায় দেব।'

সেই বক্তা ভদ্রলোক এ রকম দুঃখপ্রকাশ দেখে খুশি হয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না। তার চেয়ে বক্তা থাক। বক্তৃতার কথা বলি।

অনেকদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম যে প্রত্যেক বক্তার তিনটে করে বক্তৃতা থাকে।

প্রথম বক্তৃতাটি হলো, তিনি যে বক্তৃতাটি করবেন বলে ভেবেছেন। তারপর দ্বিতীয় হলো, যে বক্তৃতাটি তিনি আসলে করলেন। এবং শেষ বক্তৃতা হলো, প্রকৃত বক্তৃতা সারা হওয়ার পর যা বললে ভালো হতো এবং যা না বললে ভালো হতো এই বিবেচনা করে বক্তা মনে মনে যে আদর্শ বক্তৃতাটি রচনা করলেন।

অতঃপর দুটো বক্তৃতার আখ্যান বলি।

এক ছোট শহরের অধিবাসীরা তাঁদের শহরের এক সফল ধনী ব্যক্তিকে ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা জানাচ্ছিলেন। ধনী ভদ্রলোক এই শহরের আদি বাসিন্দা নন, তিনি বাইরে থেকে এখানে এসেছিলেন।

সংবর্ধনার জবাবে তিনি অভিভূত হয়ে বললেন, 'বন্ধু ও প্রতিবেশীগণ, আপনাদের

আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। আপনারা আমাকে অনেক দিয়েছেন। আপনাদের এই শহর আমাকে অনেক দিয়েছে। আমার মনে পড়ছে চল্লিশ বছর আগের কথা যখন আমি এক অপরিচিত আগন্তুক আপনাদের এই শহরে একাকী এসেছিলাম। আমার ক্লান্ত দেহ, শ্রান্ত চরণ। সঙ্গে কিছুই নেই। শুধু কাঁধে একটা ক্যানভাসের ঝোলা। এই সম্বল করে আমি এখানে এসেছিলাম। তারপর আমার এত সাফল্য এসেছে। এত উন্নতি হয়েছে।....'

ভদ্রলোক আরো অনেক কিছুই বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ সভার মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা আপনার কাঁধের ঐ ক্যানভাসের ব্যাগের মধ্যে কী ছিল?'

বক্তা একটু ঢোঁক গিলে বললেন, 'লাখ পনেরো নগদ টাকা আর আড়াইশো ভরি সোনা।'

এ গল্পেরই অন্য একটা রকমফের। গল্পের মূল কাঠামো একই। সেই সফল ব্যবসায়ী, তাঁর ষাট বছর বা পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে গণসংবর্ধনা। তবে তাঁর বক্তৃতাটা একটু অন্যরকম। তিনি বললেন, 'আমার সেই মাঘ মাসের ঠাণ্ডা রাত্রির কথা মনে পড়ছে। দুর্দান্ত শীত, সঙ্গে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। আমি সেই দুর্যোগের মধ্যে এই শহরে এলাম। কাউকে চিনি না। কাউকে জানি না। আমার সারা শরীরে কোনো জামাকাপড় নেই। আমি ঠকঠক করে কাঁপছি। কাঁপতে কাঁপতে কাঁদছি। ভালো করে গলা ছেড়ে কাঁদতেও পারছি না, গলায় জোর নেই। হাত পা সেও চলছে না।'

সেই সময়ে হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু স্যার আমরা যে শুনেছিলাম আপনি এই শহরেই জন্মেছেন?'

বক্তা ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন। আসলে আমি আমার জন্মদিনের কথা বলছিলাম, ঐ মাঘ মাসে বৃষ্টির রাতে আমার জন্ম কিনা, তাই বলছিলাম।'

★ ★ ★ ★

পুনশ্চঃ এক নির্বাচন প্রার্থী এক বিতর্কিত অথচ বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে ভোটের আগে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন।

সেই বিতর্কিত ভদ্রলোক এক বাক্যে ঐ প্রার্থীকে সাহায্য করতে এবং তার জন্যে বক্তৃতা করতে রাজি হলেন, তবে বললেন যে, 'তুমি একবার ভালো করে ভেবে এস, তোমার পক্ষে যদি আমি বক্তৃতা করি তাহলেই তোমার বেশি লাভ হবে নাকি তোমার বিপক্ষে বক্তৃতা করলে তোমার বেশি লাভ হবে?'

আবার বক্তৃতা

বক্তৃতা যাঁরা করেন অর্থাৎ বক্তাবৃন্দ এবং বক্তৃতা যাঁরা শোনেন অর্থাৎ শ্রোতাবৃন্দ উভয়েই জানেন যে বক্তৃতা হলো অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার, রীতিমতো জটিল বিষয়।

বক্তৃতা একবার আরম্ভ হলে শ্রোতাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে কখন সে বক্তৃতা শেষ হবে। মজার কথা এই যে শুধু শ্রোতারাই নয়, বক্তা নিজেও বহু সময় জানেন না যে কখন তাঁর বক্তৃতা শেষ হবে। কখনো কখনো বক্তৃতার খেই হারিয়ে যায় কি বিষয়ে বলছিলেন সেটা বক্তা ভুলে যান। অনেক সময় ঘুরে ফিরে একই জায়গায় বারবার চলে আসেন। একবার এক বক্তৃতায় বক্তা মহোদয়কে এগারবার বলতে শুনেছিলাম 'তমসো মা জ্যোতির্গময়।' সেটা ছিল এক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী উৎসব। এগার বার একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল তবুও বক্তব্যের কাছাকাছি ছিলেন তিনি।

ঐ ভদ্রলোককে পরে একদিন অন্য এক জায়গায় 'বর্ষামঙ্গল' সঙ্গীত উৎসবে উদ্বোধনী বক্তৃতা করতে শুনি। কিন্তু এবারেও উনি ঐ 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' সাতবার উদ্ধৃতি দিলেন।

পরে বুঝেছিলাম এটা তাঁর মুদ্রাদোষ। তবে এমন অনেক বক্তা আছেন যাঁরা বক্তৃতা করতে উঠে কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যান কি বিষয়ে বক্তৃতা করছিলেন। এঁরা হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে দিলে শ্রোতাদের আশ্বস্ত হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই। কারণ মঞ্চে উপবিষ্ট

অন্য কারো কাছ থেকে সেদিনের সভার বিষয় সম্পর্কে অনুচ্চ কণ্ঠে এবং নির্লজ্জভাবে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এঁরা আবার মাইকে ফিরে আসেন। এইবার তাঁদের বক্তব্য আবার শুরু হয়, হ্যাঁ, যা বলেছিলাম....' এই বলে। বলা বাহুল্য এতক্ষণ যা বলছিলেন এবং এখন যা বলবেন তা মোটেই এক নয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাঁরা অনর্গল বক্তৃতা করে যেতে পারেন তাঁদের প্রাণশক্তি, ফুসফুস এবং কণ্ঠনালী খুবই সবল। রাষ্ট্রপুঞ্জে কৃষ্ণ মেননের অথবা ভুট্টোর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা সারা পৃথিবীতে বিস্ময় সঞ্চার করেছিল। দীর্ঘ বক্তৃতা সম্পর্কে গল্প আছে যে এক ভদ্রলোক বক্তৃতা করতে করতে মধ্যরাত কাবার করে দেন। তারপর সেটা খেয়াল হতে লজ্জিত হয়ে নিজের শূন্য বাঁ হাতের মণিবন্ধটা দেখিয়ে বললেন, 'হাতে ঘড়ি নেই তাই সময়টা খেয়াল করিনি, একটু দেরি হয়ে গেল কেউ কিছু মনে করবেন না।' ক্লান্ত, নিদ্রাতুর শ্রোতাদের মধ্যে একজন হাই তুলতে তুলতে উঠে বলল, 'হাতে ঘড়ি না থাক, দেওয়ালে তো ক্যালেন্ডার ছিল। সেটা দেখলেই বুঝতে পারতেন পুরো একদিন পার করে দিয়েছেন'।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটা গল্প আছে, সেটা একটু জটিল। এক আশাবাদী বক্তা খুব বক্তৃতা করে চলছিলেন, শ্রোতারা ক্রমশ অধীর হয়ে উঠেছিল, অবশেষে সেই বক্তা বললেন, 'আমার বক্তৃতা আপনাদের জন্যে নয়, আমি বলছি পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে।' শ্রোতাদের মধ্যে তখন একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি থামবেন না। আর একটু বক্তৃতা চালিয়ে গেলেই পরবর্তী প্রজন্ম এসে যাবে।'

সব বক্তারই প্রধান দুশ্চিন্তা হলো যে তাঁর বক্তৃতার সময় লোকজন হল থেকে উঠে না যায়। এতো প্রায় সকলেরই জানা যে অনেক খ্যাতনামা লোক আছেন যাঁরা জীবনে তাঁদের নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু তাঁদের বক্তৃতা কেউ শুনতে চায় না, তাঁরা মঞ্চে উঠলেই—এমনকি মঞ্চে ওঠার আগে তাঁদের নাম ঘোষণা মাত্রেই হল থেকে শ্রোতারা দল বেঁধে উঠে চলে যায়।

স্বীকার করা ভালো যে এর মধ্যে তেমন কোনো পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নেই। আসলে উক্ত বক্তাদের বক্তৃতার কুখ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে, সে বক্তৃতার কোনো চমক নেই, রস নেই, নতুন বক্তব্য নেই—শুধু কথার পর কথার পর কথা। কে শুনবে সেই ছাই পাঁশ কাঠের চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে।

তবে এই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিলেন এক বুদ্ধিমান হিন্দিভাষী বক্তা। যে কোনো অচেনা জায়গায় বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি যা বলতেন, তার তর্জমা নিম্নরূপ।

'বন্ধুগণ, আমি বক্তৃতা করার আগে একটা কথা জানাতে চাই। আমি যখন সভাকক্ষে আসছিলাম দেখলাম হলের বাইরের বারান্দায় এক পানওয়ালী দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলল, হলের মধ্যে এক বাবু এসেছেন আমার কাছ থেকে একটা পান খেয়ে আর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে। কিন্তু দাম দিয়ে আসেননি। পানওয়ালীটি টাকার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে। আমি তাকে বললাম ভেতরে আসতে। কিন্তু সে হলের মধ্যে আসতে সঙ্কোচ বোধ করছে।....

'সে যা হোক আমি বক্তৃতা আরম্ভ করছি। যিনি ওর কাছ থেকে পান সিগারেট খেয়ে এসেছেন পয়সা না দিয়ে তাঁকে অনুরোধ গরিব পানওয়ালীটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, একবার

উঠে গিয়ে তার হিসাবটা মিটিয়ে দিয়ে আসবেন।'

বলা বাহুল্য, এর পরে একজন শ্রোতাও ভদ্রলোকের বক্তৃতাকালে সভা ছেড়ে উঠে যাননি। কারণ তা হলেই সকলে ধরে নেবে ইনিই ঐ পানওয়ালীর খাতক।

তবে সবাই যে বক্তৃতা করতে ভালোবাসেন কিংবা সদা সর্বদা বক্তৃতা করতে ইচ্ছুক ও উৎসুক তা নয়। বরং অধিকাংশ লোকই বক্তৃতা করতে চায় না, বক্তৃতার নামে তাদের গায়ে জ্বর আসে।

এই ধরনের লোকদের জন্যে একটি সুখবর আছে। খবরটি এসেছে সুদূর পলিনেসিয়া থেকে।

পলিনেসিয়ার আদিম জাতিদের ওপরে গবেষণা করতে গিয়েছিলেন এক বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্। সেখানকার সামোয়া নামক এক গহন অরণ্য প্রদেশের সামন্তনেতা তাঁকে সাদর সংবর্ধনাজ্ঞাপন করেন একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী নৃত্যগীতাদির পরে সভার কার্যসূচিতে ছিল সামন্ত নেতা কর্তৃক নৃতত্ত্ববিদের প্রতি স্বাগত ভাষণ। সেই নৃতত্ত্ববিদ অবাক হয়ে দেখলেন যে ভাষণ দিতে সামন্তটি মোটেই উঠলেন না বরং অন্য এক ভাড়াটে বক্তা এসে তাঁর হয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে নৃতত্ত্ববিদের প্রশংসা ও গুণগান করলেন।

অবশ্যই সভার নির্ঘণ্টে এর পরেই ছিল নৃতত্ত্ববিদের ভাষণ অর্থাৎ ধন্যবাদজ্ঞাপন জাতীয় একটু বক্তৃতা।

বক্তৃতা করার জন্যে নৃতত্ত্ববিদ মহোদয় উঠতেই তাঁকে বাধা দেওয়া হলো। বিস্মিত হয়ে তিনি জানতে চাইলেন সভার কার্যসূচিতে তাঁর বক্তৃতা রয়েছে তাহলে বক্তৃতা দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন? সামন্তনেতা তখন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে বক্তৃতা হলো পেশাদারি ব্যাপার। ওর জন্যে আলাদা লোক নিযুক্ত করা আছে। তারা এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট। নৃতত্ত্ববিদকে কষ্ট করে নিজের ভাষণ দিতে হবে না তার জন্যে লোক মজুত আছে। যে একটু আগে সামন্তনেতার তরফে স্বাগত ভাষণ দিয়েছে সেই অতঃপর ধন্যবাদজ্ঞাপন করবে নৃতত্ত্ববিদের তরফে।

অবশেষে একটি উপদেশ।

কোনো সভায় বক্তৃতাকালে যদি কোনো বক্তা কোনো রসিকতা করেন তা হলে সে রসিকতা আপনার ভালো লাগুক অথবা না লাগুক, পছন্দ হোক বা নাই হোক চিৎকার করে অতি অবশ্য হো হো করে হাসবেন। চেষ্টা করবেন পাশের দর্শকদেরও দলে টানতে।

কারণ আপনারা যদি না হাসেন, ঐ বক্তা ধরে নেবেন আপনারা তাঁর রসিকতাটি মোটেই ধরতে পারেননি। তিনি আবার এবং আবার, আপনারা না হাসা পর্যন্ত রসিকতাটি চালিয়ে যাবেন। তার থেকে প্রথমবারে একটু কষ্ট করে হেসে নেওয়াই ভালো নয় কি?

কথামালার রহস্য সন্ধানে

সপ্তাহে সপ্তাহে হাজার খানেক শব্দ সমন্বয় করে একটা কিছু লিখে ফেলা, প্রায় যে কোনো বিষয়ে, আজ বেশ কয়েক বছর হলো এটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এটা অবশ্য তেমন কোনো ব্যাপার নয়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা বহুকাল ধরে এর চেয়ে বেশি, অনেক বেশি লেখেন। প্রতিদিনই গড়ে হাজার শব্দ লেখেন এমন বাঙালি লেখকও বিরল নয়।

সে কথা নয়। আসল অসুবিধে হয়েছে আমার নিজেকে নিয়ে। সরাসরি স্বীকার করা উচিত আমার ভাষাজ্ঞানের অভাব নিয়ে। যে বিষয় যেভাবে লেখা উচিত, যেভাবে লিখবো বলে ভাবি কিছুতেই লিখে উঠতে পারি না।

ভাবনা নিয়ে আমার তেমন কোনো ভাবনা নেই, সে প্রায় ঝরনার মত মনের অথবা মাথার মধ্যে ঝর ঝর করে বয়ে যাচ্ছে। বাক্য বা বাক্যবন্ধ রচনা করা নিয়েও তেমন অস্বস্তি বোধ করি না। আমার যত অসুবিধে শব্দ ও শব্দগুচ্ছ নিয়ে। ঠিক শব্দ ব্যবহার করা নিয়ে, তার প্রকৃত মানে কি সেটা ভাবতে গিয়ে লেখার মধ্যখানে থমকে দাঁড়াই, ঘণ্টায় একশ কিলোমিটার বেগে চলছিল হাতের কলম, হঠাৎ লেভেল ক্রসিংয়ে মেল ট্রেনের মতো অসহায় দাঁড়িয়ে পড়ে, সামনে পড়ে থাকে আদিগন্ত শূন্য লাইনের পর লাইন।

তিন দশকেরও বেশিকাল উলটো পালটা, খারাপ ভালো কবিতা লিখে কিংবা লেখার

চেষ্টা করে আমার মধ্যে শব্দ ব্যবহার করা নিয়ে যে অপরিসীম দুর্বলতা জমে গেছে, শুধু জন্মায়নি যার শিকড় আমার অবচেতন মনের মধ্যে বিপুল গভীরে ঢুকে গেছে তার থেকে আমার পরিত্রাণ নেই।

সুপণ্ডিত পাঠক হয়তো হাসছেন মূর্খের এই বাগাড়ম্বর দেখে। এই মুহূর্তে তিনি হয়তো গত সংখ্যার লেখা থেকেই একশো একটি শব্দ বার করে চোখে আঙুল দিয়ে এবং ব্যাকরণ ও অভিধানের পৃষ্ঠা খুলে দেখিয়ে দিতে পারেন আমার জ্ঞানের অভাব।

কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ছে। তখন 'বিদ্যাবুদ্ধি' লিখছি। সেখানে 'গোপাল ভাঁড়' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আলুর গুদামে আগুন লাগার সেই পুরনো গল্পটি এসেছিল প্রসঙ্গক্রমে। আমি লিখেছিলাম, 'গোপাল ভাঁড়কে বলা হয় অষ্টাদশ শতকের লোক। কিন্তু আলুর ব্যাপারটা ঐ শতকের সঙ্গে মিলছে না, সে অনেক পরের ব্যাপার।'

এর পরে একাধিক পাঠক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই লিখে যে কবি কঙ্কনে অর্থাৎ আরও আগে আলুর উল্লেখ আছে, সুতরাং গোপাল ভাঁড়ের যুগে আলু ছিল না তা নয়।

ফলে আমাকে আলু শব্দটি নিয়ে বিচলিত হতে হয়েছিল। খবর পেলাম শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনই কোথায় যেন লিখেছেন যা আলোর মধ্যে জন্মায় তাই আলু। সব রকমের মূল, কন্দ বা শিকড়ই হলো আলু। কবি কঙ্কনে যে আলুর কথা বলা হয়েছে সে এখনকার গোল আলু নয়। খুব সম্ভব রাঙা আলু বা মিষ্টি আলু কিংবা শাঁক আলু এমনকি কোনো কচুও হতে পারে। কিন্তু তখনো আমার সন্দেহ ছিল শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে। সে সন্দেহ ঘনীভূত হয় সংসদ বাঙ্গালা অভিধান দেখে, সেখানে শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে না ফরাসি থেকে সে সম্পর্কে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্প্রতি সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মহোদয়, একটি পত্র দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে আলু শব্দ হলো ফার্সি। অর্থ হলো শেকড় বা root (রুট)। অবশ্য কৌতূহলী পাঠকের জিজ্ঞাসা হয়তো এতে নিরস্ত হবে না, কারণ সংস্কৃতেও এই রকম একটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, দ্রষ্টব্য সংসদ অভিধান।

শুধু এই জাতীয় শব্দ নয়, আরো কিছু শব্দ, শব্দগুচ্ছ এবং প্রবচন আছে যার অর্থ ও উৎপত্তি নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ আছে।

সাহেব ও মেমসাহেব এই দু'টি বহু প্রচলিত এবং বহু ব্যবহৃত শব্দের কথা ধরা যাক।

সিরাজ জানিয়েছেন যে আরবি শব্দ 'সাহাব' (উচ্চারণ কতকটা ছাহাব) আক্ষরিক অর্থে সঙ্গী। পয়গম্বরের অর্থাৎ হজরত মহম্মদের সঙ্গীদের সাহাব বলে উল্লেখ করা হতো। ফলে কালক্রমে শব্দটি গৌরবার্থক হয়ে ওঠে। সাহাবের অর্থ দাঁড়ায় সম্মানিত জন, পরে বাংলায় এটা সাহেব হয়েছে। এবং সেই সূত্রে ইংরেজিতে সাহিব বা Sahib হয়েছে।

তবে মেমসাহেব শব্দটি আরও চমৎকার। মেম এসেছে ইংরেজি ম্যাডাম থেকে, ম্যাডাম থেকে ম্যাম, ম্যাম থেকে মেম। ম্যাম কথাটা পূর্ববঙ্গের কথাবার্তায় এখনো রয়ে গেছে। সে যা হোক ইংরেজি ম্যাডামের সঙ্গে আরবি সাহাব যুক্ত হয়ে লোকমুখে মেমসাহেব হলো। এ শব্দ কোনো পণ্ডিত ব্যাকরণবিদের রচনা নয়, নিতান্ত সাধারণ লোকের মুখে এই শব্দ তৈরি হয়েছে।

শব্দ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা সঠিক নয়। কবি করুণানিধান বলতেন, 'শব্দ হলো ব্রহ্ম', এ নিয়ে আমার মতো অপণ্ডিতের আলোচনা শোভন হচ্ছে না।

তবে এসেই যখন পড়েছি দু একটি শব্দগুচ্ছ বা বিশিষ্ট প্রবচনের সম্পর্কে কিছু বলি :—

[ক] জগাখিচুড়ি

জগাখিচুড়ি কথাটার অর্থ সকলেরই জানা, কিন্তু কথাটা এল কীভাবে।

কালীঘাট মন্দিরে এক পাগল ছিল, তার নাম জগা। সারাদিন ধরে ভিক্ষে করে চাল ডাল তরি তরকারি নুন মশলা যা কিছু সে জোগাড় করতে পারত সব একত্র করে সন্ধ্যাবেলা সেদ্ধ করত। রান্না করে মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে সেই খিচুড়ি দিয়ে মায়ের ভোগ দিত। তারপর রাস্তায় গিয়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের ডেকে তাদের সঙ্গে ভাগ করে সেই প্রসাদ

পরমানন্দে গ্রহণ করত। এ খিচুড়ির নাম হয় জগাখিচুড়ি। কথাটা কালীঘাট থেকে লোকমুখে ছড়ায়।

প্রসঙ্গত জগা সম্পর্কে একটা আশ্চর্য ঘটনা আছে, যেটা গৌরীমা বলেছিলেন। একদিন সকালে জগা সৈনিকের বেশ ধারণ করে পাড়ার ছেলেদের জড়ো করল। তারপর গলায় একটা টিন বেঁধে বাজাতে লাগল আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে গাইতে লাগল, 'যম জিনিতে যায়রে জগা, যম জিনিতে যায়।' সেই দিনই মন্দিরের সামনে সে দেহত্যাগ করে।

[খ] ধামাচাপা

ধামাচাপার অর্থটা বলেছিলেন বনফুল। কথাটা এসেছে বিহারের দেহাত থেকে। দেহাতি মেয়েদের একবার কলহ শুরু হলে, গ্রাম্য সমাজে যেমন হয় সহজে শেষ হতে চায় না। দিনের পর দিন চলে সেই ঝগড়া, গালিগালাজ, পরস্পরের উদ্দেশ্যে তিক্ত ও কটু

মন্তব্য। কিন্তু এর মধ্যে সংসার তো আর থেমে থাকে না। আহার নিদ্রা আছে, রান্না বান্না, ঘর ঝাঁট, চুল বাঁধা সবই করতে হয়। সুতরাং ঝগড়া মাঝে মাঝে মুলতুবি রাখতে হয়। সেই সময় দুই পক্ষ দু-টি ধামা মাটির উপরে চাপা দিয়ে যায়। অর্থাৎ কলহ আপাতত চাপা রইল। পরে ফিরে এসে ধামা তুলে আবার চেঁচামেচি শুরু হয়।

[গ] বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

বহু লোককে বহু সময় জিজ্ঞাসা করেছি, ঘোগ মানে কি। ঘোগ কি জাতের জন্তু ? নাকি জন্তু নয়, অন্য কিছু ? অভিধান সহ প্রবাদপ্রবচন গ্রন্থের পৃষ্ঠা ঘেঁটে দেখেছি, কোথাও তেমন কোন সদুত্তর পাইনি।

রহস্যের সমাধান হয়েছিল, অন্তত আমার কাছে, কয়েক বছর আগে। সুন্দরবনে গিয়েছিলাম। সেখানে খালের উপরে সিমেন্টের ব্রিজ বানানো যায় না, ভারি দালান তোলা যায় না। স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন, কী কারণ ? তিনি বললেন যে ওখানকার মাটির মধ্যে অসংখ্য ফুটো, খালের জলের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে ঘোগ মাটি গর্ত করে বহুদূর পর্যন্ত ঢুকে যায়। ফলে মাটির নিচে ঝাঁঝরি হয়ে থাকে তার ওপরে কোনো ভারি বনেদ বানালেই মাটি ধসে পড়ে, ডেবে যায়।

খোঁজ নিয়ে জানলাম ঘোগ হলো এক ধরনের খুব ছোট জলপোকা। সুন্দরবনের খালের ধারে জলে ও মাটির নিচে এদের গতিবিধি। বাঘের দেশ সুন্দরবনের এই ঘোগ থেকেই খুব সম্ভব এসেছে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা এই প্রবচন। অন্তত এখন আমার তাই ধারণা। জলে ঘোগ, জঙ্গলে বাঘ তাই বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

পুনশ্চঃ কথামালা খুব নীরস হয়ে গেল। এ জিনিস সরস করা কঠিন, তবু চেষ্টা করছি।

প্ল্যানচেটে নবাব আলীবর্দি খাঁকে পেয়েছিলাম, তাঁর আমলে নাকি বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটি কি ?' বৃদ্ধ নবাব বললেন, 'ব্যাপার ঠিকই, তবে গরুর খরচা বড় বেড়ে গিয়েছিল। বাঘ একটা গরু মেরে ফেললেই জলের ঘাটে আরেকটা গরু বেঁধে রাখতে হতো।

কলিংবেল

....সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

পায়ের শব্দ উপরের দিকে উঠে আসছে।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং

কলিংবেল বেজে উঠল।...

সেই কবে জ্ঞান হওয়া থেকে, বলা উচিত, বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পেরুনোর পর থেকেই, রহস্য উপন্যাস পড়ে আসছি। সেই থেকে আমার কলিংবেলের সঙ্গে পরিচয়। তখন কলিংবেল চোখেও দেখিনি, আমাদের বহু দূরের মফঃস্বল শহরে বিদ্যুৎই ছিল না কলিংবেল থাকবে কি করে ?

কলিংবেল নামক বস্তুটির সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ পনেরো বছর বয়েসে কলকাতায় এসে। তার আগে আরো দু-একবার কলকাতায় আসিনি তা নয়, কিন্তু আমরা উঠতাম শ্যামবাজারে, সেখানে কোনো বাড়িতে কলিংবেল তখন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মফঃস্বলের মতই লোকেরা বাড়ির রোয়াকে উঠে ডাকতো, 'শ্যামবাবু বাড়ি আছেন নাকি ?' সাড়া না পেলে আরো চেঁচিয়ে তারপর আরোতর চেঁচিয়ে শ্যামবাবুর অনুসন্ধান চলত যতক্ষণ পর্যন্ত না উত্তর আসে। আর তাছাড়া দরজা খোলা থাকলে, একটু জানাশোনা থাকলে যে কোনো দিগ্‌গজের বাড়িতে যে কেউ উঠোনে বা ভিতরে ঢুকে পড়ত, এটা

কোনো অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, কোনো জানান দেওয়ার আবশ্যক ছিল না। এমন কি গলা-খাঁকারি দিতেও হতো না।

কিন্তু ইতিমধ্যে মোহন সিরিজ, কিরীটি রায় রহস্য কাহিনীর পৃষ্ঠা অতিক্রম করে ক্রিং ক্রিং করে কলিংবেল এসে গেছে, বাড়িতে বাড়িতে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বাংলা রহস্য উপন্যাসেই নয় এই ফাঁকে বিলিতি রোমাঞ্চমালাতেও ক্রমাগত শুনেছি কলিংবেলের শব্দ, কখনো শব্দের মুহূর্তেই শব্দের ঠিক ওপাশে মারাত্মক সমস্ত রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে। রোমহর্ষক না হলেও আমার এখনকার প্রিয়তম গোয়েন্দা নায়ক ফেলুদার বাড়িতে একবার বিনা বিদ্যুতেই লোডশেডিং-এর সময় কলিংবেল বেজেছিল।

অবশ্য বিদ্যুৎহীন কলিংবেল যে নেই তা নয়, অনেক অফিসের টেবিলেই সেটা বাজে, সেটা বাজিয়ে বড় সাহেবরা চাপরাশিদের ডাকেন। একেক সময় মনে হয় যখন কলিংবেল ছিল না তখন সাহেবরা কি ভাবে চাপরাশিদের ডাকতেন, নাকি তখন চাপরাশিদের ডাকবার জন্যে চাপরাশি ছিল।

অফিসের কলিংবেল নয়, বাড়ির কলিংবেলের কথা বলি। বাড়ির দরজায় কলিংবেল দেখলেই আমার মফঃস্বলী মনে কি রকম একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর একটা সম্ভাব্য কারণ বোধ হয় এই, বছর পনেরো আগে একবার এক প্রচণ্ড বর্ষার দিনে সন্ধ্যাবেলা এক বাড়ির ভিজে দরজায় কলিংবেল টিপতে গিয়ে এমন সাংঘাতিক ইলেকট্রিক শক খেয়েছিলাম ভাবতে গেলে এখনো পায়ের তালু থেকে মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ঝিন্‌ঝিন্‌ করে ওঠে। এর পর থেকে কোনো বাড়ির দরজায় কলিংবেল দেখলেই আমি ভয় পাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে যে বাড়িতে বিশেষ প্রয়োজনে সাত রাজ্য পার হয়ে চারবার ট্রাম বাস বদলিয়ে তারপর এসে পৌঁছেছি, সেখানে ঢুকতে কেমন একটা ভয় হয়, সাহস হয় না বেল টিপতে, ইচ্ছে হয় ফিরে যাই।

কিন্তু উপায় নেই। এখন এমন একটি বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন যার সদর দরজা বন্ধ থাকে না এবং যে দরজায় একটি কলিংবেল লাগানো থাকে না। সদর দরজা হাট করে খুলে বাইরের ঘরে বসে যারা হৈ হৈ করে গল্প করত, তক্তপোষে বসে তাস খেলত সেই লোকেরা কোথায় গেল ?

সে যা হোক, একটা কলিংবেল তবু ভালো, অনেক বাড়ির দরজায় একাধিক কলিংবেল লাগানো থাকে। তখন এক সমস্যা, হেড্ না টেল্, কোন্‌টা আসল, উপরেরটা না নীচেরটা কোন্‌টা বাজবে ?

দুটোই বাজিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কোন্‌টা বাজে ? বাজে মানে ক্রিয়াপদ, বিশেষণ নয়, কোনটা থেকে শব্দ বেরোয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাপত্রও কি ছিদ্রহীন ? অনেক বাড়িতেই কলিংবেলের ঘণ্টা যন্ত্রটি থাকে বহিরাগতের শ্রুতি সীমার বাইরে, তখন বারবার বাজিয়ে অধীরভাবে কান পেতে থাকতে হয়, বেল বাজলো কিনা, সিঁড়িতে কিংবা বারান্দায় কারো পায়ের শব্দ পাওয়া যায় কিনা।

অনেক সময় আবার খুব গোলমালও হয়। একই সদর দরজায় দুটো বেল দুই পাশাপাশি ফ্ল্যাটের, কে বুঝবে ? দুটি বেল উপরে নিচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চার মিনিটে আটবার বাজানোর পর এক সঙ্গে দুই প্রান্তে দুটি দরজা খুলে গিয়ে চীৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে গেল, তখন বুঝিয়ে বলা কঠিন কেন এই অসৎ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছি।

অনেক কলিংবেলের নিচে ছোট ছোট অক্ষরে কি সব নির্দেশ লেখা থাকে। রোদে-বৃষ্টিতে একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, যখন অস্পষ্ট ছিল না তখনো ঘাড় উঁচু করে দৃষ্টিসীমার উর্ধ্বে ঐ ছোট ছোট বর্ণমালা থেকে কোনো অর্থ উদ্ধার করা খুব সহজ ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য এর আবার উল্টোদিক আছে, সেখানে কলিংবেলের নিচেই একটা ঘণ্টার ছবি আঁকা থাকে যাতে কারো অসুবিধা না হয় বুঝতে যে এই ঘণ্টাটি বাজাতে হবে।

তবে কোনো কোনো বাড়িতে এও দেখেছি যে, তীর কিংবা হাতচিহ্ন দিয়ে দূরে নির্দেশ দেওয়া আছে, পাশে ইংরেজি ও বাংলাতে লেখা, বেল ইন সাইড প্যাসেজ, ঘণ্টা পাশের প্যাসেজে। বলা বাহুল্য এরকম ক্ষেত্রে দরজায় ধাক্কা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, পাশের অন্ধকার প্যাসেজে বেলের অনুসন্ধান করতে না যাওয়াই ভালো। অন্তত একবার গিয়ে আমার এক আত্মীয় পা পিছলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, ভাগ্য ভালো দেড় ঘণ্টার মাথায় আরেকজন সেই বেল বাজাতে এসেছিলেন এবং তিনিই আমার সেই আত্মীয়কে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়ে অতি সাবধানে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেন।

সব দেখে শুনে তবুও আমাদের শিক্ষা হয় না। আমরা নিজেরাই বাড়িতে একটা কলিংবেল লাগিয়েছিলাম। ভালোই চলছিল, কিন্তু মাসখানেকের মাথায় একদিন রাত দেড়টা নাগাদ সেটা একা একাই অকারণে বেজে ওঠে এবং সারারাত ধরে বাজতে থাকে, শেষে সাড়ে চারটা নাগাদ এক বিরক্ত প্রতিবেশী ঘুম থেকে উঠে এসে বুদ্ধি করে মেন সুইচ বন্ধ করে দেন, আমরা রক্ষা পাই।

অমর প্রেম

তখন আমরা দক্ষিণ কলকাতায় পণ্ডিতিয়ায় থাকি। লেক অর্থাৎ রবীন্দ্র সরোবর বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। প্রায় প্রতিদিন সকালে এবং কখনো কখনো ছুটির দিনের সন্ধ্যায় সেখানে বেড়াতে যেতাম। জল, গাছপালা, সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশ, পাখির কলকাকলি—আমার খুব পছন্দসই ছিল জায়গাটা।

সে যা হোক, সে অন্য প্রসঙ্গ। আমাদের এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়—'অমর প্রেম'। এই সূত্রে রবীন্দ্র সরোবরের একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে।

ছুটির দিন, বোধহয় কোনো এক রবিবারের সন্ধ্যা। ক্রমশ অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে, পাখির ডাক থেমে এসেছে। শীতকাল, লেকে ভ্রমণকারীর সংখ্যাও কম। আমি জলের ধারে একটা খালি বেঞ্চিতে একাই বসেছিলাম। ভালোই লাগছিল।

প্রায় কোথায় তেমন কেউ নেই। তবে আমার থেকে একটু সামনে জলের ধারে ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর এক জোড়া যুবক যুবতী বসেছিল। নিশ্চয়ই প্রেমিক-প্রেমিকা। তাদের কিছু কিছু কথাবার্তা আমার কর্ণগোচর হচ্ছিল, খুব সম্ভব তারা আমাকে খেয়াল করেনি। কাছেই বেঞ্চির ওপরে একজন যে বসে আছে সেটা তারা ভাবেনি।

আমি তাদের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। রীতিমত রোমান্টিক কথোপকথন। যতদূর মনে পড়ছে, উদ্ধৃত করছি :—

যুবতী কণ্ঠ : তা হলে তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো ?

যুবক কণ্ঠ : (গদগদ স্বরে) আমার সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমাকে ভালোবাসি।

যুবতী কণ্ঠ : সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকে ভালোবাসো ?

যুবক কণ্ঠ : বলছি তো।

যুবতী কণ্ঠ : তা হলে তুমি আমার জন্যে, আমাদের ভালোবাসার জন্যে মরতে পারবে ?

যুবক কণ্ঠ : না তা পারব না। মরতে পারব না। আমার হলো গিয়ে অমর প্রেম।

★ ★ ★ ★

জানি এই কথোপকথন মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং এইরকম বোকা রসিকতা পড়ে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই হাই তোলা শুরু করেছেন।

সুতরাং আপাতত অন্তত একটা গ্রহণযোগ্য কাহিনী বলি।

শ্রীমান রমেশচন্দ্র একজন শিক্ষিত, সুস্থ, রূপবান, উপার্জনশীল যুবক। তাকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। সে আমার এইসব যাচ্ছেতাই লেখার একজন ভক্ত এবং সেইজন্যে আমি তাকে বুদ্ধিমান বলেও বিবেচনা করি।

শ্রীমান রমেশচন্দ্র রমাকুমারীর সঙ্গে আজ দীর্ঘ সাত বছর ধরে প্রেম করছে। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, দাঙ্গা বা বাংলা বন্ধ সে রমাকুমারীর বাড়িতে প্রত্যেক শনিবার আর রবিবার সন্ধ্যায় আসবেই। রমাকুমারীর বাড়ির লোকেরা আগে তাকে যত্ন করে বসাতো, বাইরের ঘরে পাখা খুলে দিতো, চা দিতো, কিন্তু এখন আর তা করে না, তারা কেমন হতাশ হয়ে গেছে, তাদের মনে রীতিমত সন্দেহ দেখা দিয়েছে—যে রমেশচন্দ্রের প্রেম খাঁটি নয়, ভুয়ো। সে নিশ্চয় কোনোদিন রমাকুমারীকে বিয়ে করবে না। আজ এতো দিন হয়ে গেল একবার বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত দিল না।

রমাকুমারীর বাবা আমার স্বল্প পরিচিত। তবে তিনি জানেন যে রমেশচন্দ্র আমার প্রিয় পাত্র। তিনি একদিন আমার বাড়িতে এসে আমাকে তাঁর সমস্যার কথা বললেন। আমারও খেয়াল হলো, সত্যিই তো ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে।

পরের সোমবার আমার আগের রবিবারের লেখার প্রশংসা করতে এসেছে রমেশচন্দ্র। বারবার বলছে, 'দাদা একেবারে বসিয়ে দিয়েছেন,' তার উচ্ছ্বাস শেষ হতে তাকে ধরলাম। রমাকুমারীর বাবার কথা উল্লেখ করে তাকে বললাম, 'ব্যাপারটা কি ? তুমি রমাকুমারীকে ভালোবাসো না ?'

রমেশচন্দ্র মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল খুঁটতে খুঁটতে লজ্জারুণ মুখে স্বীকার করল, 'ভালোবাসি।'

আমি আরো স্পষ্ট হলাম, সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি রমাকুমারীকে বিয়ে করতে চাও না ?' রমেশচন্দ্র লজ্জায় আরো রাঙা হয়ে স্বীকার করল, 'চাই'।

'তবে ?' আমি প্রশ্ন করলাম, 'বিয়ে করছ না কেন ? বাধা কোথায় ?'

রমেশচন্দ্র বলল, 'দাদা, আপনি তো জানেন গত সাত-আট বছর প্রত্যেক শনিবার রবিবার সন্ধ্যায় রমাকুমারীদের বাড়িতে যাই। ঘণ্টা দু' তিন কাটাই। রমাকুমারীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে শনিবার, রবিবার সন্ধ্যাগুলো কী করে কাটাবো কিছু ঠিক করতে না পেরে

রমাকুমারীকে বিয়ে করতে পারছি না।'

ধন্য রমেশচন্দ্র ! তার সমস্যা তবু হৃদয়ঙ্গম হলো। কিন্তু আমার অন্য এক প্রিয় পাত্র আছে, তার নাম মহেশচন্দ্র। সেও মহেশ্বরী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে গত সাত বছর ধরে ধারাবাহিক প্রেম করে যাচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রে বিয়ের দিন পর্যন্ত প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেদিন শুনলাম বিয়ে ভেঙে গেছে। মহেশচন্দ্রই নাকি বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। প্রণয়ের তরী পরিণয়ের ঘাটে পৌঁছানোর আগেই ভরাডুবি হয়েছে।

ব্যাপারটা ভালো লাগল না। কোথায় যেন একটা মাতালের গল্প লিখেছিলাম। মহেশচন্দ্র মাতালের গল্পের খুব ভক্ত, তার নিজেরও এসব দোষ বেশ আছে। গল্পটা পড়েই সে ছুটতে ছুটতে এল। এসে বলল, 'দাদা এবারে একেবারে বসিয়ে দিয়েছেন।'

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর আমি মহেশচন্দ্রকে বললাম, 'মহেশ্বরী এতো ভালো মেয়ে, তার সঙ্গে তোমার বিয়েটা ভেঙে গেল কি করে ?'

মহেশচন্দ্র মুখ কালো করে বলল, 'দাদা মহেশ্বরী ভালো মেয়ে নয়।' আমি বললাম, 'মানে ?'

মহেশচন্দ্র বলল, 'দাদা, মহেশ্বরী মিথ্যাবাদিনী ও দুশ্চরিত্রা।' আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, 'সে কি ?' মহেশচন্দ্র বলল, 'তা হলে শুনুন। গত মাসে একদিন রাতে মহেশ্বরীকে ফোন করলাম। মহেশ্বরীকে পেলাম না। পরের দিন দেখা হতে ওকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলল, ওর বন্ধু মৃণালিনীর বাড়িতে ও ঐ রাতে ছিল।

আমি বললাম, 'তা হলে তো ঠিকই আছে।' মহেশচন্দ্র বলল, 'না ঠিক নেই দাদা। মহেশ্বরী মিথ্যেকথা বলেছে। কারণ ঐ রাতে আমি ছিলাম ওর বন্ধু ঐ মৃণালিনীর সঙ্গে মৃণালিনী-র বাড়িতে।'

* * *

পুনশ্চঃ

এতগুলি ভঙ্গুর ভালোবাসার গল্পের অবশেষে একটি প্রকৃত খাঁটি প্রেমের সত্যি কাহিনী বলি।

কিংবদন্তী পুরুষ হেনরী ফোর্ডের পরিণয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে বৃদ্ধকে একজন প্রশ্ন করেছিল, 'স্যার আপনার এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সুখী পরিতৃপ্ত বিবাহিত জীবনের মূল রহস্যটা কি ?'

ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মৃদু হেসে বললেন, 'গাড়ির ব্যাপারে আমি যা বলি এক্ষেত্রেও তাই বলব। মডেল বদলাতে যেয়ো না। একই মডেলের উপর নির্ভর করো। সেটাই লাভজনক এবং শান্তিদায়ক, গাড়ি এবং নারীর ব্যাপারে।'

পাগল

অনেকদিন হাওড়া ব্রিজের মাথায় কেউ ওঠেননি। শেষ যিনি উঠেছিলেন তিনি একজন সঙ্গী নিয়ে উঠেছিলেন। দমকল নাকি পুলিশ, কারা তাঁদের শেষ পর্যন্ত নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল, ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু নেমে আসার পর সেই চূড়াশ্রয়ী দু-জন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা নাকি তাসখেলার জন্যই অত উঁচুতে উঠেছিলেন। তাঁদের কাছে এক প্যাকেট তাসও পাওয়া গিয়েছিল। অনুমান করি, উদ্ধারকারী দল যখন তাঁদের দিকে এগোচ্ছিল তাঁরা ভাবছিলেন তাঁদের তাস খেলার পার্টনাররা আসছে।

হাওড়া ব্রিজ চমৎকার সিঁড়ির মত। নিচের দিকে তাকালে যদি মাথা না ঘোরে তবে ইচ্ছে করলেই ধাপে ধাপে বেয়ে উঠে যাওয়া যায়, যে কেউ উঠে যেতে পারে। কিন্তু দু-জনে একত্রে পরামর্শ করে তাস খেলতে উঠে যাওয়া, ভাবা যায় না। শুধু হাওড়া ব্রিজের চূড়ায় উঠবার কারণেই নয়, জগৎ-সংসারে কোনো একটি বিষয়ে দু-জন পাগলের একমত হওয়ার এটি একটি অবিশ্বাস্য, বিরল উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয়।

ব্রিজ-আরোহীরা পুলিশের আওতা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পরবর্তী ধাপে নতুন কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই, হয়তো তাঁদের নিকট বন্ধুবান্ধব আত্মীয়রা কেউ কেউ জানেন। তবে এঁদের একজন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী বছর দু'য়েক আগে ডালহৌসী স্কোয়ারে এসে পৌঁছায়। তিনি বহুদূর থেকে এসেছিলেন। খুব সম্ভব বিহার বা

উত্তরপ্রদেশের কোনো দূর জেলা থেকে, একটি মাত্র রেলগাড়ির পয়েন্টসম্যানের ফ্ল্যাগ সম্বল করে তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। তাঁর একমাত্র কাজ ছিল সারাদিন অক্লান্তভাবে রেলগাড়ির স্টাইলে ফ্ল্যাগ দুলিয়ে মোটর গাড়ি পাস করিয়ে যাওয়া এবং মাঝে মাঝে হিন্দীতে সাঙ্কেতিক চীৎকার। এই মহৎ অবৈতনিক প্রতিযোগীটিকে ট্র্যাফিক পুলিশেরা সুনজরে দেখেননি, কয়েকদিন বাদে একদিন লাটসাহেবের গাড়ি পেট্রোলকার সমেত সাফল্যজনক ভাবে পাস করানোর অব্যবহিত পরেই তাঁকে পুলিশের একটি কালো গাড়ি এসে, তাঁর প্রবল প্রতিবাদ এবং বাধাদান সত্ত্বেও, জোর করে তুলে নিয়ে যায়। এর পরে ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে ফুটপাথ ঘেঁসে তাঁর পয়েন্টসম্যানের ফ্ল্যাগটি বেশ অনেকদিন একটা গাছের গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

এই দেহাতী যুবকটি অন্যান্য পাগলের থেকে আলাদা জাতের। সেটা তাঁর ফ্ল্যাগ ওড়ানোর জন্যে নয়, তিনি যে তাঁর নিজ এলাকার থেকে এতদূরে চলে এসেছিলেন এই কাজটির জন্য ; সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের।

কাণ্ডজ্ঞানে লিখেছিলাম সব উন্মাদ ব্যক্তিরই জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করা। কিন্তু এই কাজটি করার জন্যে কেউ তাঁর নিজের এলাকার বাইরে যেতে চান না। যদি কোনো চীনে দোকানদার পাগল হয়ে যায়, সে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটেই ডিউটি করবে, কখনো রাস্তা পেরিয়ে চৌরঙ্গী বা পার্ক স্ট্রীটে যাবে না, তার জন্যে আছে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাগল। ইংরেজি কেতায় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সে অঞ্চলে সেই বহন করে। অবশ্য তার একটি বড় অসুবিধা আছে সব সময়েই তাকে কোনো না কোনো মাতালের সঙ্গে লড়তে হয়, কিন্তু তাও সে কিছুতেই সার্কুলার রোডের সীমানা পেরোবে না। সেখানে কালীঘাটের ভটচাজ বামুনের ছেলে পৈতেয় আঙুল জড়িয়ে হাজরার মোড়ে ট্র্যাফিক আলো ও পুলিশের সঙ্গে পাল্লা দেবে।

যানবাহন নিয়ন্ত্রণের এই সাধু প্রচেষ্টাগুলিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। আপত্তি বড় একটা কাউকে করতে কদাচিৎ দেখা গেছে, শুধু দু-চারজন স্বার্থপর ট্র্যাফিক পুলিশ বাদে। তবে কোনো কোনো সময় এঁদের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ একটু বেশী মৌল ধরনের হয়ে পড়ে, তখন সামান্য অসুবিধা হয়।

একবার কলেজ স্ট্রীট-মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে একজনকে দেখেছিলাম বেছে বেছে শুধু কালো গাড়ি পাস করাতে, অন্য সব গাড়ির জন্য ট্র্যাফিক বন্ধ। একটু পরেই তাকে জবরদস্তি করে ট্র্যাফিক পুলিশেরা কর্মচ্যুত করে। আরেকবার এক বৃদ্ধা, তিনিই সম্ভবত একমাত্র মহিলা এ লাইনে, দুই হাত তুলে চারদিকের সব গাড়ি দাঁড় করিয়ে চারটে মন্থরগতি ষাঁড়কে একেবারে কোণাকুণি ভাবে রাস্তা পার করাচ্ছিলেন বেলা দশটার ভিড়ে ধর্মতলার মোড়ে।

অসুখ বিসুখ

অসুখ-বিসুখ, ডাক্তার-নার্স, হাসপাতাল-নার্সিং হোম এসব নিয়ে বহু সময়ে বহু কিছু লিখেছি, আবার অনেক কিছু লিখিওনি।

বৃষ্টির জলে আচমকা ভিজে আজ কয়েকদিন হলো কেমন একটু সর্দি জ্বরে পড়েছি। আবার ডাক্তার-ওষুধের হাতে পড়ার আগে আর দু-একটা মন্দমধুর আখ্যান লিখে রাখি।

সেই সূত্রে আমার একটা পুরনো ঘটনার কথা বলে নিই। আমার সামান্য জ্বর হয়েছে শুনে একজন প্রতিবেশী দেখতে এসেছিলেন। এসে অনেকক্ষণ বসলেন। অনেকরকম গল্পগুজব করলেন। এবং কথায় কথায় সেই পুরনো কথাটা বললেন, 'সিজন চেঞ্জের সময়। একটু সর্দি জ্বরটর হয়। সাবধানে থাকবেন।'

এই 'সিজন চেঞ্জ' কথাটা আমি কোনোদিন ভালো বুঝে উঠতে পারিনি। বৈশাখের শুরু বা আশ্বিনের শেষ, ঘোর বর্ষায় কিংবা অনন্ত বসন্তে সব সময়েই সিজন চেঞ্জ। কোন্ সময়ে ঋতু পরিবর্তন হয় না? শুভানুধ্যায়ীরা বছরের যে কোনো সময়ে যে কোনো দিনে যদি ঠাণ্ডা লাগে বা জ্বর হয় বলেন, 'এটা সিজন চেঞ্জের জন্যে হয়েছে।' আর কিছু না হলে বলেন, 'এটা সিজন চেঞ্জের সময় একটু সাবধানে থেকো।'

সাবধানের মার নেই।

রাস্তায় ঘাটে, অফিসে কাছারিতে, দেখি কত লোক ঠাণ্ডা লাগবে—এই ভয়ে চাদর মুড়ি

দিয়ে ঘুরছে। শ্রাবণে-ভাদ্রের গনগনে গরমের দুপুরে বৃষ্টি হচ্ছে, পৃথিবী একটু শীতল হয়েছে, পুব দিক থেকে জলে ভেজা বাতাস ভেসে আসছে সেই সময় কত লোক গলা ভেঙে যাবে কিংবা বুকে ঠাণ্ডা লাগবে ভয়ে গলা বন্ধ জহর কোট পরে সবগুলো বোতাম শক্ত করে আটকিয়ে সেই সঙ্গে গলায় একটা গরম মাফলার জড়িয়ে পরম নিরাপত্তাবোধের বিনিময়ে দরদর করে ঘামে।

পেটের গোলমালের ভয়ে কত লোক ভোজের বাড়িতে পরম উপাদেয় সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের সামনে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। কিছুতে সাহস পায় না, কোনো কিছু সামান্য একটু চেখে দেখতে, একটু খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে।

শুধু রুগি বা সাধারণজন নয়। অনেক ডাক্তারবাবুও এইরকম বাতিকগ্রস্ত হন। তাঁরা রোদে বৃষ্টিতে বেরোতে ভয় পান। খাবার নিয়ে সর্বদাই খুঁত খুঁত করেন। কোনো খাবারই তাঁদের স্বাস্থ্যসম্মত মনে হয় না।

সে যা হোক, এ সব বিষয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। বরং দু-একটা হাস্যকর ঘটনার কথা বলি।

সেই ডাক্তারবাবুর কথাটা বলি। ডাক্তারবাবুর বয়স বেশি হয়নি। নবীন যুবক, তাস খেলতে খুব ভালোবাসেন। সময় পেলেই ডাক্তারবন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খেলেন। তিনি সদ্য বিবাহ করেছেন, তাঁর নব বিবাহিতা পত্নী তাস খেলা পছন্দ করেন না, একেবারে দু'চোখের বিষ যাকে বলে তাই।

তাসের বন্ধুরা সবাই ডাক্তার। বিয়ের মাসখানেক পরে এক রবিবারের দুপুরে বন্ধুকে বাড়িতে ফোন করলেন, তাস খেলতে আসার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে জামাকাপড় পরে বন্ধুটি প্রস্তুত, তবে তিনি বুদ্ধি করে হাতে ডাক্তারি ব্যাগটা তুলে নিলেন। বৌ তাই দেখে বলল, 'একি ? এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছো ?' ডাক্তার স্বামী বললেন, 'খুব জরুরি কেস। তিনজন ডাক্তার এসে গেছে। আমাকেও এক্ষুনি যেতে হবে।' বলে ব্যাগ হাতে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

শুধু ডাক্তারবাবুরাই বেরিয়ে যান, তা নয়। রুগিদেরও তাঁরা বাইরে অপেক্ষা করতে বলেন।

এই রকম এক জ্বরগ্রস্ত রুগি ডাক্তারবাবুকে দেখাতে এসেছিল। ডাক্তারবাবু তাঁকে পরীক্ষা করে নিয়ে তারপর তাঁকে ওষুধ দেওয়ার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। এই ফাঁকে আরো দু-চারজন রুগি যারা বসে রয়েছে তাদের দেখে নেবেন বলে।

কিন্তু সব রুগি দেখা হয়ে যাওয়ার পরে চেম্বারের ভেতর থেকে ওষুধ হাতে আগের রুগিটির জন্যে সামনে রুগিদের বসার ঘরে এসে দেখেন সেই আগের রুগিটি নেই।

অবশ্য ওষুধটি বানাতে কম্পাউন্ডারবাবুর সামান্য একটু দেরি হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওষুধ না নিয়ে রুগি চলে যাবে ?

তাছাড়া জ্বরের রুগি ; শীতের দিন, বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ডাক্তারবাবু রুগির হাতে কোনো ছাতা বা বর্ষাতিও দেখেননি। ডাক্তারবাবু চিন্তায় পড়লেন, বৃষ্টিতে ভিজে লোকটা নিউমোনিয়া না বাধিয়ে ফেলে।

কী আর করা যাবে ? রুগির জন্য আরো অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে চেম্বার বন্ধ করে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে দেখেন যে সেই রুগিটি, যাকে তিনি এতক্ষণ ধরে খুঁজছিলেন, সে ঐ বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রীতিমত ঠকঠক করে কাঁপছে। ডাক্তার বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে ঠাণ্ডার মধ্যে এভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।' রুগিটি করুণ কণ্ঠে বলল, 'আপনিই তো আমাকে বাইরে দাঁড়াতে বললেন।'

অবশেষে অন্য এক ডাক্তারবাবুর দুঃখের গল্প বলি। গল্পটা অবশ্য দিশি নয়। একটা আদ্যিকালের বিলিতি জোকবুকে পেয়েছিলাম।

আমাদের দেশে ডাক্তার দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুর হাতে নগদ টাকা ভিজিট দিতে হয়। একেবারে যাকে বলে নগদ বিদায়। কিন্তু বিলেতে ডাক্তারেরা রুগিকে বিল পাঠান। রুগি সেই বিল অনুসারে ভিজিটের টাকা যথাসময়ে পাঠিয়ে দেয়।

একবার হয়েছে কি ডাক্তারসাহেব তার চেম্বারের হিসেবের খাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখলেন যে প্রায় সবাই তাঁর বিলের টাকা মিটিয়ে দিয়েছে, শুধু পাশের পাড়ার জন সাহেব, প্রায় এক বছর আগে তিনি যাঁর চিকিৎসা করেছিলেন সেই ভদ্রলোক এখনো তাঁর প্রাপ্য টাকা পাঠাননি।

বাধ্য হয়ে জন সাহেবকে চিঠি পাঠালেন ডাক্তার, সঙ্গে আগের বিলের একটা কপি। চিঠিতে লিখলেন, 'আর দু'দিন বাদে আমার এই বিলের ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হবে।'

দু'দিন বাদে জন সাহেবের উত্তর এল সেই বিলটি তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে ফেরৎ পাঠিয়েছেন এবং বিলটির গায়ে লাল কালি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছেন, 'শুভ জন্মদিন, প্রথম বর্ষ।'

* * *

পুনশ্চ : দু'টি স্মরণীয় কথোপকথন—

[এক] ডাক্তারবাবু : আপনি আর মদ খাবেন না, সিগারেটও একেবারেই নয়। মাংস, মশলা এ সমস্ত সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে।

রুগি : ডাক্তারবাবু এসব যদি আমি ছেড়ে দিই। মদ-মাংস-সিগারেট কিছুই না খাই আমি কি অনেকদিন বাঁচবো।

ডাক্তারবাবু : (অনেক চিন্তা করে) বাঁচা না বাঁচা ভগবানের হাতে। তবে এসব ছেড়ে দিলে আপনার মনে হবে অনেক বেশি দিন বেঁচে আছি।

[দুই] মানসিক রুগি : ডাক্তারবাবু, এখানে আসুন, এই দেয়ালে একটু কান পেতে রাখুন। কিছু শুনতে পাচ্ছেন কি না বলুন তো ?

ডাক্তারবাবু : (অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেয়ালে কান দিয়ে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করে তারপর) না। আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

মানসিক রুগি : আমিও তাই। আজ প্রায় দু বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি, আমিও কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

উচিত শিক্ষা

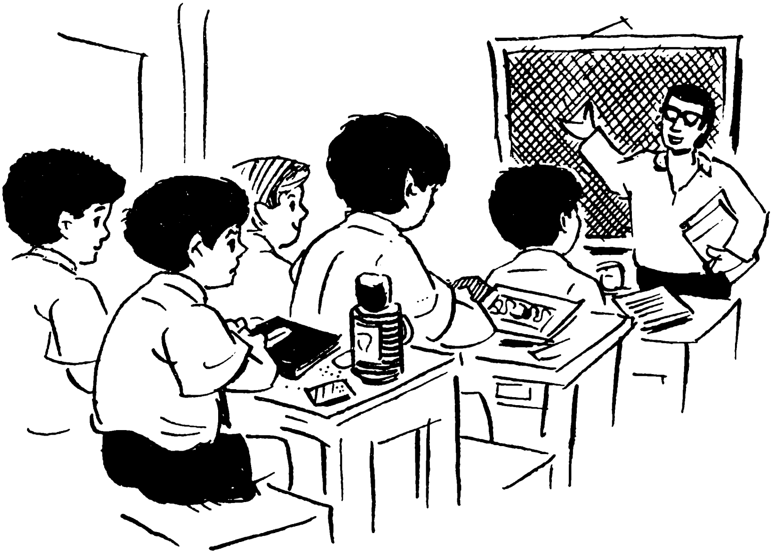

একটা সত্যি গল্প দিয়ে শুরু করি। শিক্ষা বিষয়ক এই নিবন্ধে প্রথমেই মিথ্যার অবতারণা করা সঙ্গত হবে না।

অনেকদিন আগের কথা। এক ব্যক্তি এক ইস্কুলে অনেক ধরাধরি করে একটা দপ্তরির কাজ পেয়েছিলেন। কিন্তু দুয়েক দিন কাজ করার পরে প্রকাশ পায় যে ঐ ব্যক্তি একেবারেই কোনো লেখাপড়া জানেন না। নিজের নাম সই পর্যন্তও করতে পারেন না। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে দপ্তরির কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন।

ঐ ব্যক্তি যখন বুঝলেন যে লেখাপড়া না জানার জন্যে তাঁর পক্ষে কোনো চাকরি হওয়াই সম্ভব নয় তিনি টুকটাক ব্যবসা আরম্ভ করলেন। এইবার তাঁর ভাগ্য খুলে গেল। ক্রমশ ব্যবসায় তিনি প্রভূত উন্নতি করলেন, প্রচুর বিত্ত, ধনসম্পদ, বাড়ি জমির মালিক হলেন তিনি।

কিন্তু তখনো তিনি সই করতে পারতেন না। পারতপক্ষে কাজ কারবারে লেখাপড়ার মধ্যে বিশেষ যেতেন না। আর যদি নিতান্তই কোথাও সইসাবুদের প্রয়োজন পড়তো, বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলে, নিরক্ষরেরা যা করে সেই রকম টিপসই দিতেন। এর জন্যে তাঁর কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ ছিল না।

একবার তাঁর এই টিপসই দেওয়া দেখে তাঁর ব্যারিস্টার তাঁকে বলেছিলেন, 'লেখাপড়া না

শিখেই আপনি এত উন্নতি করেছেন জীবনে, লেখাপড়া শিখলে আপনি না জানি কী হতেন, তাই ভাবি।'

ভদ্রলোক তিক্ত হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'লেখাপড়া শিখলে আর কি হতাম, ইস্কুলের দপ্তরি হতাম। বড়জোর এতদিনে প্রমোশন পেয়ে হেড দপ্তরি।'

* * *

গল্পটি সত্যি। তাই তেমন মধুর নয়। এবার শিক্ষা বিষয়ে দু'টি অম্লমধুর আখ্যান বলি।

প্রথম আখ্যানটি কিঞ্চিৎ গোলমেলে। গ্রামের এক কৃষক তাঁর ছেলেকে বহু কষ্টে কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। শহর থেকে প্রথম বর্ষের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরে গরমের ছুটিতে ছেলেটি যখন বাড়িতে এল তাঁর পিতৃদেব স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরীক্ষার ফল কী হলো?' ছেলে গর্বিতভাবে উত্তর দিল, 'আমি অ্যানুয়াল পরীক্ষায় ক্লাসের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছি।'

পিতৃদেব কিন্তু এই জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বললেন, 'কেন সেকেন্ড হলে? ফার্স্ট হতে পারলে না কেন?'

বছরের শেষে দ্বিতীয় বর্ষের টেস্ট পরীক্ষার পরে কলেজের ক্লাস শেষ হলো, ছেলেটি বাড়ি ফিরল। পিতৃদেব আবার জানতে চাইলেন, 'এবার রেজাল্ট কী রকম হলো?' ছেলেটি এবার সগৌরবে উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'এবারে আমি ফার্স্ট হয়েছি।'

পিতৃদেব কিন্তু এবারে ভ্রূ কুঞ্চন করলেন, বেশ অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চন করে ছেলেকে পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর খুব চিন্তিত গলায় বললেন, 'তোমাদের ওটা কেমন কলেজ, যে কলেজে তোমার মত ছেলে ফার্স্ট হয়?'

এ বিষয়ে পুরনো একটা ছোটদের গল্প মনে পড়ছে। বোধহয় মহামহিম শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা, ঠিক মনে করতে পারছি না হয়তো স্বর্গীয় কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাও হতে পারে। দেব সাহিত্য কুটিরের শিশুদের পুজোবার্ষিকীগুলির সুবর্ণযুগে কামাক্ষীপ্রসাদের আশ্চর্য গল্পগুলি আপনারা কেউ কি মনে রেখেছেন?

সে কথা থাক। সাহিত্যের স্রোত বড় জটিল (নাকি কুটিল) ধারায় বয়, কে কাকে মনে রাখে? যে আছে সে আছে, যে নেই সে নেই।

আসল গল্পটা সংক্ষিপ্ত করে বলি। একটি ছেলে দাবি করেছিল যে আগের বছরের তুলনায় এবার তার পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হয়েছে। তার দাবির অনুকূলে যে ঘটনাটি ছিল সেটা প্রণিধানযোগ্য।

ছাত্রটি আগের বছর অন্য একটি স্কুলে পড়ত। সেই স্কুলে তার ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ছিল আটত্রিশ। সেবার সে ক্লাসে আটত্রিশ জনের মধ্যে ছেলেটি আটত্রিশ নম্বর স্থান দখল করেছিল। এবার এই নতুন স্কুলে তার শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা আটাশ, এবার সে আটাশের মধ্যে আটাশ হয়েছে। তার স্থান এবার দশ ধাপ এগিয়ে গেছে, সুতরাং তার রেজাল্ট নিশ্চয় ভালো হয়েছে।

এবার দ্বিতীয় গল্পটিতে যাই। এই গল্পটি একটি শিশুকে নিয়ে। তার বয়স মাত্র ছয় বছর। সে একটি স্কুলে ক্লাস ওয়ানে সদ্য ভর্তি হয়েছে।

কয়েকদিন ক্লাস করার পর ছেলেটি বাসায় এসে বলল, যে সে ইস্কুলে ব্ল্যাকবোর্ডে কী লেখা হয়, সে পড়তে পারে না কারণ সে সেটা দেখতে পায় না।

এ কথা শুনে তার বাবা মা স্বভাবতই খুব চিন্তায় পড়লেন। তাঁরা তাকে বড় চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন চোখ দেখানোর জন্যে। কিন্তু তাতে কোনো ফল পাওয়া গেল না। নানারকমভাবে চোখ পরীক্ষা করার পরেও তার চোখের কী দোষ তা চোখের ডাক্তার ধরতে পারলেন না।

এ ক্ষেত্রে এর পরে যা করা হয় তাই হলো। শিশুটিকে আরেকজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তিনিও কিন্তু রোগ নিরূপণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন।

শেষে অনেক অনুসন্ধান করে অনেকরকম খোঁজখবর, গবেষণার পর ছেলেটি কেন ব্ল্যাকবোর্ড দেখতে পায় না তার কারণ জানা গেল। কারণটি আর কিছুই নয়, ছেলেটির সামনের বেঞ্চে যে ছেলেটি বসে সে ওর থেকে মাথায় তিন ইঞ্চি লম্বা, তার মাথায় ব্ল্যাকবোর্ডটা ঢেকে থাকে তাই পিছনের বেঞ্চিতে বসে এই ছেলেটি কিছুতেই দেখতে পায় না ব্ল্যাকবোর্ডে কী লেখা হচ্ছে।

এই শিশুটির বিষয়ে আরো একটি গল্প আছে। সে গল্পটিও একইরকম অবিশ্বাস্য। তবে কিঞ্চিৎ কৌতুককরও বটে। সেই জন্যেই লিখছি।

আজকাল ইস্কুলে পরিবেশ সচেতনতার দিকে বেশ নজর দেওয়া হচ্ছে। আশেপাশের পশুপাখি, গাছপালা, চিড়িয়াখানার জীবজন্তু, বোটানিক্যালের তরুলতা এসব বিষয়ে শিশুদের কৌতূহল বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। তাদের উৎসাহী করার জন্যে নানারকম পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, প্রলোভন দেখানো হচ্ছে।

একদিন আলোচ্য শিশুটি স্কুল থেকে ফিরল হাতে একটা প্রাইজ নিয়ে। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে নিজে থেকে বলল যে সে এই প্রাইজটা পেয়েছে। পরিবেশ দিদিমণি আজ চিড়িয়াখানার ওপরে প্রশ্ন করেছিল, সে তার জবাব দিয়ে এই পুরস্কার পেয়েছে।

কৌতূহলী জননী শিশুটিকে প্রশ্ন করলেন, 'দিদিমণি তোমার কাছে কি জানতে চেয়েছিল ?' ছেলেটি বলল, 'দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'উটপাখির ক'টা পা ?' মা প্রশ্ন করলেন, 'তখন তুমি কি বললে ?' ছেলেটি বলল, 'আমি বললাম তিনটে পা উটপাখির।' তার মা মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'তুমি তো ভুল বলেছো, তোমাকে প্রাইজ দিল কী করে ?' ছেলেটি হেসে বলল, 'বাকি সবাই আরো বেশি ভুল করেছিল। তারা বলেছিল, উটপাখির চারটে পা।'

পুনশ্চ : উচিত শিক্ষার এই নিবন্ধে আমার নিজেকে আনা কি উচিত হবে ? সে যা হোক, কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না জানি কিন্তু একথা সত্যি যে ছাত্রজীবনে আমি অর্থনীতি নিয়ে পড়েছিলাম। অনন্তকাল আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করার পরে ষষ্ঠ বর্ষের শেষ ক্লাসে শেষ বক্তৃতায় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আমাদের বলেছিলেন যে, 'শেষ দিনে একটা কথা বলে রাখি তোমাদের। এতদিন যা পড়িয়েছি তার অর্ধেক ভুল, অর্থহীন অর্থনীতি। তবে কোন্ অর্ধেক ভুল আর কোন্ অর্ধেক শুদ্ধ তা আমি বলতে পারব না, কারণ সে আমি নিজেও জানি না।'

ঈশ্বর সমীপে

একটি ছোট মেয়ে একটা গিনিপিগ পুষতো। সব সময় গিনিপিগটাকে নিয়ে খেলা করত, খুবই ভালোবাসতো সে এই ছোট জন্তুটাকে, সাদা-কালো লোমের, জুলজুলে ফিকে নীল চোখের গিনিপিগটাকে।

যেমন হয়ে থাকে, একদিন গিনিপিগটা দেহরক্ষা করল। ছোট মেয়েটিতো কেঁদেকেটে অস্থির। কিছুদিন আগে তার এক দাদু মারা গিয়েছিল। তার দাদুকে শ্মশানে নিয়ে পোড়ানো হয়েছিল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বায়না ধরল তার সাধের গিনিপিগটাকেও দাহ করে শেষ সৎকার করতে হবে। তাকে অনেক বোঝানো হলো যে যেহেতু গিনিপিগ মানুষ নয় তাই এটাকে না পুড়িয়ে মাটি খুঁড়ে কবর দিতে হবে। তাকে আরো বোঝানো হলো যে সব মানুষকেও পোড়ানো হয় না, অধিকাংশকেই কবর দেওয়া হয়।

অনেক ভাবনাচিন্তা করে, চোখের জল মুছে অবশেষে মেয়েটি রাজি হলো তার প্রিয় গিনিপিগকে কবর দিতে। তার বাবা একটা পুরনো জুতোর বাক্সে মৃত গিনিপিগটা ভরে বাড়ির পিছনের বাগানে একটা চৌকো মতন গর্ত করে তার মধ্যে 'সেই জুতোর বাক্সটা শুদ্ধ গিনিপিগটা কবর দিলেন।

কবর দেওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মেয়েটি তার বাবাকে প্রশ্ন করল, 'বাবা আমাদের এই বাক্সটা কি এবার স্বর্গে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাবে ?' মেয়েকে আশ্বস্ত করার জন্যে

তার বাবা বললেন, 'তা নিশ্চয়ই যাবে।' তখন মেয়েটি মোক্ষম কথা বলল, 'বাবা ভগবান যখন বাক্স খুলে দেখবেন ভেতরে কোনো জুতো নেই, মরা গিনিপিগ রয়েছে, নিশ্চয় আমাদের উপর খুব চটে যাবেন।'

সত্যিই এক্ষেত্রে জুতোর বাক্স খুলে জুতো না পেয়ে ভগবান ঐ বালিকাটি এবং তার পিতৃদেবের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা তা বলা আমার সাধ্য নয় কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে ঈশ্বর বিষয়ে অনেকের চিন্তাই ঐ মেয়েটির ভাবনার মতই সাদামাটা।

এক সরলপ্রাণা সাধ্বী রমণীর কথা বলি। তিনি একটি বিখ্যাত কালীমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। এর আগে তিনি এই মন্দিরে আর কখনো যাননি।

সব বড় মন্দিরে যেমন হয় প্রধান দেবতা বা দেবী ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর ছোট বড় মন্দির পাশেই থাকে। এই কালী মন্দিরেও তাই। পাশেই শিবলিঙ্গ, তার পাশে অন্নপূর্ণার মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ, লক্ষ্মীনারায়ণ—এমনকি মন্দিরে ঢোকার গেটের পাশে একটা ছোট চালায় একটা শীতলা মন্দিরে সদ্য অর্চিতা প্রতিমা অধিষ্ঠিতা রয়েছেন।

ভদ্রমহিলা শীতলা মন্দির পার হয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে সামনেই অন্নপূর্ণার মন্দির পেলেন, সেখানে গড় হয়ে প্রণাম করে তারপর আঁচল খুলে একটি রুপোর টাকা বার করে সামনের প্রণামীর থালায় রাখলেন। খাঁটি রুপোর বনেদি টাকা, পঞ্চাশ বছর আগের পঞ্চম জর্জীয় নিকষকুলীন রৌপ্যমুদ্রা। বহুদিন ধরে সুরক্ষিত। এই মুদ্রাটি তিনি এই মন্দিরের মা কালীর কাছে মানত করেছিলেন।

প্রণামীর থালায় টাকা রেখে অন্নপূর্ণার মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেই তাঁর খেয়াল হলো এটা কালী মন্দির নয়। সামনে উঠোনের ওপাশে খুব ভিড় ওখানেই রয়েছে মা কালীর মন্দির এবং এই রৌপ্যমুদ্রাটি এই অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নয় ঐ কালীমাতার প্রাপ্য।

এরপর ভদ্রমহিলা প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন অন্নপূর্ণার প্রণামীর থালা থেকে রৌপ্যমুদ্রাটি উদ্ধার করার কিন্তু বলা বাহুল্য তাঁর সে প্রয়াস সফল হয়নি। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে, ব্যথিত চিত্তে মানত পালন করা হলো না বলে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। সবাই তাঁকে বুঝিয়েছিল যে এতে কিছু আসে যায় না অন্নপূর্ণাকে দিলেই মা কালীকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি সে কথা মানেননি। বহু কষ্টে এবং রীতিমত অর্থব্যয়ে অনুরূপ একটি নিকষকুলীন রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করে পরেরবার তিনি সঠিক স্থানে দিয়ে এসেছিলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'এত কি দরকার ছিল?' তিনি বলেছিলেন 'মা কালী আমাকে গুরুতর বিপদের দিনে রক্ষা করেছিলেন। আমি মানত করেছিলাম, সে মানত রক্ষা না করলে মহাপাতকী হতাম।'

* * *

কঠিনতম স্বীকারোক্তি করেছিলেন আলেকজান্দার দুমা, 'থ্রি মাসকেটিয়ারস' খ্যাত সেই ঊনবিংশ শতকের বিপুল প্রতাপান্বিত ফরাসি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। বলা বাহুল্য, দুমা সাহেবের ঈশ্বর বিশ্বাস বা ভগবৎভক্তি খুব প্রবল ছিল না।

সে যা হোক, হয়তো কোনো রচনার প্রয়োজনেই আলেকজান্দার দুমা একদা এক প্রবীণ যাজককে অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর প্রার্থনাগুলো যেন তিনি দুমা সাহেবকে বলেন।

যাজক মহোদয় একটু বিস্মিত হয়ে উল্টে দুমা সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি এসব বিশ্বাস করেন?' বুদ্ধিমান আলেকজান্দার দুমা বলেছিলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন,

আমি এসব বিশ্বাস করি না। কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়বে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব।'

এ কথা মর্মান্তিক রকমে সত্যি। অধিকাংশ লোক ভূত আর ভগবানে বিপদে না পড়লে বিশ্বাস করে না।

বোধহয় শরৎচন্দ্রেরই একটি চরিত্র স্বীকার করেছিল যে সে ভূতে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভয় করে। সেই রকমই আমাদের চারপাশে অধিকাংশ চরিত্র ভগবানকে তখনই ডাকে যখন তার বিপদ বা অসুবিধে হয়, নিজের প্রয়োজন পড়ে।

একটি বিলিতি গল্প মনে পড়ছে।

সেই এক সাহেবদের খোকা বড় হয়েছে, মানে আট বছর বয়েস হয়েছে তার। পাঁচ বছর বয়েস থেকেই সে মা-বাবার থেকে আলাদা ঘরে শোয়। তবে রাতে অন্ধকারে যাতে ভয় না পায় সেই জন্যে তার ঘরে সারা রাত ধরে একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বালিয়ে রাখা হয়।

কিন্তু যেহেতু এখন তার আট বছর বয়েস হয়েছে সে বড় হয়েছে তাই অহেতুক ভয় পাওয়ার বয়েস তার চলে গেছে। তার মা একদিন রাতে শোয়ার সময় তাকে বললেন, 'খোকা, এখন তুমি বড় হয়ে গেছ। এখন আর তোমার খালি ঘরে অন্ধকারে ভয় পাওয়ার বয়েস নেই আজ রাত থেকে শোয়ার সময়ে তোমার ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হবে।'

এই পরিবারটি একটি গোঁড়া খৃস্টান পরিবার। প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে এরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ঘুমোতে যায়। এই খোকাটিও তাই করে।

আজ যখন তার মা বলল যে আজ রাত থেকে তার ঘরে আর আলো জ্বালিয়ে রাখা হবে না। দুয়েকবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করার পরে সে বলল, 'তাহলে মা শোয়ার আগের প্রার্থনাটা আরেকবার করি। এবার একটু মন দিয়ে করি।'

অর্থাৎ এতদিন সে দায়সারা প্রার্থনা করে এসেছে ঘরে আলো জ্বালা থাকে এই সাহসে কিন্তু আজ অন্ধকার ঘরে সাহস সঞ্চয় করার জন্যে তাকে একটু ভালো করে প্রার্থনা করতে হচ্ছে।

এই খোকাটির ঘটনা কোনো ব্যতিক্রমের ব্যাপার নয়। দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা, যেদিন চোখের জল নেমে আসে দুঃখের বরষায় সেই বিপদের, বঞ্চনার দিনেই সাধারণ মানুষ বারবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে, প্রার্থনা করে। সেদিন সে কালী বাড়িতে পুজো মানত করে, দরগায় সিন্নি দেয়। ভাঙা গির্জার পাতাঝরা ধুলো ভরা চাতালে অনেকদিন পরে সেই সন্ধেবেলায় সে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসে।

সায়াহ্নের অবসন্ন বাতাসে কম্পমান ক্ষীণ দীপশিখা অসহায় মানুষের নীরব আকুতি নিবেদন করে সেই অমোঘ নিয়তির কাছে, যার অন্য নাম ঈশ্বর।

শহর থেকে দূরে

গল্পটা খুব ভালো মনে নেই। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে নিয়ে গল্প।

একদিন হৃদয় অথবা অন্য কে একজন একটা ছোট এঁড়েবাছুর নিয়ে এসেছে মন্দিরে। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরে বাছুরটা দেখলেন, তারপর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মন্দিরে বাছুর দিয়ে কী হবে ?'

হৃদয় বলল, 'এটাকে কামারপুকুরে নিয়ে যাব। বড় হলে খুব ভালো ষাঁড় হবে, আমাদের জমি চাষ করবে।'

এই কথা শোনামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্চ্ছা গেলেন। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, পাখার হাওয়া করে একটু পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল।

তখন সবাই ঠাকুরের কাছে জানতে চাইল তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছা গেলেন কেন ? ঠাকুর বললেন, 'হৃদয়ের কথা শুনে আমার কেমন মনে হলো। আমি কিছু ভাবতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথা শুনে সবাই বিস্মিত বোধ করল, হৃদয় এমন কি বলেছিল যা শুনে ঠাকুর মূর্চ্ছা যেতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'কোথায় কলকাতা আর কোথায় কামারপুকুর। এইটুকু একটা ছোট বাছুর, এটা একদিন বড় হবে, বিরাট ষাঁড় হবে। কামারপুকুরের মাঠে ধান না তিল না

তিসি চাষ করবে। হায়রে সংসার, হায়রে মায়া। হঠাৎ এত কথা ভাবতে গিয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।'

* * *

আমরা পরমপুরুষ নই। নিতান্ত সাধারণ মানুষ। আমরা সহজে মূর্চ্ছা যাই না।

কিন্তু যদি পিছন ফিরে তাকাই ; যদি মন দিয়ে ভাবি কোথায় ছিলাম, কোথা থেকে কোথায় এলাম। কোন্ অজ মফস্বল থেকে এসে এই মহানগরের জনস্রোতে মিশে গেছি। এই যে লিখছি এর ক্ষীণতম সূত্রও আমার সেই ফেলে আসা মফঃস্বলী কৈশোরে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই সব নিয়ে যদি ভাবি একটি এঁড়ে বাছুরের ষাঁড় হওয়ার মতোই সেটা চমকপ্রদ। বেশি তলিয়ে চিন্তা করতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মূর্চ্ছা না যাই অন্তত ক্ষণিকের জন্য উদাস হতেই হবে।

আপাতত দর্শন মুলতুবি থাকুক। কলকাতায় আসার গল্প বলি।

অনেকদিন, অনেক অনেকদিন আগের কথা।

আমাদের বাড়ি থেকে টমটম গাড়িতে করে আসতে হতো পোড়াবাড়ি ঘাট। সেখান থেকে গয়নার নৌকোয় সিরাজগঞ্জ স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা।

কারো কি এখনো মনে আছে গয়নার নৌকোর কথা ? সিরাজগঞ্জ স্টেশন, পোড়াবাড়ি ঘাট ?

আমি এখনো ভুলিনি। সে সিরাজগঞ্জের লালচোখ রুইমাছ কিংবা পোড়াবাড়ির ভুবনবিখ্যাত চমচমের জন্যে ততটা নয়। (অবশ্য এখানে লিখে রাখা ভালো পোড়াবাড়ির চমচম যতই নামজাদা হোক সত্যিকারের জিনিস ছিল পোড়াবাড়ির রসগোল্লা। সেই সরস সুস্বাদু, মধুবর্ণ, গোলাকার মিষ্টান্ন তার সঙ্গে তুলনায় কলকাতার ফ্যাকাশে, রক্তাল্পতার রোগীর মত পাণ্ডুর রসগোল্লা কোথাও দাঁড়ায় না।)

এসব লোভনীয় আলোচনায় এখন আর লাভ নেই। সিরাজগঞ্জ থেকে কলকাতা আসার কথা বলি।

গয়নার নৌকোয় অন্যান্য বহু যাত্রীর সঙ্গে নদী পার হয়ে সিরাজগঞ্জ আসছিলাম। বিকেলের দিকে কলকাতার ট্রেন ছাড়ে সিরাজগঞ্জ থেকে।

সেদিন বেদম হাওয়া এলোমেলো ঘুরছিল নদীর ওপরে। দমকা হাওয়ার ভয়ে মাঝিরা পাল খাটাতে ভরসা পায়নি। নৌকো সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

নৌকো তীরে ভিড়াতেই আমরা যাত্রীরা হন্তদন্ত হয়ে মালপত্র নিয়ে ছুটলাম ট্রেনের উদ্দেশ্যে। নদীর ভাঙা ঘাট পর্যন্ত রেল লাইন আসে না। রেল স্টেশন বেশ দূরে। বালির চড়া পার হয়ে দু'দিকে মাঠের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা। সেই কাঁচা রাস্তা দিয়ে ছুটে যেতে যেতে দেখি পাশে এক ভদ্রলোক সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পরনে ধুতির ওপরে রেল কোম্পানির EBR লেখা পেতলের বোতাম লাগানো কালো কোট। একজন ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল, 'এই তো স্টেশন মাস্টার মশায় এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।' তাঁকে দেখে আমরা যেন হাতে চাঁদ পেলাম, সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম,

'মাস্টার মশায়, কলকাতার ট্রেন কি ছেড়ে গেছে ?'

এখন হয়েছে কি স্টেশন মাস্টার মশায় কয়েকদিন আগেই একটা দুধেল গরু কিনেছেন। এখন তার গরু অন্ত প্রাণ, সবসময় গরুর কথা ভাবছেন। রেলগাড়ি, স্টেশন কাজকর্ম সব মাথায় উঠেছে, সবসময় গরুর পিছে ঘুরে বেরোচ্ছেন, সেই সময়ে সামনের মাঠে তাঁর গরুটা চরছিল, তিনি সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন।

আমরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কলকাতার ট্রেন ছেড়ে গেছে কি না তিনি বোধহয় ভাবলেন আমরা তাঁকে তাঁর গরুর কথা জিজ্ঞাসা করছি। অন্যমনস্কভাবে তিনি আমাদের উত্তর দিলেন, 'ঐ তো কালো রঙের, সামনের মাঠে ঘাস খাচ্ছে।'

* * *

আমাদের সেই পাণ্ডববর্জিত, রেললাইন অবাঞ্ছিত গহন মফঃস্বলে রেলগাড়ি এবং কলকাতা দুইই ছিল অপার কৌতূহল আর বিস্ময়ের ব্যাপার।

অন্য এক আকাট বাঙালের গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা একটু ঘুরিয়ে ডোডো তাতাইয়ের বইতে লিখেছিলাম।

শেষ রাতের আধো অন্ধকার রেলগাড়ির কামরা। ছুটে চলেছে সুরমা মেল ঝড়ের গতিতে। যদিও সে গতি আজকের হিসেবে তেমন কিছু নয় তবু স্টেশনে ট্রেন পাঁচ দশ মিনিট দাঁড়াচ্ছে। তারপর উর্ধ্বশ্বাস ছুটছে। ছোট ছোট স্টেশনগুলো বিদ্যুৎবেগে পার হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে।

ক্রমশ নৈহাটি, ইছাপুর, ব্যারাকপুর—এসব পার হয়ে গেল ; শেয়ালদার দিকে এগোচ্ছে ট্রেন। সবাই নামার জন্য এবার বিছানা গুছোতে উঠবে এমন সময়ে খুব চিন্তান্বিত এক ব্যক্তি তার সুটকেস হাতে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর পাশের সহযাত্রী ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'দাদা এ গাড়িটা শেয়ালদায় দাঁড়াবে তো ?'

শেয়ালদাই শেষ স্টেশন। সেখানে যদি গাড়ি না দাঁড়ায় তাহলে কি ভয়াবহ ব্যাপার হবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনে পুরো কামরাশুদ্ধ লোক হোহো করে হেসে উঠেছিল।

দূর থেকে কলকাতায় আসার আর একটা গল্প বাকি আছে। সেও রেলগাড়ি ঘটিত। গল্পটি খুবই পুরনো এবং সবচেয়ে বড় কথা এর মধ্যে আমার মত কোনো বাঙাল জড়িত নেই।

কানপুর স্টেশনে একই সময়ে দু'দিক থেকে দু'টো রেলগাড়ি দু'টো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়। একটা আসে দিল্লি থেকে যাবে কলকাতায়, আরেকটা কলকাতা থেকে দিল্লিতে।

এক ভদ্রলোক শেষ মুহূর্তে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগে লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠলেন, যাবেন কলকাতা। উপরের বার্থ খালি ছিল, সেখানে উঠে হাতের ব্যাগ থেকে একটা রবারের বালিশ বার করে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উপরের বার্থ থেকে মাথা নিচু করে নিচের বার্থের লোককে প্রশ্ন করলেন, 'দাদা কোথায় যাচ্ছেন ?' এটা দিল্লি যাওয়ার ট্রেন, দাদা দিল্লিই যাচ্ছেন, দাদা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'দিল্লি।'

একথা শুনে উপরের বার্থের ভদ্রলোক খুব চমকিত হলেন এবং বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'দেখুন কী আশ্চর্য কাণ্ড। বিজ্ঞানের কী মহিমা, একই কামরা, উপরের বার্থে আমি যাচ্ছি কলকাতায়, নিচের বার্থে আপনি চলেছেন দিল্লি।'

শুভলাভ

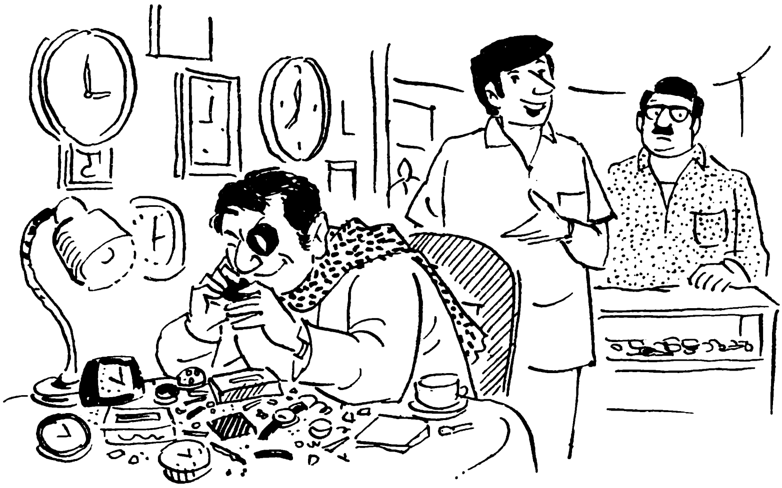

একেক ব্যবসার একেক রকম রীতি। কারো ধারে কারবার, কারো নগদে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান চেক ছাড়া লেনদেন করেন না।

কোনো ব্যবসার হালখাতা হয় পয়লা বৈশাখে। কারো অক্ষয় তৃতীয়ায় বা রথযাত্রার দিনে। উলটোরথের দিনও অনেকে নতুন খাতা খোলার পক্ষে খুব শুভ মনে করেন। এছাড়া উত্তর ভারতে এবং কলকাতার বড়বাজারেও কালীপুজোর দিন অবাঙালি ব্যবসায়ীরা ধুমধাম সহকারে হালখাতা খোলেন। পশ্চিম উপকূলে গণেশ চতুর্থীও বেশ জনপ্রিয়।

আবার বিলিতি কেতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পয়লা জানুয়ারি বা পয়লা এপ্রিলে বছর শুরু হয়। সেখানে অবশ্য পুজো-নৈবেদ্য, ধূপ-ধুনো, আম্রপল্লব বা মিষ্টির প্যাকেটের বন্দোবস্ত নেই। গণেশ ঠাকুর বসানো অথবা জগন্নাথের ছবিতে সিঁদুর-চন্দন লাগানোর অবকাশ নেই, দেয়ালে দেবনাগরী অক্ষরে রক্ত বর্ণে 'শুভলাভ' লিখে স্বস্তিকা চিহ্ন সেখানে আঁকা হয় না। কিন্তু তবু একটা অনুষ্ঠান থাকে। সাহেবি হোটেলে কিংবা খানদানি ক্লাবে ককটেল পার্টিতে কিংবা তেমন হলে বড়সাহেবের বাড়ির লনে খোলামেলা ডিনারে সেখানে নতুন বাণিজ্য বৎসরকে স্বাগত জানানো হয়।

তবে এসব যাই হোক ঐ দেবনাগরী হরফে 'শুভলাভ' শব্দটির মতো পরিষ্কার ব্যাপার আর কিছুই নয়। ঐ শব্দটির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের মূল উদ্দেশ্যটি নিহিত রয়েছে। শুধু

লাভ নয়, শুভলাভ, মঙ্গলজনক লাভ। লাভ করতে গিয়ে যেন ঝুটঝামেলা, ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, কাস্টমস, পুলিশ, মামলা, তথা ধর্মঘট-লকআউটে জড়িয়ে না পড়ি, ব্যবসায়ীর মনের এই ইচ্ছাটি ঐ শব্দের মধ্যে রয়েছে। ব্যবসা করা সোজা কথা নয়। প্রখর বুদ্ধি, কঠোর পরিশ্রম এবং অমিত আত্মবিশ্বাস সেই সঙ্গে ভাগ্যদেবীর সুনজর—এসব না হলে ব্যবসায় সফল হওয়া যায় না।

হ্যাঁ, সেই সঙ্গে সততাও প্রয়োজন। আমরা ছোটবেলায় দোকানে দোকানে দেখতাম কাচের ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে, 'সততাই আমাদের একমাত্র মূলধন'।

আজকাল আর এরকম কোনো ঘোষণাপত্র কোনো দোকানে বা শোরুমের দেয়ালে দেখতে পাই না।

'সততাই মূলধন'—আমলের একটা পুরনো গল্প এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।

এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী তাঁর শিশু পৌত্রকে নিয়ে নিজের দোকানে এসেছেন। তিনি নাতিকে পাশে নিয়ে গদিতে ক্যাশবাক্সের পিছনে বসেছেন, পাশেই দেয়ালে 'সততাই আমাদের মূলধন' বিজ্ঞপ্তিটি ঝুলছে।

নাতি পড়তে শিখেছে। সে ওটা দেখে পিতামহকে প্রশ্ন করল, 'দাদু, সততা কী ?' দাদু বললেন, 'সততা একটা খুব খাঁটি জিনিস। চট করে বোঝানো কঠিন। মনে করো আমি আর তুমি দু'জনে এই ব্যবসার অংশীদার। এখন একজন গ্রাহক এসে একটা জিনিস কিনে পাঁচ টাকা দাম দিতে গিয়ে ভুল করে দশ টাকার নোট তোমাকে দিয়ে চলে গেল। তুমিই ক্যাশবাক্সে বসেছো, তোমার অংশীদার আমি দোকানের অন্যদিকে রয়েছি। আমি দেখতে পাইনি যে গ্রাহক ভুল করে পাঁচ টাকা বেশি দিয়েছে। এখন তুমি যদি ঐ পাঁচ টাকা থেকে আড়াই টাকা আমাকে দাও, তাহলে সেটাই হলো তোমার সততা।'

নাতি বলল, 'কিন্তু, দাদু গ্রাহক....'

দাদু বললেন, 'গ্রাহকের কথা ভেবো না। ওটা বাদ দাও।'

এই ঘটনার অনেকদিন পরের কথা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এখন আর নিজে দোকানে যান না। তাঁর ছেলে যায়। কিন্তু তাঁর ছেলে তাঁর মতো তুখোড় নয়। ব্যবসাপত্র বেশ মন্দা যাচ্ছে।

বৃদ্ধ কী আর করবেন, খালি চিন্তাভাবনা করেন আর বাসায় বসে বসে পৌত্রের পড়াশুনো দেখেন, পৌত্রের কৌতূহল এখনো নানা বিষয়ে অপরিবর্তিত রয়েছে। একদিন কি একটা পড়তে পড়তে ঠাকুর্দাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা দাদু রসাতল কী ?'

দাদু শুকনো গলায় একটু খুক খুক করে কেশে জবাব দিলেন, 'রসাতল হলো সেই জায়গা যেখানে তোমার বাবা আমার ব্যবসাকে পাঠাচ্ছে।'

ব্যবসা বড় বিচিত্র জিনিস। কিসে কত লাভ এক দোকানদার ছাড়া কেউ জানে না। যখন দোকানদার বলছে, 'স্যার আপনাকে আমি কেনা দামে জিনিসটা দিচ্ছি', তখন সে ডাঁহা মিথ্যে কথা বলছে। আর একটা কথা জেনে রাখা উচিত ব্যবসায়ে মিথ্যে কথা বলা ব্যবসায়ীর কাছে মোটেই পাপ নয় সেটাই তার ধর্ম।

ব্যবসায় লাভের পরিমাণ সম্বন্ধে পুরনো বেনারসের এক আতরওয়ালার কথা বলি। সেটা ডবল পয়সার যুগ, ডবল পয়সার আকার ছিল টাকার মতো তবে টাকা ছিল রুপোর আর ডবল পয়সা ছিল তামার।

এক জোচ্চোর একটা ডবল পয়সায় রাং ঝালা করে রুপোর রং করে একদিন সন্ধ্যাবেলা

এক বুড়ো আতরওয়ালার কাছ থেকে সেটা দিয়ে এক টাকার আতর কিনলো, একে সন্ধ্যার আবছায়া তার ওপরে বুড়ো চোখে কম দেখে সে এই প্রতারণা ধরতে পারল না।

পরদিন সকালবেলা টাকাটা ভাঙাতে গিয়ে ধরা পড়ল যে সেটা রং করা ডবল পয়সা মাত্র।

তখন চৌষট্টি পয়সার টাকা, বুড়োর ক্ষতি হলো বাষট্টি পয়সা, সে হায় হায় করতে লাগল, কিছুক্ষণ আত্মবিলাপ করার পর সে অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইল। অবশেষে অনেক কিছু ভাবনা চিন্তার পর তার মন সুস্থির হলো, তখন সে ডবল পয়সাটাকে প্রকৃতমূল্যে মনে মনে গ্রহণ করে স্বগতোক্তি করল, 'তব্ ভি এক পয়সা লাভ'। এই বলে ডবল পয়সাটাকে কপালে ঠেকাল।

এই কাহিনীর মর্মার্থ হলো, বুড়ো আতরওলা এক পয়সা দামের আতর এক টাকায় বেচে, যদি এক টাকার বদলে একটি মাত্র ডবল পয়সা পায় তাহলেও এক পয়সা লাভ।

লাভের কথা হলো। ব্যবসায় লাভক্ষতি দুইই আছে। এবার ক্ষতির কথা বলি।

সেদিন এক যাত্রার প্রযোজক এক শুভানুধ্যায়ীকে বলেছিলেন, 'একেবারে বসে গেলাম ভাই। বিরানব্বুই সালে এক লাখ টাকা ক্ষতি, তিরানব্বুইতে দু'লাখ, চুরানব্বুইতে চার লাখ। এর চেয়ে খারাপ কিছু ভাবতে পারো ?'

শুভানুধ্যায়ী অম্লানবদনে বললেন, 'হ্যাঁ পারি। পঁচানব্বুইতে আট লাখ। অঙ্কের হিসেবে সোজা মিলে যাচ্ছে।'

লাভের অন্য গল্পটা বলি।

একটা ঘড়ির দোকানের বাইরে বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, 'এখানে লোভনীয় দামে ঘড়ি বিক্রয় করা হয়।'

এক পথচারী সে দোকানে ঢুকে ঘড়ির দাম কীরকম জানতে চাইল। দোকানদার বললেন, 'আমরা আমাদের ঘড়ি কোম্পানির কেনা দামের চেয়েও শতকরা পঁচিশ টাকা কমে বিক্রি করি।' পথচারী একথা শুনে বিস্মিত হয়ে বলল, 'তাহলে ঘড়ি বেচে তো আপনাদের ক্ষতি হয়।' দোকানদার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তা হয়।'

পথচারী আবার প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আপনাদের দোকান চলছে কী করে ?' অধিকতর গম্ভীর হয়ে দোকানদার বললেন, 'ক্ষতিটা ঘড়ি সারিয়ে পুষিয়ে নিই।'

* * *

পুনশ্চঃ বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের বড় বাহন। একটি আদর্শ বিজ্ঞাপনের নমুনা :

পাত্রী চাই

'তরুণ, সুদর্শন, অভিজাত বংশীয় ধনবান ব্যক্তির জন্যে শ্রীবলাইলাল চৌধুরীর নতুন উপন্যাস 'তপ্ত কামনা'র নায়িকার মত স্মার্ট ও ঝলমলে পাত্রী চাই।

বলা বাহুল্য এক সপ্তাহের মধ্যে 'তপ্ত কামনা' উপন্যাসের সংস্করণ নিঃশেষে বিক্রি হয়ে যাবে।

ব্যবসা বাণিজ্য

লাভের পরে ক্ষতি। ক্ষতির পর লাভ। হিসেব-নিকেশ করে তবে জানা যায় কত লাভ কত ক্ষতি। লাভ-ক্ষতি, ক্ষতি-লাভ, সাহেবরা যাকে বলেন 'আপস অ্যান্ড ডাউনস' (ups and downs), ব্যবসায়ী মাত্রেই ব্যাপারটা জানেন এবং বোঝেন। এই অনবরত উত্থান-পতনের কসরতের মধ্য দিয়ে যেতে হয় সব বণিককেই। সে হিসেব নিকেশ বড় কঠিন।

এ প্রসঙ্গে এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের একটি ছোট ঘটনা দিয়েই শুরু করি।

শনিবারের দুপুর। কয়েকবার খুঁজেও ক্যাশিয়ারকে না পেয়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক ম্যানেজারবাবুকে ডেকে পাঠালেন এবং অভিযোগ করলেন, 'ক্যাশিয়ারবাবু কোথায় গেলেন ? তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না কেন ?'

ম্যানেজারবাবু অনেক ইতস্তত করে কিছুটা ঘাড় চুলকিয়ে তারপর বললেন, 'স্যার ও একটু বেরিয়েছে।' স্যার একটু ঠাণ্ডা হলেন, প্রশ্ন করলেন, 'আপনাকে বলে গেছে ?'

ম্যানেজারবাবু স্বীকার করলেন যে হ্যাঁ তা বলেই গেছে। এবার মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গেছে ?' ম্যানেজারবাবু এবার আরো বেশি ঘাড় চুলকোলেন এবং সম্পূর্ণ চুপ করে রইলেন।

ম্যানেজারবাবুর ভাবভঙ্গি মালিকের ভালো ঠেকল না, তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, 'চুপ

করে আছেন কেন ? কোথায় গেছে বলে যায়নি ?' ম্যানেজারবাবু ঢোঁক গিলে বললেন, 'তা বলে গেছে। বলল যে রেসকোর্সে যাচ্ছি।'

মালিক চমকিয়ে উঠলেন, 'রেস কোর্সে ?' উত্তরে ম্যানেজারবাবু জানালেন, 'আজ শনিবার তো, রেস খেলতে গেছে।' হতভম্ব মালিক বললেন, 'ক্যাশিয়ারবাবু রেস খেলতে গেছেন।' প্রচুর ঢোঁক গিলে এবং প্রচুর ঘাড় চুলকিয়ে ম্যানেজারবাবু কবুল করলেন, 'স্যার এই ওর শেষ চেষ্টা তহবিল মেলানোর। আজ যদি পারে দেখাই যাক। না হলে তো তহবিল তছরুপের দায়ে ওকে পুলিশেই দিতে হবে।'

থানা পুলিশ করলে তহবিল তছরুপকারীর অবশ্যই জেল হবে কিন্তু তাতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ হবে না।

অন্য এক প্রতিষ্ঠানের কথা শুনেছিলাম। প্রতিষ্ঠানের কর্তার এক বন্ধু এসেছেন অফিসে, সেখানে ক্যাশিয়ারকে দেখে চমকিয়ে গেলেন, ভয়ানক চেহারা সে ভদ্রলোকের। ক্যাশিয়ারবাবু কি একটা কাজে কর্তার ঘরে এসেছিল, সে বেরিয়ে যেতে বন্ধুটি কর্তাকে বললেন, 'একি সাংঘাতিক চেহারা। দুটো কান সামনের দিকে ওলটানো, থ্যাবড়া নাক, রং কালো মিশমিশে, মাথায় নিগ্রোদের মত প্যাঁচানো শক্ত চুল। একে দেখেতো বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। এ রকম ভয়াবহ লোক রেখেছ কেন ?' কর্তা বললেন, 'বুঝতে পারছ, না, কেন রেখেছি ?' বন্ধু বললেন, 'না। সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না।'

কর্তা হেসে বললেন, 'এই লোক যদি কোনোদিন তহবিল ভেঙে পালায়, এ চেহারা নিয়ে কোথাও আত্মগোপন করতে পারবে না। পুলিশে খবর দিলেই বর্ণনা মিলিয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলবে।'

তহবিল তছরুপের পর আগুন ও বন্যা। গোয়ায় সমুদ্রতীরের একটি চারতারা হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে দুই সদ্য পরিচিত ব্যবসায়ী ঠাণ্ডা বিয়ার খাচ্ছেন। তাঁদের দু'জনের আজকেই আলাপ হয়েছে। দু'জনে গোয়াতে বেড়াতে এসে একই হোটেলে উঠেছেন।

ব্যবসায়ী দু'জনের বাক্যালাপের কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করছি :—

প্রথম ব্যবসায়ী : আপনি কী করেন ?

দ্বিতীয় ব্যবসায়ী : এখন ঠিক কিছু করি না। আমার একটা কারখানা ছিল, সেটা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনা বীমার ভরতুকি পেয়ে গোয়ায় বেড়াতে চলে এলাম। (এরপর একটু থেমে) আচ্ছা আপনি কী করেন ?

প্রথম ব্যবসায়ী : ঐ আপনার মতই আমারও একটা কারখানা ছিল।

দ্বিতীয় ব্যবসায়ী : সেটা আগুনে পুড়ে গেল ?

প্রথম ব্যবসায়ী : না, তা নয়। আমার কারখানাটা বন্যায় ভেসে গেছে। দুর্ঘটনা বীমার ভরতুকি পেয়ে গোয়ায় বেড়াতে এলাম।

দ্বিতীয় ব্যবসায়ী : (গলা নামিয়ে, চুপিচুপি স্বরে) আচ্ছা দাদা, বন্যা লাগান কী করে ?

* * *

অতঃপর দু'একটা ছোট খাটো ক্ষতির কথা বলি।

রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি'র রাজমহিষী নদীর তীরের প্রজাদের কুটিরে আগুন ধরিয়ে

শীতের ঠাণ্ডা নিবারণ করেছিলেন। পরবর্তী আখ্যান দু-টি সত্যিই কিন্তু সামান্য ক্ষতির। আগুন, বন্যা বা তহবিল তছরূপ নয়।

যেমন হয়, এক ভদ্রমহিলা এক বস্ত্রভাণ্ডারে গিয়ে অভিযোগ করছিলেন, 'আপনারা আমাকে সেদিন যে কাপড় দিয়েছিলেন সেটা দু-বার ধুতেই খেপে, কুঁচকিয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে।'

ভদ্রমহিলা যত বলেন দোকানদার তত আপত্তি জানায়। 'না দিদি তা হতে পারে না।'

অবশেষে ভদ্রমহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে বললেন, 'কেন হতে পারে না।'

দোকানদার মসৃণ হেসে বললেন, 'আপনি যে কাপড়ের কথা বলছেন আমাদের ওই কাপড় একবার কাচলেই ফেঁসে যায়, দু'বার কেচে কুঁচকিয়ে খেপে যাওয়ার সুযোগ কোথায়?'

পরের কাহিনীটি বিবেক ও সততার।

আয়কর দপ্তরে এক ভদ্রলোক একটি চিঠি দিয়েছিলেন, চিঠিটি এই রকম,

সবিনয় নিবেদন,

আজ কয়েক বছর হলো আমার আয়করের হিসেবে আমি কিছু কিছু জোচ্চুরি করেছি, আপনারা ধরতে পারেননি।

এ ব্যাপারে এখন আমার বিবেক দংশন করছে। রাতে ঘুম হচ্ছে না, এই সঙ্গে একটা একশো টাকার চেক পাঠালাম, এর পরেও যদি বিবেক দংশন না কমে, রাতে ঘুম না হয় তবে আবার টাকা পাঠাব।

ইতি
ভবদীয়

* * *

অতঃপর ঠিক ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত নয়। ক্ষয়ক্ষতির কাছাকাছি দু-টি প্রান্তিক গল্প।

প্রথম গল্পে এক ব্যবসায়ী হোটেলের ঘর থেকে বাক্স ব্যাগ নিয়ে বেরোচ্ছেন। ছাতা, টর্চ লাইট, জিনিসপত্র সব মিলিয়ে নিয়ে তারপর ঘরের বেয়ারাকে বললেন, 'কিছু ভুলে যাইনি তো?' বেয়ারা বলল, 'শুধু একটা জিনিস ছাড়া।'

'একটা জিনিস কি?' ভদ্রলোক সন্ত্রস্ত হলেন। বেয়ারা হাত পেতে বলল, 'স্যার আমার বকশিসটা ভুলে গেছেন।'

দ্বিতীয় গল্পটি এক ক্ষৌরশালার। প্রকাণ্ড টাকওয়ালা এক ব্যক্তি চুল কেটেছেন, তারপর যখন শুনলেন যে চুলকাটার মজুরি চার টাকা দিতে হবে, তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমার মাথায় তো চুলই নেই। এই সামনে কয়েকটা চুল কাটতে চার টাকা?'

ক্ষৌরকার স্মিত হেসে বললেন, 'দাদা আপনার চুল কাটার চার্জ মাত্র এক টাকা।' ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে চার টাকা কেন?' ক্ষৌরকার বললেন, 'বাকি তিন টাকা আপনার মাথায় চুল খুঁজে বার করার পরিশ্রমের জন্যে।'

জীব জগতের আজব কথা

ছোটবেলায় বোধহয় এই নামে কিংবা এরই কাছাকাছি নামে একটা আশ্চর্য বই পড়েছিলাম। সে ছিল প্রকৃত তথ্যে ও বর্ণনায় ভরপুর রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সে জাতীয় কোনো তথ্যময় রোমাঞ্চকর নিবন্ধ রচনা যে আমার উদ্দেশ্য নয় সেটা পাঠিকা ঠাকরুণ অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন। আমি হালকা লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব, তবে এবার আর মানুষ নয়, একটু জীবজন্তুর কথা বলি।

দিনের পর দিন ক্রমাগত স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা, ছাত্র-শিক্ষক এমনকি রোগী-ডাক্তার, উকিল ব্যবসায়ীর মত বিপজ্জনক বিষয়ে অনবরত রসিকতা করে করে কলম ভোঁতা হয়ে গেছে। রসিকতাও বেশ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, নিজেই টের পাই।

সুতরাং, আপাতত এ যাত্রা জীবজন্তুর উপর নির্ভর করতে যাচ্ছি। তবে পুরোপুরি জীবজন্তু নিয়ে রসিকতা করা সম্ভব হবে না, মানুষকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া যাচ্ছে না।

* * *

প্রথম গল্প এক অধ্যাপক এবং তাঁর গৃহপালিত গরু নিয়ে। এ আখ্যানে অবশ্য মানুষের ভূমিকাই গুরুতর।

এক দর্শনের অধ্যাপক তাঁর পোষা গরুকে নিয়ে একটা গবেষণা করছিলেন। গবেষণার

বিষয়বস্তুটি রীতিমত চমকপ্রদ এবং অভিনব।

অধ্যাপক মহোদয়ের ধারণা হয়েছিল যে জীবমাত্রকেই যা ইচ্ছে শেখা যায়। সে যা কিছু করে সবই অভ্যাসবশত, তাকে ঠিকমত শিক্ষা দিলেই সে তা করবে না। যেমন তাঁর নিজের পোষা গরু, সে যে ঘাস বিচালি খায়, সে নিতান্ত একটা অভ্যাস মাত্র। তাকে ধীরে ধীরে খাওয়া ছাড়ানো শিক্ষা দিতে লাগলেন।

প্রতিদিন এক আঁটি, দু আঁটি করে ঘাস বিচালি গরুর বরাদ্দ খাদ্য থেকে কমিয়ে আনতে লাগলেন অধ্যাপক। এইভাবে কমাতে কমাতে অবশেষে একদিন গরুটির খোরাক তিনি শূন্য পরিমাণে নামিয়ে আনতে সমর্থ হলেন।

দুঃখের বিষয় অনাহারে ক্লিষ্ট অবলা জীবটি সেই দিনই দেহত্যাগ করল। গরুর মৃত্যুতে অধ্যাপক একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর এতদিনের গবেষণা, এত পরিশ্রম বিফলে গেল। অধ্যাপক মহোদয় দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'অপূরণীয় ক্ষতি হলো আমার গবেষণার। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম করে বোকা গরুটাকে যখন না খেয়ে বাঁচা শেখালাম, ঠিক তখনই গরুটা মরে গেল।'

বলা বাহুল্য, এই আখ্যানের অধ্যাপক ভদ্রলোক তাঁর গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করতে অক্ষম হয়েছিলেন এবং নিরীহ জীব আত্মদান করেও তাঁকে কোনো শিক্ষা দিতে পারেনি।

জীবজন্তুর শিক্ষার অন্য একটা গল্প। তবে সে গল্প গরুর নয়, কুকুরের। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা উচিত যে গল্পটি বেশ পুরনো এবং কোনো কোনো পাঠক বা পাঠিকা অন্য কোথাও না হলেও আমার লেখাতেই হয়তো লেখাটি আগে পড়েছেন।

আমার প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক কুকুর পুষতেন এবং শুধু পোষা নয় প্রচণ্ড ভালোবাসতেন তাঁর কুকুরকে। তাঁর কুকুরের সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণাও তিনি পোষণ করতেন এবং সে জন্যে তাঁর অহঙ্কারের কমতি ছিল না।

আমরা দু'জনে সকালে ময়দানের একই প্রান্তে মর্নিং ওয়াক করতে যাই। সেখানে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নানা রকম কথা হয়। সেদিন হঠাৎ কুকুরের কথা উঠল এবং ভদ্রলোক দাবি করলেন যে তাঁর কুকুরের এখন এত বুদ্ধি হয়েছে যে সে মুখে মুখে বিয়োগ কষতে পারে। অবশ্য বড় বিয়োগ নয়, ছোট ছোট বিয়োগ।

সেদিন মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরার পথে তিনি জোর করেই আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সাত সকালে সিঁড়ি ভেঙে তাঁর চারতলার ফ্ল্যাটে উঠতে হলো। তিনি চা আর বিস্কুট খাওয়ালেন।

চা খাওয়ার সময় তাঁর কুকুরটিও এল। প্রভুর বিস্কুটে ভাগ বসালো। আমাকেও দু'বার সামনের ডান পায়ের থাবা দিয়ে আঘাত করে আমার কাছে বিস্কুটের ভাগ চাইল। কুকুরটি যে বুদ্ধিমান এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু তাই বলে অঙ্ক কষতে পারবে, একেবারে বিয়োগ ?

সামান্য পরেই সন্দেহের নিরসন হলো। কুকুরটির প্রভু তাকে বললেন, 'নিউটন বল তো দশ থেকে দশ বিয়োগ করলে কত হয় ? কুকুরটির নাম নিশ্চয় নিউটন, সে কিন্তু এই প্রশ্নে চুপ করে রইল। তার প্রভু আমাকে বললেন, 'দেখলেন ?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী দেখলাম ?' প্রভু বললেন, 'উত্তর শূন্য বলে চুপ করে আছে কিছু বলছে না।'

বলা বাহুল্য আমি আর কথা না বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে তরতর করে

চারতলা থেকে নেমে এসেছিলাম।

ওপরের এই গল্পটা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবেন না। তাঁদের কোনো দোষ নেই তবু তাঁদের জন্যেই জীবজন্তু বিষয়ক আর একটা অবিশ্বাসযোগ্য কাহিনী বলছি।

এ কাহিনী অনেকদিন আগেকার। আমাদের অল্প বয়সের পাড়াগাঁয়ের গল্প।

এ গল্প খাঁটি সরষের তেলের যুগের। ভেজাল রেপসিডের যুগে এ গল্প বিশ্বাস করা কঠিন।

আদ্যিকালের এক কলুর বলদ। সকাল থেকে সে কলুর ঘানি ঘোরাচ্ছে তো ঘোরাচ্ছেই। তার দু চোখে ঠুলি বাঁধা, ডাইনে-বাঁয়ে কিছুই সে দেখতে পারছে না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে কলু মশায় মাঝে মধ্যে চেঁচাচ্ছেন, 'এই মোংলা, এই রবি, এই ভোমলা, এই সাধু জোরে ঘোর, জোরে পাক দে।' সে চিৎকার শুনে বলদটা মাঝে মাঝে তার চলার গতি বাড়াচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তিনি পথের ধারে কলু মশায়ের বাড়ির সামনে একটা ঝাঁকড়া আম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে করতে বলদ-মানুষের এই নাটক দেখছিলেন। কিছুক্ষণ দেখার পরে সেই ভদ্রলোকের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিল, তিনি কলু মশায়কে বললেন, 'আচ্ছা আপনার বলদকে আপনি এই যে চার পাঁচটা নামে ডাকছেন, এর কি সত্যিই এতগুলো নাম?'

হাতের থেলো হুঁকো টানতে টানতে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কলু মশায় বললেন, 'একটা বলদের ক'টা নাম রাখব? ওর একটাই নাম। ওর নাম মোংলা।'

পথচারী ভদ্রলোক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে ওকে এতগুলো নামে ডাকছেন কেন?' এই জিজ্ঞাসা শুনে কলু মশায় পথচারীর কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'এ দিকে একটু গাছের আড়ালে আসুন, আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। কিন্তু মোংলা জানতে পারলে সর্বনাশ হবে।'

হতবাক পথচারীকে একটা বড় তেঁতুল গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়ে কলু মশায় বললেন, 'দেখুন ওর নাম মোংলা। কিন্তু ওর চোখে তো ঠুলি বাঁধা। ওতো আশেপাশে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাই আমি যখন এই মোংলা, এই রবি, এই সাধু এই সব বলছি, ও ভাবছে ও একাই ঘানি টানছে না ওর সঙ্গে আরো অনেক বলদ রয়েছে এতে ও মনে ফুর্তি পায়, গায়ে জোর পায়। আরো শক্তি দিয়ে ঘানি টানে।'

* * *

পুনশ্চঃ আমার সেই অখাদ্য গল্পটা মনে আছে তো? ক্যাঙারু মা বাস থেকে নেমে ক্যাঙারু বাবাকে বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে। খোকা পকেটে নেই। আমাদের খোকা এই মাত্র পকেটমারি হয়ে গেল।'

তামাক

গল্পটা অনেকদিনের পুরনো। পড়েছিলাম সেই 'অচলপত্র' কাগজে। সেও অনন্তকাল আগে, অন্তত তিরিশ বছর তো হবেই।

এ কালের মহাভারতের নবীন পাঠক, অচলপত্রের নামটা কি খুব অচেনা, খুব অপরিচিত মনে হচ্ছে ? কখনো দেখেননি অচলপত্র পত্রিকা ? মনে পড়ে দীপ্তেন সান্যাল ?

আমাদের নব যৌবনের দিনে অচলপত্র ছিল আমাদের রসিকতা শিক্ষার পাঠশালা আর তাঁর পণ্ডিতমশাই ছিলেন দীপ্তেন সান্যাল।

অচলপত্রের সাহিত্য ব্যাপারটা খুব জরুরি ছিল না, উচ্চমানের ছিল এমনও বলা যাবে না কিন্তু সম্পাদক দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যালের রসবোধ ছিল তীক্ষ্ণ ও প্রখর, অনায়াস ও সহজাত হালকা চাল ছিল তাঁর কলমে এবং তাঁর কোনো কোনো রসিকতা ছিল অনন্য সাধারণ ও স্মরণীয়।

হাতের কাছে পুরনো অচলপত্র পত্রিকার একটা সংখ্যাও নেই, কাছাকাছি কারো কাছে আছে বলেও জানি না। তাহলে অচলপত্র স্মৃতিচারণ অন্তত একবার করা যেত।

আপাতত সে ইচ্ছা মুলতুবি থাক, তামাকের গল্প চাই। একবারে হবে না, দু বারে লিখব।

সিগারেট দিয়ে শুরু করি। অচলপত্রের গল্পটা সিগারেট নিয়ে।

খগেনবাবু নামে এক ভদ্রলোক ময়দানে খেলা দেখতে গেছেন। খুব উত্তেজনাপূর্ণ খেলা, ফুটবল লিগ মরসুমের একেবারে শেষ দিকের খেলা দুই মহারথীর মধ্যে। গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছেন খগেনবাবু।

তখনো ইডেন গার্ডেনের স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা চালু হয়নি। সল্ট লেক স্টেডিয়ামের কথাই আসে না, প্রকৃত অর্থেই সে তখন অগাধ জলে।

উত্তেজনা যখন তুঙ্গে তখন খগেনবাবুর ইচ্ছে হলো একটা সিগারেট ধরাতে। খেলা এখন সেকেন্ড হাফের আধাআধি সময়ে এসে গেছে। এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে মাঠে ঢুকেছিলেন খগেনবাবু। প্রথমার্ধে এবং তারপরে হাফ টাইমের সময় প্রায় সব কয়টি সিগারেট তিনি খেয়ে ফেলেছেন। শেষবার যখন প্যাকেট পকেটে রাখেন তখন মাত্র একটা সিগারেট ছিল তাঁর প্যাকেটে। সেটা সযত্নে রক্ষা করেছেন এতক্ষণ, কিন্তু এবার আর পারলেন না।

গোলের মুখে বল প্রায় দেড় মিনিট ধরে ঘোরাঘুরি করছে। একটি গোলের ওপরেই খেলার চূড়ান্ত জয় পরাজয় নির্ভর করছে। খগেনবাবুর পাশের ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। সেই সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ তাঁর নাকে ঢুকে চুলবুল করছে। শেষ সিগারেটটাকে আর রেখে লাভ নেই।

পকেটে হাত দিলেন খগেনবাবু। স্পষ্ট মনে আছে ডান দিকের প্যান্টের পকেটে প্যাকেটটা রেখেছিলেন কিন্তু প্যাকেটটা সেখানে নেই। বাঁদিকের প্যান্টের পকেটে, তারপরে শার্টের ওপর পকেটে—সব জায়গায় তন্নতন্ন করে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজলেন খগেনবাবু।

না, কোথাও নেই। সিটের পাশে, এমনকি গ্যালারির নিচে পর্যন্ত একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন। সিগারেটের প্যাকেটটার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও, একেবারে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল আশ্চর্য।

পাশের ভদ্রলোক এখনো সিগারেট টেনে চলেছেন। তাঁর সিগারেটের ধোঁয়ায় মন উশখুস করতে লাগল খগেনবাবুর। অবশেষে খগেনবাবু সিগারেটের নেশার টান সামলাতে না পেরে একটা ছোট চাতুরির আশ্রয় নিলেন। পাশের ধূমপানরত সহদর্শককে বললেন, 'দাদা, আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন ?'

ভদ্রলোক খেলা দেখতে দেখতে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে খগেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। খগেনবাবু ভদ্রলোককে দেখিয়ে দেখিয়ে পকেটে সিগারেটের প্যাকেট খোঁজার একটা অভিনয় করলেন, তারপর মুখে একটা অস্ফুটপ্রায় 'ধুৎ' বলে দেশলাইয়ের বাক্সটা ফেরত দিয়ে দিলেন এই আশায় যে, ভদ্রলোক যখন দেখবেন যে তাঁর কাছে কোনো সিগারেট নেই, দেশলাই নিয়েও সিগারেট ধরাতে পারলেন না, তখন হয়তো দয়া করে একটা সিগারেট অফার করবেন।

দেশলাই বাক্সটা ফেরত দেয়ার পর খগেনবাবু যা আশা করেছিলেন প্রায় তাই হলো। পাশের ভদ্রলোক দেশলাই ফেরত পেয়ে এবং খগেনবাবুকে সিগারেট না ধরাতে দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন করলেন, 'কী হলো সিগারেট ধরালেন না ?'

খগেনবাবু করুণ মুখে বলেন, 'না। পকেটে একটা প্যাকেটে একটা মাত্র সিগারেট ছিল, কখন যে পড়ে গেছে প্যাকেটটা। আর তো সিগারেট নেই।'

ভদ্রলোক খগেনবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'কাঁচি সিগারেট ? কাঁচির প্যাকেটে একটাই সিগারেট ছিল আপনার ?' খগেনবাবু উৎসাহী হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক তাই। পেয়েছেন নাকি প্যাকেটটা ?' ভদ্রলোক লজ্জিত কণ্ঠে স্বীকার করলেন, 'পেয়েছিলাম তো, কিন্তু আমার কাছেও যে কোনো সিগারেট ছিল না, আপনার সিগারেটটাই এতক্ষণ খেলাম।' বলে শেষ একটা সুখটান দিয়ে তিনি সিগারেটের দগ্ধাবশেষটুকু গ্যালারির নিচে নিক্ষেপ করলেন।

* * *

তামাকের আলোচনার বদলে সিগারেটের গল্পটা একটু বড় হয়ে গেল।

তামাকের নানা রকমফের। সরাসরি মুখে দিয়ে খাওয়ার খৈনি, সুরতি। গন্ধ মশলা মিশিয়ে জর্দা, দোকতা, গুণ্ডি। ওড়িয়া পানের দোকানে গুণ্ডি মোহিনীর খুব কদর, যেমন বিহারীদের কাছে খৈনির। বাঙালির দুটোই বেশ চলে।

ধূমপান করার জন্যে আছে বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, চুট্টি। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর অপু বার্ডশাই খেয়েছিল, সেও এক জাতের সিগারেট।

আর তামাক খাওয়া বলতে যা বোঝায় সেই হুঁকো, গড়গড়া, অম্বুরী, বাদশাহী, রংপুরী, তামাক ; জরির নল, রুপোর খোল আজকের দ্রুতগতি জীবনে সে প্রায় সম্পূর্ণই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

হুঁকো সম্পর্কে শেষ গল্পটা লিখে রাখি। পরে লোকে গল্পটা বুঝতেও পারবে না।

একটা হুঁকোর চারটে প্রধান অংশ। প্রথম অংশ কলকে, যার মধ্যে তামাক থাকে। তারপর নলচে যার মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া নিচে নেমে আসে জলের পাত্রে, এই পাত্রই হলো খোল। নারকেলের মালা দিয়ে ভালো খোল হয়, তবে সোনার, রুপোর, ব্রোঞ্জের পাত্রও হয়। চতুর্থ অংশটি আবশ্যিক নয়। সেটা হলো নল। থেলো হুঁকো মানে নারকেলের মালার হুঁকোয় জল লাগে না। দামি হুঁকোয় জরির কাজ করা অনেক রকম শৌখীন নল লাগানো থাকে।

ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য হুঁকোর এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটুকু লিখে রাখলাম। এবার গল্পটা বলি।

এক ভদ্রলোক দাবি করেছিলেন যে, তাঁদের বাড়িতে একটা হুঁকো আছে যেটা নবাব আলীবর্দি খাঁ সাহেবের আমলের। এত পুরনো শুনে অনেকে সেই হুঁকোটা দেখতে চাইত। তখন ভদ্রলোক যে হুঁকোটা বার করে দেখাতেন, সেটাকে দেখে কিন্তু তত পুরনো মনে হতো না। সবই কেমন, খুব নতুন নতুন না হলেও মোটেই পুরনো নয়।

ভদ্রলোক এর যা ব্যাখ্যা দিতেন সেটা চমৎকার। যদিও হুঁকোটা সেই প্রাচীন দিনের, এর মধ্যে পুরনো অংশ এখন আর কিছুই নেই। কখনো কলকে, কখনো নল, কখনো খোল, কখনো নলচে বদলাতে বদলাতে সেই হুঁকোটাই সম্পূর্ণ চেহারাটা পালটিয়ে ফেলেছে। বলা বাহুল্য, 'খোল-নলচে সমেত বদলিয়ে যাওয়া' প্রবাদটির উৎস এই গল্প।

আবার তামাক

অনেক ধূমপায়ী আছেন যাঁদের বলা হয় চেন-স্মোকার (Chain Smoker), যাঁরা ধোঁয়ার শেকল তৈরি করেন, মানে ক্রমাগত, একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যান ধোঁয়ার শেকল অবিচ্ছিন্ন রেখে। এঁদের অনেকের দেশলাই পর্যন্ত থাকে না, একটা সিগারেটের আগুন থেকে অন্য সিগারেট, তার থেকে পরেরটা এইভাবে পরপর ধরিয়ে যান।

সেই সূত্র ধরে এই তামাক নিবন্ধগুলো আমি ঐ চেন স্মোকিংয়ের মতো টেনে নিয়ে যাব সেরকম আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই। আমি নিজে বহুকাল ধূমপান করি না এবং এ দেশের বিধিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ঘোষিত নির্দেশ—'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'—মান্য করে ধূমপান বা তামাক বিষয়ে আলোচনা এবারেই শেষ করব।

পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কোনো ধূমপায়ী নেই যে কখনো প্রতিজ্ঞা করেনি যে সে আর ধূমপান করবে না এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা এক সন্ধ্যার জন্যে হলেও চেষ্টা করে ধূমপান করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেনি।

অবশ্য কয়েক ঘণ্টা বা বড়জোর কয়েকদিন বাদে সেই প্রতিজ্ঞা সে ভঙ্গ করেছে।

বোধহয় মার্ক টোয়েন সাহেবই বলেছিলেন যে 'ধূমপান ছেড়ে দেয়া খুব সোজা, আমি নিজে বহুবার ছেড়েছি।' বঙ্কিম বাক্য বিলাসী মহামতি মার্ক টোয়েনের উক্তিটি আপাতশ্রবণে যতটা সরল মনে হচ্ছে তা কিন্তু নয়।

'আমি ধূমপান করা বহুবার ছেড়েছি', এ কথার আসল অর্থ হলো 'ধূমপান ছেড়েছি এবং আবার ধরেছি'। এবং এই উক্তির বিশেষ তাৎপর্য হলো ধূমপান কখনোই একেবারে ছাড়তে পারিনি, ছেড়েছি বটে, ছাড়বার চেষ্টা করেছি বটে তবে আবার ধরেছি, ধরতে হয়েছে।

মার্ক টোয়েন ছিলেন মার্কিনী সাহিত্যিক। গত শতকের ইংরেজ লেখকেরাও তামাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কিপলিং বলেছিলেন চমৎকার কথা, 'একজন রমণী শুধুই রমণী, কিন্তু একটা ভালো চুরুট হলো ধোঁয়া।'

চার্লস ল্যাম্ব লিখেছিলেন 'তামাকু বিদায়' (**A Farewell to Tobacco**), যাতে ছিল সেই দুই বিখ্যাত পংক্তি,

'তামাক,
আমি সব কিছু করতে পারি
তোমার জন্যে,
এক মরে যাওয়া ছাড়া।'

তামাক নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান, কাব্য সাহিত্যের কথা অনেক হলো অতঃপর ধোঁয়ার মতো বায়বীয় বিষয়ে একটু তারল্যের দিকে যাই।

অনেক কাল আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে, কোথায় যেন অন্য কি এক সূত্রে সেটা লিখেও ফেলেছি।

সে যা হোক, গল্পটা না হয় আরেকবার বলি। পুরনো কার্জন পার্কে (এখনকার সুরেন্দ্রনাথ পার্ক) একদিন অফিসের শেষে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। অফিস ছুটি হয়েছে পাঁচটায়, তখনো অফিস টাইম দশটা-পাঁচটা ছিল সাড়ে দশটা-সাড়ে পাঁচটা হয়নি। কার সঙ্গে যেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল মেট্রোর সামনে ছ'টা নাগাদ, এক ঘণ্টা সময় হাতে, কি করবো পার্কের একধারের বেঞ্চে বসে এক ঠোঙা চিনেবাদাম কিনে খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছিলাম। এবং সেই সঙ্গে ফণি মনসার দুর্গে ছুঁচো ইঁদুরদের ক্রীড়া কৌতুক দেখছিলাম।

আমি বসেছিলাম উত্তর-পশ্চিম কোণায় সর্বশেষ বেঞ্চে। কার্জন পার্ক তখনো এত গিজগিজে ভিড়ে ঠাসা হয়ে ওঠেনি। লোকজন যথেষ্টই ছিল কিন্তু এখনকার মতো এত গাদাগাদি ছিল না।

ঐ বেঞ্চে আমার পাশেই বসেছিল এক আধা পাগল, আধা ভবঘুরে ধরনের লোক। জামাকাপড় খুব ফর্সা নয়, খুব ময়লাও নয়। ঠিক রাস্তায় শুয়ে থাকা টাইপ নয়। হয়তো কিছু করে, হয়তো কিছু করে না। সারাদিন পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, হয়তো রাতে বাড়ি ফিরে যায়।

তা এই লোকটি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বেঞ্চির সামনে ঘাসের ওপরে নেমে গেল। বেঞ্চির সামনে এবং আশেপাশে ঘাসের মধ্যে প্রচুর পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে রয়েছে। লোকটি উবু হয়ে বেছে বেছে সিগারেটের টুকরোগুলো কুড়োতে লাগল।

আমি তখন সিগারেট খেতাম। একটা সিগারেট একটু আগেই ধরিয়েছিলাম। লোকটির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে মাত্র দু-টো টান দিয়েই সিগারেটটা ফেলে দিলাম, যাতে লোকটি একটা বড় অর্থাৎ কমপোড়া সিগারেট পায়।

এই লোকটি কিন্তু আমার ফেলা সিগারেটের টুকরো সমেত আরো বেশ কয়েকটি বড় টুকরো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট ছোট দগ্ধাবিশিষ্ট সিগারেটের টুকরো

কুড়িয়ে পকেটে ভরতে লাগল।

লোকটির এই খামখেয়ালিপনা লক্ষ্য করে আমি একটু অধৈর্য হলাম। আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বড় বড় সিগারেটের টুকরোগুলো বিশেষ করে আমার ফেলে দেওয়া টুকরোটা অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাকে বললাম, 'এই তো বেশ বড় টুকরো রয়েছে।'

লোকটি অত্যন্ত সন্দেহজনক ভঙ্গিতে আমার দিকে ঘুরে তাকালো। তারপর অভিমানাহত কণ্ঠে আমাকে বলল, 'আপনি আমাকে যা ভেবেছেন আমি তা নই। আমি ফিল্টার সিগারেট ছাড়া খাই না।'

অতঃপর একটা বাজে তস্য বাজে যাকে অকহতব্যই বলা যায় তেমন একটা গল্প বলি। এই গল্পটা যদি কোনো নীতিবাগীশ বলেন, 'অশ্লীল', কিংবা নীতিবাগীশিনী বলেন 'অসভ্য', আমি করজোড়ে বলব, 'ভাই, এ গল্পটাতো আগেও অন্যভাবে লিখেছিলাম তখন তো আপত্তি করেননি।'

অতীতে যদি আপত্তি না করে থাকেন তবে বর্তমানে কেন আপত্তি করবেন ? আর আপত্তি করার মতো এ গল্পে কিছু আছে বলে যদি আপনি ভাবেন, সে আপনার নিজ গুণে, তাতে আমার কোনো দোষ নেই।

বিড়ি-সিগারেট খেলে, চুরুট খেলে তো বটেই মুখে গন্ধ পাওয়া যায়। অল্পবয়েসী ছেলেরা যখন প্রথম লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া শুরু করে তখন গুরুজনরা যাতে মুখের গন্ধ টের না পায় সেই জন্যে খুব কাছে ঘেঁষে না। আবার কেউ কচি পেয়ারা পাতা বা লেবুপাতা চিবিয়ে বাড়ি আসে কিংবা বাড়ি এসেই গায়ে সেন্ট পাউডার মাখে যাতে তামাকের গন্ধ চাপা পড়ে।

আমাদের গল্পটা অবশ্য এর থেকে আলাদা। এক নববিবাহিত যুবক তার বন্ধুর কাছে অনুযোগ করেছিল, 'ভাই বৌয়ের মুখে বড় সিগারেটের গন্ধ'। বন্ধু বলল, 'তুই তো সিগারেট খাস না সেই জন্যে তোর অসুবিধে হচ্ছে। তোর বৌ একালের মেয়ে দু'একটা সিগারেট খায় খাবে, স্কুল কলেজে পড়ার সময় হয়তো নেশা করে ফেলেছে। মুখে একটু আধটু গন্ধ, ও নিয়ে আপত্তি করতে যাস নে।' বর বলল, 'না রে সেটা কথা নয়। খোঁজ নিয়ে দেখেছি বৌ নিজেও সিগারেট খায় না। অথচ বৌ-এর মুখে সিগারেটের গন্ধ ? কেমন খটকা লাগে রে।'

অবশেষে একটি সরল আখ্যান দিয়ে তামাক বৃত্তান্ত শেষ করি।

এক মধ্যবয়সী রোগীকে বিশদভাবে পরীক্ষা করার পরে ডাক্তার নির্দেশ দিলেন, 'ডিম, আলু, মাংস—এসব খাওয়া কমাতে হবে। মিষ্টি বন্ধ, নুন চিনি কম। মদ একেবারে খাবেন না। ছোট মাছ খাবেন, ডালের সুপ। সিগারেট দৈনিক এক প্যাকেট, ঠিক দশটা।' রোগী কি একটা আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। ডাক্তার বললেন, 'না, কোনো আপত্তি নয়। কষ্ট করে যা বলছি মেনে চলতে হবে।'

সাতদিন পরে রোগী আবার এলেন ডাক্তারবাবুর কাছে, 'ডাক্তারবাবু, খুব কষ্ট হচ্ছে। আর পারছি না।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'কেন কী হলো ?' রোগী বললেন, 'ঐ যে দশটা সিগারেটের কথা বলেছিলেন। সারা জীবন সিগারেটে টান দিইনি। এখন এই বয়েসে হঠাৎ দৈনিক দশটা করে সিগারেট খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

শিক্ষা

শিক্ষা শব্দটির দু'টি স্পষ্ট আলাদা অর্থ আছে। বিদ্যা থেকে যেমন বিদ্বান, শিক্ষা থেকে তেমনই শিক্ষিত। এই শিক্ষার অর্থ অনুশীলন, চর্চা, জ্ঞানার্জন। আর অন্য শিক্ষা হলো তিক্ত অভিজ্ঞতা। লোডশেডিংয়ে বদ্ধ লিফটে সাড়ে তিন ঘণ্টা দমবন্ধ আটকিয়ে থেকে বেরোবার পর মানুষ বলে, 'আমার খুব শিক্ষা হয়েছে, জীবনে আর লিফটে উঠতে যাচ্ছি না।'

প্রথম জাতের শিক্ষার ইংরেজি যদি হয় এডুকেশন (**Education**), দ্বিতীয় হলো লেসন (**Lesson**)। আজকাল লোকে বাংলায়ও কথাটা ব্যবহার করে অনেক সময় দ্বিত্বদোষ সহযোগে, যথা 'ধরতে পারলে তারাপদকে এমন লেসন শিক্ষা দেবো যে আর এ সমস্ত লিখতে সাহস পাবে না।'

উদাহরণ সহযোগে নিজেকে হেনস্তা করে লাভ নেই, তার চেয়ে শিক্ষাজনিত একটা হাস্যকর আখ্যান আগে বলে নিই।

এক প্রবীণ ভদ্রলোক তার তিনটে ছেলেকে খুব ভালো করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিনজনের মধ্যে একজন আইন শিখে উকিল হয়েছে, অন্যজন চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করে ডাক্তার হয়েছে এবং তৃতীয়জন হয়েছে সাংবাদিক।

ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন দেখা হতে আর দশজনের মতই তাঁকে প্রশংসা করে বললাম, 'আপনি আপনার তিনটি ছেলেকে তিন রকম বিষয়ে শিক্ষিত করেছেন, আজকালকার দিনে

এটা কম কথা নয়।'

আমার প্রশংসা শুনে ভদ্রলোক তিক্ত হেসে বললেন, 'আপনারা তো ভালো দেখছেন, আর এদিকে আমি যে কী ঝামেলায় পড়েছি।'

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কিসের ঝামেলা ?' 'আর ঝামেলা !' ভদ্রলোক বললেন, 'সেদিন বাড়ির সামনের রাস্তায় একটু পায়চারি করছি হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আমার ডাক্তার ছেলে ছুটে এল ওষুধ ব্যান্ডেজ নিয়ে, এদিকে উকিল ছেলে বাধা দিল। বলল, 'আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে হবে, বাবার যদি হাড়টাড় ভেঙে থাকে তবে এখনই সারিয়ে ফেললে ক্ষতি হবে।' তখন এল ছোটছেলে, যে সাংবাদিক সে এসে বলল, 'বাবা তুমি যে ভাবে রাস্তায় পড়ে আছ, সে ভাবেই থাকো। আমি ক্যামেরাম্যান নিয়ে আসছি, ছবি দিয়ে দুর্ঘটনার দারুণ স্টোরি হবে কালকের কাগজে।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে বিচলিত বোধ করলাম। তবে এর চেয়েও বিচলিত হওয়ার ঘটনা আছে।

শিক্ষক মহোদয় ক্লাসের ছেলেদের একটা রচনা লিখতে দিয়েছিলেন। রচনার বিষয় 'আলস্য'। সব ছেলেই যে যেমন পেরেছে, খারাপ-ভালো নিজের সাধ্যমত রচনা লিখে এনেছে, শুধু একটি ছেলের রচনা খাতায় দেখা গেল সামনের তিনপাতা সম্পূর্ণ সাদা তারপর চতুর্থ পৃষ্ঠায় নিচের দিকে বড় বড় হরফে লেখা, 'ইহাই আলস্য'।

* * *

লেখাপড়া শিখে যে কিছু হয় না—একথা চিরকালই লোকে জানত। কোনো যুগেই চালাক লোকেরা বিশেষ একটা লেখাপড়া করেনি।

সেই যে ছড়া ছিল, আমরা সবাই প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়েছি সে ছড়া—'লেখাপড়া করে যেই। গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই ॥'

এই কথাটা যে ডাঁহা মিথ্যা এটা সবাই চিরকালই জানে। ক'জন মাস্টারমশাইয়ের গাড়ি আছে, নিজের গাড়ি চড়েন। অথচ সামান্য একজন ব্যবসায়ীর গাড়ি আছে, একটি নয়, বহুক্ষেত্রে একাধিক।

তবে লোকে শেখে। শুধু লেখাপড়া নয় অনেক কিছুই শেখে, ঠেকে শেখে, দেখে শেখে। একেক জন একেক রকম শেখে।

এক বিখ্যাত তাসুড়ের (তাস খেলোয়াড়ের) শিশুপুত্রকে একবার এক-দুই গুনতে দেখেছিলাম। এক থেকে দশ পর্যন্ত ঠিকই বলে গেল শিশুটি গড়গড় করে কিন্তু তারপরে এগারো-বারো-তেরো না বলে বলল, 'গোলাম, বিবি, সাহেব।' শিশুটির আর দোষ কী ? সে যা দেখেছে, যা শুনেছে তাই শিখেছে।

লেখাপড়া শিক্ষার ব্যাপারে পিতৃদেবের বা অভিভাবকের ভূমিকা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। তাস খেলোয়াড় পিতৃদেবের পর মৎস্যশিকারী পিতৃদেবের কথা বলি।

একদিন একটি ছেলে খুব দেরি করে স্কুলে গিয়েছে। ক্লাসে ঢোকার পর শিক্ষক মহোদয় যথারীতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেরি হলো কেন ?'

ছেলেটি ম্লান মুখে উত্তর দিল, 'স্যার, ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।' মাস্টারমশাই দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'তা মাছ না ধরে এখন আবার স্কুলে আসতে গেলে

কেন ?'

এই প্রশ্নে ছেলেটি কেঁদে ফেলল। তারপর চোখ মুছে বলল, 'বাবা তাড়িয়ে দিল।' মাস্টারমশাই শুনে বললেন, 'তোমার বাবা তো ঠিক কাজই করেছেন। ইস্কুলের সময় মাছ ধরতে যাবে কেন ?' ছেলেটি বলল, 'না স্যার, সে জন্যে নয়। বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলল যে চার কম আছে, তোর মাছ ধরা হবে না, তুই ইস্কুলে চলে যা।'

অবশেষে একটা সত্যি ঘটনা বলি। অনেক গালগল্পের পরে এই আখ্যানটি যদি কারো বিশ্বাসযোগ্য মনে না হয়, সেটা তার স্বভাবের দোষ, আমাকে সন্দেহ করে লাভ নেই।

কলকাতা চিড়িয়াখানার পূর্বদিকের মানে জাতীয় গ্রন্থাগারের দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে ডানদিকে রেস্তোরাঁ পেরিয়ে কিছুটা এগোলে জাল দিয়ে ঘেরা কয়েকটা পাখির খাঁচা রয়েছে। এর মধ্যে একটি খাঁচায় একটি সাদা ধবধবে অসামান্য রূপবান সাদা কাকাতুয়া রয়েছে, সে চমৎকার মানুষের গলায় বলতে পারে, 'হ্যালো ডারলিং।' অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে একটু মনমর্জি আছে কাকাতুয়াটা অনেক সময়েই একেবারে চুপচাপ থাকে, হাজার সাধ্য সাধনাতেও কথা বলে না।

আমাদের এই ঘটনার নায়ক যেদিন চিড়িয়াখানায় গেছেন, ভাগ্যক্রমে সেদিন কাকাতুয়াটার মেজাজ খুব শরিফ ছিল। তাকে যে কেউ 'হ্যালো' বলছে, সে জবাবে 'হ্যালো ডারলিং' বলছে। ভদ্রলোকটিও কয়েকবার 'হ্যালো' বললেন তার বদলে 'হ্যালো ডারলিং' সম্ভাষণ পেয়ে কৃতার্থ হলেন।

ঘটনাটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল ভদ্রলোকের। এর কিছুদিন পরে তিনি সস্তায় একটা কাকাতুয়া পেয়ে কিনে ফেললেন। এবং পাখিটাকে যাকে পাখিপড়া সেইভাবে 'হ্যালো ডারলিং' শেখাতে লাগলেন। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। কাকাতুয়াটা আগে ছিল এক টেলিফোন অপারেটরের। সে সেখান থেকে আগেই উলটো জিনিস শিখে এসেছে। তাই যতবার ভদ্রলোক বলেন, 'হ্যালো', পাখিটা চিড়িয়াখানার কাকাতুয়ার মতো বিনিময়ে 'হ্যালো ডারলিং' না বলে বলে, 'সরি, লাইন এনগেজড় (Sorry, Line engaged)।'

পুনশ্চঃ

এক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ শিশুশিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করছিলেন। বক্তৃতার পরে জনৈক শ্রোতা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'শিশুদের শেখার বয়েস কবে শুরু হয় ?'

বিশেষজ্ঞ জানতে চাইলেন, 'আপনার শিশুটি কবে জন্মাবে ?' ভদ্রলোক বললেন, 'জন্মাবে কি ? আমার বাচ্চার পাঁচ বছর বয়েস হয়েছে।'

বিশেষজ্ঞ বললেন, 'সর্বনাশ ! জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঁচ বছর এর মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। দৌড়ে বাড়ি যান। যা শেখাতে চান এখনই শেখানো আরম্ভ করুন। আর দেরি করবেন না।'

সিনেমা সিনেমা

অনেকদিন আগে এক হাল্কা বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদক লিখেছিলেন যে আজকাল শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে আর 'মা', 'মা' বলে কাঁদে না, সেই বাচ্চা 'সিনেমা, সিনেমা' বলে কাঁদে।

সেই সম্পাদক বহুদিন বিগত হয়েছেন, সেই তরল পত্রিকাটিও কবে উঠে গেছে। কিন্তু সেই পত্রিকার ও সম্পাদকের অসংখ্য প্রবাদপ্রতিম বাক্যের সঙ্গে এই উক্তিটিও এখনো আমার মনে আছে।

সিনেমা সংক্রান্ত বিষয়ে লিখবার তেমন কোনো বিশেষ অধিকার আমার নেই। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা অতি সীমিত। কদাচিৎ কোনো সিনেমার স্টুডিয়োতে কিংবা সুটিংয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই। বলা বাহুল্য, এ সম্পর্কে আমার কৌতূহল অপরিসীম নয়।

তবে একটা কথা কবুল করছি, একবার সিনেমায় নেমেছিলাম। না, কোনো জনতার বা মিছিলের দৃশ্যের শেষের সারিতে নয়, একেবারে মঞ্চের উপরে, মাইকের সামনে।

সিনেমায় মঞ্চ এবং মাইকের উল্লেখ করায় বুদ্ধিমতী পাঠিকার মনে হয়তো সংশয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু সংশয়ের কিছু নেই। একটি অনতিপ্রচারিত আধুনিক সিনেমায় একটি কবি সম্মেলনের দৃশ্য ছিলো। সেখানে জ্যান্ত কবিদের মঞ্চে তুলে মাইকে কবিতা পড়ানো হয়।

আরো তিনজন কবিবন্ধুর সঙ্গে সেখানে আমিও কবিতা পাঠের সুযোগ পেয়েছিলাম।

চিত্রগ্রহণ হয়েছিলো গভীর রাতে, পরিচালক ছিলেন আমাদের প্রাণের বন্ধু ও পরমহিতৈষী তিনি আমাদের সুপ্রচারের জন্যেই এই মহৎ আয়োজন করেছিলেন।

সুটিং শেষ হতে রাত প্রায় কাবার। বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকা আমার অভ্যেস নেই, তারপর শেষ রাতে ভয়াবহ খিদে পায় আমার। সেই অভুক্ত ও বিনিদ্র রজনীর স্মৃতি আমার পক্ষে খুব সুখকর নয়।

এক বিখ্যাত লেখকের অসামান্য কাহিনী নিয়ে এক বিশিষ্ট পরিচালকের সেই ছায়া চিত্র খুব বেশিদিন চলেনি। হয়তো কবি সম্মেলনের মত আধুনিক ব্যাপার দর্শকেরা মেনে নেননি, সেই জন্যে নিজেকে এখনো কেমন যেন বড় দোষী মনে হয়।

আমার নিজের দোষের কথা সাতকাহন, সে সব ইনিয়ে বিনিয়ে বললে কেউ শুনবে না ! আমার লেখার অবস্থা দাঁড়াবে ঐ সিনেমার মত, পাবলিক নেবে না। সুতরাং অন্য দিকে যাই।

কিন্তু কি যে পাবলিক নেয় আর কি যে পাবলিক নেয় না তাই বা কে জানে।

একদা এক তথাকথিত আর্ট ফিল্ম অর্থাৎ আধুনিক সিনেমার এক পরিচালককে দেখেছিলাম গদগদ হয়ে তাঁর এক ভক্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিন তাঁর নতুন বইয়ের প্রথম শো হচ্ছে হলে। শো সদ্য ভেঙেছে, হলের লবিতে তিনি হাতজোড় করে বেগুনি কামিজ এবং লাল উত্তরীয় সেই সঙ্গে অ্যামোজেইক লম্বিত ধুতি পরে বিবাহবাসরের কন্যা কর্তার মুখভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে ভিড় বেশ পাতলা হয়ে গেলো। পরের শো আরম্ভ হতে এক ঘণ্টা বাকি, আর্ট ফিল্ম যেমন হয়, কোন রকমে টেনেটুনে দেড় ঘণ্টার বই, তিন মিনিট ব্ল্যাঙ্ক, আট মিনিট স্টিল।

সে যা হোক, ভিড় হাল্কা হতে সেই ভক্ত পরিচালককে বিনীতভাবে জানালেন, স্যর, আপনার সমস্ত বই আমি প্রথম শো'তেই দেখে নিই।

মুগ্ধ পরিচালক বললেন, 'আপনি আমার খুব ভক্ত দেখছি।'

ভক্ত ভদ্রলোক করজোড়ে বললেন, 'না স্যর, ঠিক সে জন্যে নয়।'

পরিচালক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে ?'

ভক্ত বললেন, 'স্যর, আমার ইচ্ছে একটা রেকর্ড করি। কলকাতায় রিলিজ হওয়া সমস্ত বই আমি দেখতে চাই। কিন্তু আপনার বই ক'দিন চলবে তার তো ঠিক নেই। তাই আমি প্রথম দিনে প্রথম শো'য়ে দেখে নিই।'

এই ভক্ত ভদ্রলোকের কথা আলাদা। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যে সব সিনেমা দেখা যায় তা নয়। 'সাউন্ড অফ মিউজিকে'র গানগুলো কি রকম আমি কোনো দিন জানতেই পারিনি কারণ আমার সিটের সামনে এবং পিছনে দুটি বাচ্চা আগাগোড়া কেঁদে গেলো।

এরকম ঘটনা আরো বহুবার ঘটেছে। সবথেকে মারাত্মক হয়েছিলো সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর' সিনেমায়। ঠিক আমার সরাসরি সামনের সিটে বসে ছিলেন শালপ্রাংশু মহাভুজ এক প্রাগৈতিহাসিক দর্শক। তাঁর আবার মাথায় এয়ার কন্ডিশনের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য (বোধহয়) পশমের মোটা আলোয়ান জড়ানো।

আমি বিনীতভাবে বললাম, 'দাদা, আমি আপনার জন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কি দেখবেন মশায় ? হাসির বই। হাসতে এসেছেন, হাসুন।'

আমি আরো বিনীতভাবে বললাম, 'বই না দেখলে হাসবো কি ভাবে ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'বই দেখে হাসবেন কোন দুঃখে ? আমিই তো দেখছি, আপনি শুধু আমার দিকে লক্ষ্য রাখুন। আমি যখন হাসবো, আপনিও তখন হাসবেন। তা হলেই হয়ে গেলো।'

আমার নিজের সিনেমা করার বা সিনেমা দেখার গল্পের চেয়ে সিনেমার তারকাদের নিয়ে গল্প অনেক বেশি জমজমাট। তবে এসব গল্প আমার লিখবার অবকাশ কম। কারণ সিনেমা তারকারা তাঁদের সম্পর্কে যা কিছু গল্প সেগুলো নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে প্রচার করেন। বহুক্ষেত্রে তাঁদের নিয়ে যেসব নিন্দা-প্রশংসা, বাজারচলতি গুজব, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি তাঁরা নিজেরাই রটনা করেন। অনেক সময় পুরো ব্যাপারটা ভালোভাবে গুছিয়ে করার জন্যে তাঁরা ব্যক্তিগত প্রচার সচিবের সাহায্য নেন।

এ সবের মূলে রয়েছে একটা ইংরেজি প্রবচন যেখানে বলা আছে কুখ্যাতি (নটোরিটি) খ্যাতিকে (ফেম) ডেকে আনে। তাই তারকাদের চেষ্টা নটোরিয়াস হওয়া কারণ সেটা ফেমাস হওয়ার সোপান। তা ছাড়া গোলমেলে, ডগমগে সংবাদের সৃষ্টি করা মানেই বহুলোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা। বাচ্চা ছেলে কাঁচের গেলাস ভেঙে যেভাবে ঘর ভর্তি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে স্টুডিয়ো চত্বর থেকে, হোটেলের লবি থেকে, বিমানবন্দর থেকে চটকদার খবর আসে, পরদিন পাঠকের প্রাতরাশের সঙ্গে চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করে মুখরোচক অম্লমধুর অশালীন গল্পকথা।

এ সব গোপন কথা বেশি আলোচনা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে না। মজার গল্পে ফিরে যাই।

চিত্রতারকারা যে সত্যিই নিজের কথা বলতে ভালোবাসেন, তার প্রমাণ আমার নিজেরই এক বন্ধু। আমার সেই বন্ধু একজন খ্যাতনামা অভিনেতা। অনেকদিন পরে সেদিন তার সঙ্গে দেখা।

সে একবারও জানতে চাইলো না, জিজ্ঞাসা করলো না আমি কেমন আছি, কি করছি। শুধু বারবার ঘুরে ফিরে নিজের কথা, নিজের অভিনয়ের কথা, নিজের সাফল্যের কথা বলতে লাগলো।

অবশেষে তার কি খেয়াল হলো। সে একটু থেমে আমাকে বললো, 'এই দ্যাখো, আমি খালি নিজের কথাই আগাগোড়া বলছি। তোমার কথা কিছু শুনি।'

আমি বললাম, 'বলো, কি শুনতে চাও।'

সে গম্ভীর হয়ে বললো, 'আচ্ছা বলো তো, আমার শেষ বইটা তোমার কেমন লেগেছে ?'

এরপর সরাসরি হলিউডে যাবো।

তার আগে বুদ্ধিজীবী ও চিত্রতারকার সেই অমূল্য বাক্যালাপটির উল্লেখ না করলে এ নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকবে।

এই বিখ্যাত কথোপকথন প্রায় সকলেরই জানা। কেউ কেউ বলেন এই কথামালায় বুদ্ধিজীবীটি হলেন স্বয়ং জর্জ বার্নার্ড শ।

এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অসংখ্য উজ্জ্বল উক্তির সত্যিমিথ্যে দায়িত্ব বার্নার্ড শ সাহেবের ঘাড়ে বর্তেছে। আমি তত পণ্ডিত নই যে হলফ করে বলতে পারবো যে বার্নার্ড শ

সাহেবেই এই কথা বলেছিলেন।

আলোচ্য কথামালার বুদ্ধিজীবীটি হলেন কুদর্শন বা কুৎসিত। আর চিত্রতারকাটি হলেন গ্রেটা গার্বো কিংবা সুন্দরীতরা আর কেউ।

(নবীনা পাঠক, গ্রেটা গার্বো মানে বুঝতে পারছেন? আপনার পিতামহের হার্টথ্রব, আপনার পিতামহীর ঈর্ষার অগ্নি, মেরিলিন মনরো+মধুবালা+···।)

সেই গ্রেট গ্রেটা গার্বো একদা নাকি মনীষী বার্নার্ড শ সাহেবকে প্রস্তাব করেছিলেন, কোনো বাজে প্রস্তাব নয় খুব সুপ্রস্তাব, খাঁটি বিবাহের প্রস্তাব।

বিষয়টি বর্ণনার সুবিধের জন্য নাট্যাকারে লিখছি:

সময়: প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী।

স্থান: বৃটিশ চ্যানেলের মাঝামাঝি একটি প্রমোদ তরণীর লাউঞ্জ।

পাত্রপাত্রী: জর্জ বার্নার্ড শ, গ্রেটা গার্বো।

গ্রেটা গার্বো: শুভ সন্ধ্যা সাহাবাবু।

বার্নার্ড শ: শুভ সন্ধ্যা। কিন্তু আপনি?

গ্রেটা গার্বো: আমাকে চিনতে পারছেন না?

বার্নার্ড শ: আপনাকে কখনো দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। আপনার সঙ্গে কখনো আমার কি পরিচয় হয়েছিল?

গ্রেটা গার্বো: (কিঞ্চিৎ দমিত হয়ে) না ঠিক তা নয়। তবে আমি একজন চিত্রাভিনেত্রী। ভেবেছিলাম হয়তো কোনো ছবিতে আমাকে কখনো দেখে থাকবেন।

বার্নার্ড শ: সে যাক। ঠিক আছে।

গ্রেটা গার্বো: আপনি কি আমাকে একটু সময় দিতে পারবেন? একটা দরকারি কথা ছিল।

বার্নার্ড শ: কি দরকারি কথা। আমার কিন্তু সময় খুব মূল্যবান।

গ্রেটা গার্বো: ব্যাপারটা রীতিমত ব্যক্তিগত। আমি আপনার কাছে একটা ঘনিষ্ঠ প্রস্তাব রাখতে চাই।

বার্নার্ড শ: (বিরক্ত হয়ে) কিসের ব্যক্তিগত প্রস্তাব? ব্যাপারটা কি?

গ্রেটা গার্বো: ব্যাপারটা ভালো। এতে মানব জাতির উপকার হবে।

বার্নার্ড শ: তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

গ্রেটা গার্বো: (একটু ইতস্তত করে) আপনি আমাকে বিয়ে করুন।

বার্নার্ড শ: (কিঞ্চিৎ চমকিত হয়ে) হঠাৎ আপনাকে বিয়ে করতে যাবো কেন?

গ্রেটা গার্বো: দেখুন, আমাদের বিয়ে হলে আমাদের যে সন্তান জন্মাবে সে আপনার বুদ্ধি আর আমার রূপ নিয়ে জন্মাবে। সেই হবে সংসারের সেরা মানুষ।

বার্নার্ড শ: (একটু চুপ করে থেকে) কিন্তু এর বিপরীতটাও তো হতে পারে।

গ্রেটা গার্বো: (বিচলিত হয়ে) মানে?

বার্নার্ড শ: সে যদি আপনার বোকা বুদ্ধি আর আমার কুৎসিত চেহারা পায়? তখন সেই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বোকা—কুৎসিত।

উপরের এই বিখ্যাত নাটিকাটি নিতান্তই কষ্টকল্পনা এবং আদপে যে এমন কোথাও কখনো ঘটেনি সেটা অনায়াসেই বোঝা যায়। সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর হলিউড।

হলিউডের এক ঝলমলে বহুবিবাহিতা নায়িকার শেষ বিবাহের অল্প দিন পরেই সিনেমার বাজারে গুজব রটে যায় যে তাঁর আবার বিবাহবিচ্ছেদ হতে চলেছে। এ বিষয়ে এক চিত্রসাংবাদিক প্রশ্ন করায় সেই সুন্দরী এক অনবদ্য উত্তর দিয়েছিলেন, 'এসব কি বলছো ! এখনো আমার স্বামীর সঙ্গে আমার ভালো করে পরিচয়ই হলো না, এরই মধ্যে ডাইভোর্স হবে কি করে ?'

রূপোলি পর্দার জগতে আরো একটু ঘুরে আসি।

বলা বাহুল্য, আমাদের কলকাতা অথবা টালিগঞ্জের (যাকে ভালোবেসে কিংবা পরিহাস করে বলা হয় টলিউড) সে জায়গার সাদাসিধে, নরম সরম পটভূমিকায় এই গল্পগুলি মানাবে না। এই গল্পগুলির মূল বাসস্থান, হলিউড কিংবা নিদেনপক্ষে বোমবাই।

প্রথমে চিত্রতারকার বিয়ে দিয়ে শুরু করি। গল্পকাহিনীর চিত্রতারকাদের যেমন হয় আমাদের এই অভিনেত্রীও দশ-পনেরো বার বিয়ে করেছিলেন। এই শেষবার বিয়ে করে বরের সঙ্গে পতিগৃহে এলেন। বাড়ির মধ্যে ঢুকে অভিনেত্রী মহোদয়ার কেমন যেন খটকা লাগলো। একটু এদিক ওদিক ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর নতুন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটাই তোমার বাড়ি ?'

স্বামী উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'কেন ভাল নয় ? তোমার পছন্দ হচ্ছে না ?'

কি একটু চিন্তা করে অভিনেত্রী মহোদয়া বললেন, 'পছন্দ না হওয়ার কি আছে ? বেশ ভালো বাড়ি, কিন্তু কেমন যেন সব কিছু চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।' তারপর একটু থেমে মহিলা তাঁর স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা আমাদের দুজনের কি আগেও কখনো বিয়ে হয়েছিল ? এ বাড়িটায় মনে হচ্ছে আমি আগেও কিছুদিন ছিলাম।'

অভিনেত্রীর অতি বিবাহের পরবর্তী গল্পটি দুরকম ভাবে প্রচলিত আছে। দুটি গল্পেই অভিনেত্রীর সন্তানের একটা ভূমিকা রয়েছে।

প্রথম গল্পে বিবাহ বৎসল নায়িকা নতুন বিয়ের দু'একদিন পরে শিশুকন্যাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন, 'তোমার নতুন বাবাকে কেমন লাগছে ?' মেয়েটি সন্তর্পণে বললো, 'ভালোই। তবে....?' নায়িকা ভুরু কোঁচকালেন, 'তবে আবার কি ?' মেয়েটি দাঁত দিয়ে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, 'প্রত্যেকবার তুমি নিজেই পছন্দ করছো। এরপর যখন নতুনবাবা হবে আমি পছন্দ করে আনবো।'

দ্বিতীয় গল্পটি প্রায় একই রকম। তবে সামান্য একটু হেরফের। হলিউডের দুই খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীর দুই সমবয়সিনী শিশুকন্যা পার্কে গল্প করছে।

প্রথমা দ্বিতীয়ার কাছে জানতে চাইলো, 'কি রে তোর নতুন বাবা কেমন হয়েছে ?'

দ্বিতীয়া বললো, 'খুব ভালো। খুব সুন্দর লোক। আমাকে কত খেলনা, চাকোলেট কিনে দিচ্ছে।'

প্রথমা বললো, 'জানি। গত বছর তো তোর নতুন বাবাই আমাদের বাবা ছিলেন। আমাকেও কতসব খেলনা, চকোলেট দিতেন। তুই এবার খুব ভালো বাবা পেয়েছিস।'

এই নিবন্ধ গড়াতে না গড়াতেই তারকাদের অতিবিবাহে জড়িত হয়ে পড়লাম। এ বিষয়ে এই মুহূর্তে এত বেশি গল্প মনে পড়ছে সহজে বেরিয়ে আসতে পারবো বলে ভরসা করছি না।

সেই গল্পটাই ধরা যাক। গল্পটা আসলে কুসংস্কার সংক্রান্ত। কিন্তু এর মধ্যেও বিয়ের মাত্রাধিক্য রসিকতাটি স্পষ্ট।

এক সাংবাদিক এক বিখ্যাত নায়কের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। নানা ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন করার পরে রিপোর্টার বললেন, 'শুনেছি, আপনার নানা রকম কুসংস্কার আছে।' নায়ক বললেন, 'তা আছে, হাঁচি, ডান চোখের পাতা নাচা, টিকটিকি ডাকা, কালো বেড়ালের রাস্তা পার হওয়া, শনিবারের বারবেলা—এসব আমি যে কারণেই হোক, বুঝে বা না বুঝে ভয় পাই, যথাসাধ্য মেনে চলি।'

রিপোর্টার পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা কোনো সংখ্যা সম্পর্কে আপনার মনে কোনো কুসংস্কার নেই ? যেমন তেরো কিংবা নিরানব্বুই।' নায়ক বললেন, 'নিরানব্বুইয়ের ধাক্কায় এখনো আমাকে পড়তে হয়নি। কিন্তু তেরোর ব্যাপারটা নিয়ে আমার কোনো খটকা নেই, তেরোয় আমার কখনো কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং তেরো বেশ ভালো।'

উৎসাহী সাংবাদিক বললেন, 'যেমন ?' নায়ক মধুর হেসে বললেন, 'তেরো বছর বয়েসে ক্লাস নাইনে ওঠার পরীক্ষাতেই ফেল হয়ে বাড়ি থেকে পালালাম। সেই জন্যেই তো সিনেমা লাইনে শেষ পর্যন্ত এতটা উঠলাম। তারপরে আমার তেরো নম্বর ছবি 'দুষমনকা বিবি', সেটাতো আপনি জানেন সুপারহিট হয়েছিলো।'

অতঃপর একটু ম্লান হেসে নায়ক বললেন, 'আর তাছাড়া ওই 'দুষমনকা বিবি'র নায়িকা কুলসুম। আমার তেরো নম্বর বউ, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো ঐ কুলসুম মেয়েটা। চলে গেছে, কিন্তু জ্বালিয়ে যায়নি।'

পরনিন্দা করা আমার অপছন্দ নয়। সেই সঙ্গে যখনই পারি নিজেকে একটু এক্সপোজ করার চেষ্টা। কিন্তু এই নক্ষত্র সভায় অনুপ্রবেশ করার সাহস আমার নেই। তবু ঘটনাটা বলি।

সুদূর প্রবাসে মার্কিনী পশ্চিম উপকূলে সান্টা বারবারা নামে এক মনোরম শহরের এক পাইস হোটেলে আমি অল্প কয়েকদিন ছিলাম। সেখানে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে এক আধাভারতীয় মহিলার সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হতো। মহিলা সুহাসিনী এবং সুন্দরী এবং সুদেহী।

আমি জানি স্বদেশে, মাতৃভূমিতে ইনি আমার দিকে ভুলেও তাকাবেন না। তদুপরি মহিলাকে আমার খুব চেনাচেনা মনে হলো। কবে, কোথায়, কোন জন্মে এঁকে দেখেছি এই সব আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও কূল পাচ্ছিলাম না।

এরকম গোলমেলে সময়ে সহসা কোথা থেকে উদয় হলেন এক ভদ্রলোক, যিনি আমার সম্পূর্ণ অচেনা নন, আবার খুব চেনাও নন। ভদ্রলোক ভারতীয়, ঐ হোটেলের সিঁড়িতেও বারান্দায়ই তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়।

একদিন ঐ সুন্দরী সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন আর আমি আর সেই ভদ্রলোক নামছি। সুন্দরী বিলোল কটাক্ষে আমাদের 'হ্যালো' করে উঠে গেলেন।

আমি বিহ্বল বোধ করলাম, মনের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ, মহিলার অঙ্গভঙ্গি, হাবভাব সবই আমার অতি পরিচিত অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

বাধ্য হয়ে পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, এ মহিলাকে এত চেনা মনে হচ্ছে অথচ খেয়াল করতে পারছি না।'

ভদ্রলোক অবাক হলেন, বললেন, 'সেকি এঁকে চিনতে পারছেন না। আপনি হিন্দি সিনেমা দেখেন না ?' এই বলে তিনি এক হৃদ্‌পিণ্ড হিম হয়ে যাওয়া, বিখ্যাত লাস্যময়ী নর্তকীর নাম উল্লেখ করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'দেখেননি পর্দায় ওঁকে কখনো ?'

ততক্ষণে আমি চিনতে পেরেছি। আত্মসম্বরণ করে বললাম, 'হ্যাঁ, দেখেছি। তবে বিশেষ জামাকাপড় পরা অবস্থায় তো কখনো দেখিনি তাই পোশাক পরা চেহারায় চিনতে অসুবিধে হচ্ছিলো।'

নিজের কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলো। শেষ গল্পটি বলি। এই গল্পে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অভিনয় করেন। একটি প্রেম কাহিনীতে তাঁরা দুজনে প্রেমিক-প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

ছবিটি দেখে এক বিবাহিত ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'এই বইয়ের নায়ক কি অসামান্য অভিনয় করলেন প্রেমিকের ভূমিকায়।' স্ত্রী বললেন, 'জানো না। ব্যক্তিগত জীবনেও ওঁরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী। আজ আঠারো বছর ওদের বিয়ে হয়েছে।' স্বামী হতভম্ব হয়ে বললেন, 'তাহলে নায়কের অভিনয় আরো অতি উঁচুদরের এটা স্বীকার করতেই হবে।'

পুনশ্চঃ এখন চারদিকে আওয়াজ উঠেছে একবিংশ শতাব্দী নিয়ে। সর্বত্র সাজ-সাজ রব, ঐ একবিংশ শতক এসে গেলো। প্রধানমন্ত্রী থেকে দীনতম নাগরিক সকলেই দ্রুত আগামী শতাব্দীর দিকে এগিয়ে চলেছেন।

শুধু সেদিন একজনকে দেখলাম এ বিষয়ে খুব মনমরা। সে বোম্বাই সিনেমার খুব ভক্ত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দু হাজার খ্রীষ্টাব্দ সম্পর্কে তুমি কেমন আশান্বিত, তোমাদের হিন্দি সিনেমা তখন কেমন হবে, কতটা এগোবে ?'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

আমি অবাক, বললাম, 'কেন, সর্বনাশের কি হলো ? সর্বনাশ হতে যাবে কেন ?'

সে হায় হায় করে উঠলো, বললো, 'আপনি বলছেন কি ? সর্বনাশ হবে না ? হেমামালিনী থেকে শ্রীদেবী পর্যন্ত সবাই বুড়ি হয়ে যাবে, আর কি সর্বনাশ আপনি চান !'

রোগী কাহিনী

বাংলা ভাষায় দুটি শব্দ আছে, রোগ এবং অসুখ। রোগের মানে হলো অসুস্থতা আর সুখের অভাব হলো অসুখ। এই অসুখ শব্দটি খুব চমৎকার। আমরা রোগ হয়েছে এ কথা বলতে গিয়ে বলি, 'আমার অসুখ হয়েছে', অর্থাৎ 'আমি অসুস্থ হয়েছি।'

কিন্তু অন্য দিকে কেউ যদি কখনো বলে, 'আমি অসুখী', তার মানে এই নয় যে তার রোগ হয়েছে, সে রোগী, তার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হবে বা ওষুধ আনতে হবে।

সুখ-অসুখের ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে বরং সরাসরি রোগী কাহিনীতে প্রবেশ করি।

রোগ, রোগী ও চিকিৎসক নিয়ে গল্পের শেষ নেই। ডাক্তার আর রোগী, চিকিৎসা ও অচিকিৎসা এই সব নিয়ে হাজার হাজার মজার গল্প। শুধু অসুখ বা ডাক্তার বা নার্স নিয়ে বিলিতি জোকবুকের সংখ্যাও কম নয়।

সব চেয়ে বড় কথা, এই সুপ্রাচীন বিষয়ে আমি নিজেও আবার অবসরে অল্প-বিস্তর লিখেছি। বাংলা ভাষায় পরশুরাম কিংবা শিবরাম, এমন কি বাংলা রসিকতার পিতামহ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অসুখ ও চিকিৎসা নিয়ে অত্যন্ত সব সরস রচনা উপহার দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমি হয়তো খুব অনধিকার চর্চা করছি না, তবে এঁদের নামের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার ঔদ্ধত্যের অপরাধে যদি কোনো কুটিল পাঠক আমাকে অপরাধী

সাব্যস্ত করেন, সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।

সে যা হোক, খুব বেশি পুরনো নয় আবার খুব বেশি পরিচিতও নয় এমন একটা তরল কাহিনী দিয়ে শুরু করছি। ডাক্তারি শিক্ষা দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

কল্পিত ডাক্তারি ক্লাসে অধ্যাপক-চিকিৎসক ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, মনে করো, তোমাদের মধ্যে কারো কাছে একজন রোগী এসেছেন, তাঁকে দেখে ঠিক অসুস্থ মনে হচ্ছে না। তিনি অনেক রকম রোগবালাই উপসর্গের কথা বললেন। কিন্তু তুমি যথেষ্ট পরিমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মল-মূত্র, রক্ত-থুতু, সর্করা-রক্তচাপ ইত্যাদি গবেষণা করেও কোনো অসুখ ধরতে পারলে না। তোমার সন্দেহ হলো রোগীর কোনো অসুখই হয়নি, এটা একেবারে মনের বাতিক। তখন তুমি কি করবে ?'

একে একে সব ছাত্রই জবাব দিলো, 'ওঁকে মাথার ডাক্তারের কাছে পাঠাবো। ওঁর চিকিৎসা করতে হবে মনোসমীক্ষা দিয়ে।'

শুধু একটি চতুর ছাত্র বললো, 'তা করবো কেন ? আমি তাঁকে ওষুধ দেবো, এমন ওষুধ যা খেয়ে তিনি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তখন আমি তাঁকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলবো।'

শুনে অধ্যাপক মোহিত হয়ে গেলেন, বললেন, 'আশ্চর্য ! সাধু, সাধু ! তুমি ক্লাসে বসে অযথা কি সময় নষ্ট করছো। তুমি সোজা প্র্যাকটিস করতে চলে যাও। তোমার হবে।'

এর চেয়ে মারাত্মক গল্প ডাক্তার বিধানচন্দ্রের ঘাড়ে চাপানো আছে। মহাপুরুষদের নামে অনেক অলৌকিক এবং ততোধিক অমূলক গল্প চলে। খুব সম্ভব এ গল্পটাও তাই।

প্রবাদপ্রতিম সেই মহাচিকিৎসক নাকি একবার তাঁর পরিচিত এক স্নেহভাজনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'তোমার শরীর খারাপ হলে তুমি অবশ্যই ডাক্তার দেখাবে, ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখাবে, কারণ ডাক্তারবাবুকে তো বাঁচতে হবে। তারপর ডাক্তারবাবু নিশ্চয় তোমার মল-মুত্র-রক্ত, এক্স-রে, ই-সি-জি এসব করতে বলবেন ; এসবও করবে, তুমি নিশ্চয় এসব করাবে কারণ এসব যাঁরা করেন তাঁদেরও তো বাঁচতে হবে। তারপর তোমার ডাক্তারবাবু সব দেখেশুনে অনেক মাথা ঘামিয়ে তোমাকে অনেক ওষুধ দেবেন। তুমি অবশ্য-অবশ্য সেসব ওষুধ কিনবে, কারণ এসব ওষুধ যাঁরা বানান, যাঁরা বেচেন, তাঁদের তো পয়সা চাই, তাঁদের তো বাঁচতে হবে।'

'আর তারপর ?' এবার একটু গম্ভীর হয়ে মহামহিম ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় শ্রীমান স্নেহভাজনের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি ওসব ওষুধ মোটেই খাবে না। কারণ তোমাকেও নিশ্চয় বাঁচতে হবে।'

প্রায় এই গল্পই, একটু অন্য কায়দায় সেটা উপস্থাপন করা, একটা পুরনো ডাক্তারি জোকবুকে আমি পেয়েছি। সে বইটির পেটেন্ট-পূর্ব ড্রাগিস্ট এ্যান্ড কেমিস্টের যুগের, যখন প্রেসক্রিপশন মানেই দাগাঙ্কিত শিশি। যার গায়ে লেখা, 'খাইবার পূর্বে ঝাঁকাইবেন।'

এবং। অথবা 'ছিপি শক্ত করিয়া বন্ধ রাখিবেন।'

যা হোক, ঐ পেটেন্ট-পূর্ব যুগের গল্পে ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনাকে অনেক ভালো দেখছি আজ, যা যা বলেছি সব ঠিকঠাক করে যাচ্ছেন ?'

রোগী হেসে বললো, 'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, যা যা বলেছেন সব ঠিকঠাক করে যাচ্ছি।' হঠাৎ ডাক্তারবাবুর রোগীর বিছানার পাশের টেবিলের ওপরে নজর পড়লো। সেখানে ওষুধের

শিশি অক্ষত, অটুট রয়েছে। বিস্মিত ডাক্তারবাবু বললেন, 'কয় শিশি ওষুধ কিনেছিলেন ?'

রোগী শিশির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, ঐ এক শিশিই তো যথেষ্ট ?'

বিমূঢ় ডাক্তারবাবু একটি অতি ক্ষীণ প্রশ্ন করলেন, 'তবে ?'

সরল রোগী বললেন, 'তবে আবার কি ? আপনিই তো বলে দিয়েছেন, ছিপি শক্ত করে বন্ধ রাখতে।'

ওষুধের শিশির গায়ের দ্বিতীয় নির্দেশটির গল্প প্রথমে চলে এলো। প্রথম নির্দেশটি আরও স্পষ্ট, 'খাইবার পূর্বে ঝাঁকিবেন।'

এ বিষয়ে প্রচলিত গল্পটি অতি রদ্দি। শুধু লিখে রাখার জন্যে লিখছি। কোথাকার কে এক রোগী নাকি ওষুধ খাওয়ার সময়ে শিশি ঝাঁকানোর কথা খেয়াল করেনি। তার পরে ওষুধ পান করে শিশি নামাতে গিয়ে উক্ত নির্দেশটি তার দৃষ্টিতে আসে। তখন তো আর ওষুধের শিশি ঝাঁকিয়ে কোনো লাভ নেই, তাই তিনি নিজের বাড়ির বাইরের বাগানে লাফাচ্ছিলেন পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ওষুধটাকে ঝাঁকানোর জন্যে।

এতগুলি অস্বাভাবিক কাহিনী লেখার পরে এবার অন্তত একটা স্বাভাবিক কাহিনী লিখতে হয়। এক সার্জনের কাছে এক রোগী তাঁর অসুখের ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে যান। রোগীটিকে যথাবিহিত পরীক্ষার পরে সার্জন সাহেব বললেন, 'অপারেশন ছাড়া গতি নেই।'

কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে তারপর রোগী বললেন, 'স্যার, আমার এই অপারেশনে কত খরচা হবে ?'

সার্জন সাহেব জবাব দিলেন, 'তা আট-দশ হাজার টাকা লাগবে মোটামুটি।'

আট-দশ হাজার টাকা কম টাকা নয়, রোগী মাথায় হাত দিলেন, তারপর বললেন, 'এ তো অনেক টাকার ব্যাপার। আমার তো এখন অত টাকা নেই।'

সার্জন সাহেব দেখলেন রোগী পালাতে পারে, তিনি নরম করে বললেন, 'না পারলে একবারে সব টাকা দেবেন না, ধীরেসুস্থে দেবেন।'

রোগী এবার একটু আশ্বস্ত বোধ করলেন, একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'ধীরে-সুস্থে কিরকম ?'

ডাক্তার বললেন, 'এই ধরুন, এখন হাজার তিনেক টাকা দিলেন। তারপর মাসে মাসে এই পাঁচশো করে এক বছর।'

রোগী বললেন, 'আমার শালা ইনস্টলমেন্টে কালার টিভি কিনেছে, সেটার কিস্তিটা যেন অনেকটা এইরকম।'

সার্জেন সাহেব একটু গম্ভীর হলেন, রুমালে মুখ মুছে বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি সত্যিই কিস্তিতে একটা রঙীন টিভি কিনছি।'

রোগী কাহিনী যখন শেষ পর্যন্ত কালার টিভি পর্যন্ত গড়ালো, তাহলে অবশেষে আমরা সেই পুরনো রোগীটিকে আরেকবার স্মরণ করি।

সে এক মহাভীতু রোগী, সব সময়ে নিজের রোগ নিয়ে মাথা ঘামায়, একের পর এক ডাক্তার দেখিয়ে যায়।

একদিন সে এক ডাক্তারবাবুকে বললো, 'ডাক্তারবাবু, আমি অসুখ নিয়ে চিন্তা করতে করতে পাগল হয়ে গেলাম। একেক সময় মনে হয় নিজেকে খুন করে ফেলি।'

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'দয়া করে এ ব্যাপারটা আমার উপরে ছেড়ে দিন।'

রোগী কাহিনীর শেষ গল্পে ডাক্তারবাবুই বলতে গেলে রোগী। তিনি তাঁর নতুন মডেলের হালফ্যাশনের গাড়ি কেনার পরেই খারাপ হয়ে যাওয়ায় গ্যারেজে সারাতে দিয়েছেন। সারানোর পর মিস্ত্রি যা বিল করলেন সেটা আগের পুরনো গাড়ির দ্বিগুণ। ডাক্তারবাবু কপালে চোখ তুলে বললেন, 'এত ?'

সুরসিক মিস্ত্রি বললেন, 'দেখুন ডাক্তারবাবু, আমাদের কাজ তো আর আপনাদের মত নয়, সেই আদ্যিকালের পুরনো চেনা মডেল নিয়ে আপনাদের কারবার। আর আমাদের দিন-দিন নতুন মডেল, নতুন ঝামেলা। পয়সা তো কিছু বেশি লাগবেই।'

নরখাদকের কাহিনী

নরখাদক বিষয়ে আর বিশেষ কিছু লেখার নেই। পৃথিবী থেকে নরখাদকেরা হয়তো চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আফ্রিকার কোনো গহনতম অরণ্যে কিংবা ভারত বা প্রশান্ত মহাসাগরের প্রক্ষিপ্ত কোনো অন্ধকার দ্বীপে কোনো কোনো মানব সম্প্রদায় আছে যারা একদা হয়তো মানুষ খেতো কিন্তু এখনো খায়, এ বিষয়ে প্রামাণ্য কোনো সংবাদ জানা নেই।

রামায়ণ নর-বানরের সঙ্গে নরখাদক-রাক্ষসদের যুদ্ধের কাহিনী। মহাভারতেও রাক্ষসের কথা আছে। মহাবলী মধ্যম পাণ্ডব ভীম এবং রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ নিজেও মহাবীর ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহারথী প্রবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ পাণ্ডবদের পক্ষে লড়াই করে কৌরবপক্ষকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ঘটোৎকচের সঙ্গে মহাসমরে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। অবশেষে কৌরবপক্ষীয়, মহাপরাক্রম, অসমসাহসী বীর অলম্বুষ রাক্ষসকে যখন ঘটোৎকচ নিহত করলেন তখন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অর্জুনকে হত্যা করার জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত একাঘ্নী বাণ ব্যবহার করে কর্ণ ঘটোৎকচকে হত্যা করেন।

এই একাঘ্নী বাণ কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে রেখেছিলেন, দুর্যোধনের অনুরোধে বিশেষ প্রয়োজনে যখন কর্ণ এই বাণ ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে নিয়োগ করলেন তখনই তিনি

বুঝেছিলেন অর্জুনকে পরাজিত করা তাঁর দ্বারা আর সম্ভব হবে না।

ঘটোৎকচ-ভীম-হিড়িম্বা কাহিনী মহাভারতের ঘরে ঘরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুপরিচিত। চিরদিনের পিতামহীদের ঘুমপাড়ানি গল্পে হিড়িম্বা-ঘটোৎকচ বারবার ফিরে ফিরে এসেছে।

ভীম-হিড়িম্বা বিষয়ে একটি অসম্ভব অমহাভারতীয় গল্প লিখেছিলেন অবিস্মরণীয় পরশুরাম। 'পুনর্মিলন' নামে মাত্র আড়াইশো শব্দের সেই অতি ক্ষুদ্র আয়তনের গল্পটি 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' নামক সংগ্রহে প্রায় সকলেরই নিশ্চয় পড়া।

তবু নরখাদক সূত্রে গল্পটি আরেকবার স্মরণীয়। মৃগয়া করতে গিয়ে মধ্যম পাণ্ডব পাণ্ডবদের থেকে দলভ্রষ্ট হয়ে বনের মধ্যে এক তরুণ রাক্ষসের হাতে পড়েন। সে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় তার মার কাছে; সেই রাক্ষসী মা ব্রত করে উপোস করে আছে, ছেলেকে বলেছে একটি হৃষ্টপুষ্ট মানুষ নিয়ে আসতে ব্রত শেষ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্যে।

ছেলে ভীমকে ধরে নিয়ে যেতে ভীম শুনলেন রাক্ষসী দাসীকে আদেশ দিচ্ছে, 'মনুষ্যটিকে বড় বড় করিয়া কর্তন কর।....বক্ষস্থল ও বাহুদ্বয় ছেলের জন্য রাখিও, পদদ্বয় তোমার, মুণ্ডটি আমি খাইব।'

বলা বাহুল্য, এই রাক্ষসীই হিড়িম্বা এবং পুত্রটি ঘটোৎকচ। সুখের কথা দাসী কর্তন করার আগেই রাক্ষসী তার গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ভীমকে দেখে চমকিয়ে যান এবং জিব কেটে বলেন, 'ও মা, আর্যপুত্র যে! ছি ছি লজ্জায় মরি! ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ, প্রণাম কর বেটা।'

* * *

পৌরাণিক নরখাদক থেকে সরস নরখাদকের কাহিনীতে যাই।

বছর কুড়ি বা তারও কিছু আগে নিউইয়র্কের একটি রঙ্গমঞ্চে একটি জনপ্রিয় নাটক হচ্ছিল ক্যানিবাল অর্থাৎ নরখাদকদের নিয়ে। সেই নাটকে একটি মজার গান ছিল, খুব বিখ্যাত হয়েছিল সেই গানটা ঐ সময়। গানটা হল, প্রগতিশীল নরখাদক শিশুরা মানুষের মাংস খেতে আপত্তি জানাচ্ছে। তাদের মা জোর করে তাদের মানুষের মাংস খাওয়াতে চেষ্টা করছে। তারা মোটেই খেতে চাইছে না। কাঁদতে কাঁদতে গাইছে, 'উই শ্যাল নট ইট হিউম্যান বিইংস' (**We shall not eat human beings**) মানে খুব সোজা, 'আমরা মানুষ খাবো না'।

নাটক নয়, আধুনিক নরখাদকদের বিষয়ে একটি কাল্পনিক কাহিনী পড়েছিলাম অনেকদিন আগে একটা ইংরেজি জোক বুকে।

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে এক দুঃসাহসিক সাহেব বিপজ্জনক এলাকায় প্রবেশ করে নরখাদকদের হাতে বন্দী হন। নরখাদকেরা তাকে তাদের গ্রামে নিয়ে যায় এবং একটি গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। তারপর তাদের সর্দারকে খবর দেয়।

নরমুণ্ডের মালা গলায়, মাথায় রক্ত রঙিন পাগড়ি, হাতে ধারালো বল্লম সর্দার এসে বন্দী ভ্রমণকারীকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে টিপে টুপে দেখলেন। তারপর কি একটা ইঙ্গিত করতেই চারদিকে দামামা বেজে উঠলো। নরখাদক পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে যেখানে ছিল ঐ দামামার ডাক শুনে সবাই ছুটে এলো সেই গাছের কাছে, যে গাছে ভ্রমণকারীকে বেঁধে রাখা

হয়েছে।

ভ্রমণকারীর চোখের সামনেই মাটি খুঁড়ে বিরাট উনুন বানানো হলো। শুকনো কাঠ দিয়ে সেই উনুন ধরিয়ে সেই উনুনের ওপরে এক অতিকায় কড়াই চাপানো হলো, তাতে কি একটা তেল ঢালা হলো প্রায় মণ খানেক।

এদিকে উনুনের চারপাশ ঘিরে নরখাদিকারা (নাকি নরখাদকীরা) বড় বড় পাথরের শিলে লোভনীয় গন্ধময় নানারকম বন্য মশলা নোড়া দিয়ে পিষতে লাগলো। বন্দী পর্যটক স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে এ সবই হচ্ছে তাঁকে রান্না করার পূর্বপ্রস্তুতি। মশলার গন্ধে তাঁর জিভে জল এসে গিয়েছিল, তাছাড়া তিনি যথেষ্ট ক্ষুধার্তও ছিলেন, কিন্তু নিজের মাংস খাওয়ার কারণে নিজের জিভে জল আসা অসঙ্গত হবে এই ভেবে তিনি লালা সংবরণ করলেন। তাছাড়া, আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার ; মশলা বাটা প্রায় শেষ, উনুনের কড়ায় তেল প্রায় উত্তপ্ত হয়ে এসেছে। আর একটু পরেই এ জন্মের মতো খেলা শেষ।

ঠিক সেই মুহূর্তে সর্দারিও বললেন, 'খেলা শেষ'।

কিন্তু বন্দী পর্যটক সবিস্ময়ে শুনলেন সর্দার বললেন, 'দি এন্ড' (The end)। 'খেলা শেষ', 'তামাম সুদ' না বলে পরিচ্ছন্ন ইংরেজি উচ্চারণে এরকম কথা বলায় পর্যটক চমকিয়ে গেলেন। কিন্তু চমকের তখনও কিছু বাকি ছিল। সর্দার খাঁটি ইংরেজিতে বন্দীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মৃত্যুর আগে তোমার শেষ ইচ্ছা কি ?'

পরিষ্কার উচ্চারণে এমন একটি সভ্য প্রশ্ন শুনে পর্যটক মহোদয় বীরের মত বললেন, 'স্যার, আপনার অনুমতি পেলে আমি একটা সিগারেট খেতাম।'

অনুমতি পেতে দেরি হলো না। গাছের সঙ্গে দড়ির বাঁধন থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে খুলে দেয়া হলো। পর্যটকের পকেটেই সিগারেট ও লাইটার ছিল। তিনি একটা সিগারেট বার করে লাইটার জ্বালিয়ে ধরালেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটল লাইটার জ্বালানো মাত্র। সর্দার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে কি যেন বললেন। মশলা বাটা থেমে গেল। উনুন থেকে কড়াই নামিয়ে ফেলা হলো। বোঝা গেল পর্যটককে খাওয়া হচ্ছে না। পর্যটক ভাবলেন এই অসভ্যেরা বোধহয় কোনদিন লাইটার দেখেনি, তাই ভয় পেয়ে গিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। যেমন সাহেবি বুদ্ধি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাইটার ক্লিক, ক্লিক করে জ্বালিয়ে নরখাদকদের ভয় দেখিয়ে সব লুঠপাট করার চেষ্টা করলেন। তখন সর্দার তাঁর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'ওরে হতভাগা, তুই ভেবেছিস লাইটার দেখে আমরা ভয় পেয়েছি। তোর মত লাইটারওলা সাহেব আমরা হাজার হাজার খেয়েছি। আমরা ঠিক করেছিলাম, কেউ যদি একবারে লাইটার জ্বালাতে পারে তাকে খাবো না, তাই তোকে ছেড়ে দিচ্ছি'। অতঃপর একটা লাথি মেরে সে পর্যটককে তাড়িয়ে দিলো।

পুনশ্চঃ নরখাদকীয় পুনশ্চে এবার দুটি ছোট গল্প :—

ক) ভদ্রমহিলারা কখনও সত্যি বয়েস বলেন না। নরখাদকদের হাতে বন্দিনী স্থির-চল্লিশ এক মহিলা যখন জানতে পারলেন যে এরা পঞ্চাশোর্ধ কোনো ব্যক্তির মাংস খায় না, তিনি কবুল করলেন যে তাঁর বয়েস বাহান্ন।

খ) এক নরখাদক শিশু আকাশে এরোপ্লেন দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা, ওটা কি ?' মা বলেছিলেন, 'ওটা কাঁকড়া বা চিংড়িমাছের মত, খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের জিনিসটা খেতে হয়।'

আয় শীত, যায় শীত

বহুদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শীত পড়ে আমাদের টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী বয়েজ হাই ইংলিশ স্কুলের পিছনের পার্কে। অতি নাবালক বয়েসে সেই পার্কের প্যান্ডেল থেকে মাঘ মাসের মধ্য রাত্রে যাত্রা দেখে বাড়ি ফেরার পথে ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর উত্তুরে হাওয়ায় হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা—এটাই ছিল আমার মনে শীতলতম স্মৃতি।

এর পরে এই সামান্য জীবনে নানা জায়গায় গিয়েছি এবং স্পষ্টই হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় টের পেয়েছি শীত কাকে বলে।

আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলো যেমন বন্যার খবর নিয়ে মাতামাতি করে মাঝে-মধ্যেই লিখে দেয় এটাই স্মরণকালের মধ্যে চরমতম বন্যা কিংবা এত বড় বন্যা গত পঞ্চাশ বছরে হয়নি, তেমনিই মার্কিন দেশের কাগজগুলো শীত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে।

এই তুষারতাড়িত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মধ্য জানুয়ারির ভরা শীতে আমি পৌঁছেছিলাম মার্কিন দেশে। ওয়াশিংটন শহরের এক হোটেলের কাচের জানলা দিয়ে জীবনে প্রথম বরফ পড়া দেখলাম। ঠিক বুঝতে পারিনি, ছেঁড়া তুলোর মত বাতাসে হালকা ভেসে যাচ্ছে বরফের আঁশ। রাত তখন প্রায় দশটা। সেই সময় আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে ফোন করলেন। তিনি থাকেন ওয়াশিংটন থেকে বেশ কিছু দূরে। একথা সেকথার পর আমি তাঁকে বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে, বাইরে বরফ পড়ছে'!

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক খুবই অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'রেডিয়ো, টিভি, খবরের কাগজ কোথাও বরফের কথা লেখেনি। আপনি বলছেন বরফ পড়ছে। তারপর আমাকে বললেন, 'আপনি ত আগে কখনো বোধহয় তুষারপাত দেখেননি' ? আমি সবিনয়ে আমার অভিজ্ঞতার অভাবের কথা স্বীকার করলাম। তখন ঐ ভদ্রলোক আমাকে কাচের জানলার বাইরে যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি তার বর্ণনা করতে বললেন। আমি বর্ণনা করতে যাচ্ছি সেই মুহূর্তে তিনি বললেন, 'আপনি ঠিকই দেখেছেন'। এই মাত্র দশটার খবরে বলল ওয়াশিংটনে বরফ পড়ছে। আমাদের এখানেও হয়ত আরো রাতের দিকে পড়বে।

তবে ওয়াশিংটনে নয়, আসল শীতের ঝড় পেয়েছিলাম ওয়াশিংটন থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে নিউইয়র্কে। সেই ঠাণ্ডা বর্ণনায় আমি যাব না, শুধু মনে আছে মার্কিনি খবরের কাগজগুলো সেই রবিবারে প্রথম পৃষ্ঠায় ঘোষণা করেছিল, 'শতাব্দীর শীতলতম সপ্তাহ'।

আমরা গরমের দেশের লোক। শীতলতার কথা খুব বেশি জানি না। সুতরাং শীত নিয়ে দু-একটা উষ্ণ কাহিনী বলি।

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবের এক হিমশীতল রাতে পূর্বপল্লীর ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে আমার পাশের খাটে ছিলেন এক অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সেদিন রাতে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা পড়েছিল। বিশেষ করে মেলার ভিড়ের উত্তাপ থেকে দোতলার সেই ঘরে এসে দারুণ শীত করছিল। রাতে কম্বলের নীচে শুয়েও ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম, দাঁতে দাঁত জোড়া লেগে গিয়েছিল। পরদিন ভোরবেলা রোদ্দুরে বসে তাপ পোয়াতে পোয়াতে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম। 'কাল কেমন ঠাণ্ডা বুঝলেন।' বৃদ্ধ বললেন, 'ভয়ানক'।

আমি বললাম, 'আমি কম্বলের নীচে ঠক ঠক করে কেঁপেছি, দাঁতে দাঁত জোড়া লেগে গিয়েছিল।' বৃদ্ধ স্বীকার করলেন, 'তিনিও খুব কেঁপেছেন। তবে দাঁতে দাঁতে জোড়া লাগেনি বা ঠক ঠক করেনি।'

এই ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যে আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে তিনি হেসে বললেন, 'কারণ আমার দাঁত জোড়া মুখ থেকে খুলে কানের মধ্যে রেখেছিলাম। আমার ত বাঁধানো দাঁত'। এই গল্প যদি কোনো বুদ্ধিমানের খুব অবিশ্বাস্য মনে হয়, তবে পরের গল্পটি শুনে তাঁরা কি বলবেন, ঈশ্বর জানেন।

এ গল্প শুনেছিলাম হিমালয় অভিযাত্রী-দলের এক দুঃসাহসিকা মহিলার মুখে। গঙ্গোত্রীর পাহাড় চূড়ার তাঁবুতে বরফ ও বাতাস ভরা রাত্রিতে অভিযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা বলতেন তা মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে শব্দ হয়ে বেরোত না, বরফের জমাট টুকরো হয়ে বেরত। কে কি বলেছে সেটা জানার জন্যে পরের দিন সকালে ডেকচিতে স্টোভের উপর বসিয়ে সেই বরফের টুকরোগুলো গরম করলে কথাগুলো একের পর এক বেরিয়ে আসত যেমন বেরিয়ে আসে ক্যাসেট বা গ্রামোফোনের রেকর্ড থেকে।

শীত নিয়ে যথেষ্ট বাতুলতা হল। অতঃপর কাব্যকথায় যাই। সাধারণ মানুষের ভাল লাগুক অথবা নাই লাগুক, শীত কবিদের প্রিয়তম ঋতু। এই শতাব্দীর বিষণ্ণতম কবি নির্জন শীতের রাতে জানালার ধারে স্থবিরতার অপেক্ষায় প্রদীপ নিবিয়ে বসে থাকার কথা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতার অক্ষরে অক্ষরে শীতের ঝরা পাতার আর হিমবাতাসের শব্দ শোনা যায়। বড় বিষণ্ণ, বড় শীতল সেই অনুভূতি।

আমাদের দেশের শীত তেমন প্রখর নয়। তবুও আমাদের অন্য এক যুগের অন্য এক কবির একটি পংক্তি, 'জাকু, ভানু, কৃশানু শীতের পরিত্রাণ', 'বহুদূরের এক হতভাগিনীর দীর্ঘশ্বাস বয়ে আনে'।

ভিন্ন পৃথিবীর প্রকৃত শীত-ঋতুর দেশের এক অমর মহাকবি কিন্তু তাঁর বিখ্যাত এক নাটকের একটি দুঃখিত গানে শীতের বাতাসকে বইতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'শীতের বাতাস তুমি বও, তুমি বও। মানুষের অকৃতজ্ঞতার মত তুমি নির্দয় নও।'

এই মুহূর্তে এইখানে রবীন্দ্রনাথকেও কি স্মরণ করা উচিত নয়। কিন্তু তাহলে পাতার পর পাতা ভরে নিবন্ধ তার সীমানা ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং আয় শীত যায় শীত। কলকাতার শীত আসে আর এসেই চলে যায়। এত সংক্ষিপ্ত তার পরমায়ু কিছুতেই মনে পড়ে না ইংরেজ কবির সেই আশ্বাসের কথা, 'যদি শীত আসে তবে বসন্ত কি দূরে থাকবে?' আমাদের শীত আর বসন্ত একাকার। শীতের পিছনে নয় শীতের সঙ্গে আসে বসন্ত, তাই শীতের শ্রীপঞ্চমী আমাদের বসন্ত পঞ্চমী।

ঘটি-বাঙাল

অর্ধশতাব্দী আগে ধানসিড়ি নদীর তীরের আশ্চর্যতম বাঙাল কবি লিখেছিলেন, 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ?' সে প্রশ্নের ছিলো রোমান্টিক অনুপ্রাস। অন্য অনুষঙ্গে, ভিন্ন প্রসঙ্গের সে এক বেদনাতুর গাথা।

ঘটি-বাঙালের প্রসঙ্গও, দেশ ভাগের চার দশক পরে এখন প্রায় ঐ 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো'র পর্যায়ে চলে গেছে।

আজ আর কে খেয়াল রাখে, কে ঘটি, কে বাঙাল। আগে তো ছিলোই। বিশেষ করে পার্টিশনের পরে পরে যখন একের পর এক জনস্রোতের ধাক্কা, উদ্বাস্তু প্রবাহ এসে পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় আছড়ে পড়লো তখনই তুঙ্গে উঠেছিলো ঘটি-বাঙালের বাদ বিসম্বাদ। পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাচীন জনপদে বহুদিন আগে থেকেই একটা করে বাঙালপাড়া ছিলো। যেখানে সাধারণত পূর্ববঙ্গের লোকেরাই বসবাস করতো। কিন্তু উনিশশো সাতচল্লিশে সেই অসম্ভব দেশ ভাগের পর আর সামান্য বাঙাল পাড়ায় কুলোলো না। তরাই থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত যেখানেই কোনোক্রমে বাসযোগ্য জমি পাওয়া বা দখল করা সম্ভব হলো সেখানেই গড়ে উঠলো উদ্বাস্তু উপনিবেশ, কোথাও তার নাম কলোনি, কোথাও গড় বা নগর, যথা আজাদ কলোনি, আজাদগড় বা আজাদ নগর।

বাঙাল-ঘটির সংঘাতের দিন বহুকাল হলো বিদায় নিয়েছে। ভঙ্গবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে গা

ঘেঁষা-ঘেঁষি করে চল্লিশ বছর বসবাস করে যে যার স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। সব বাড়িতেই এখন পোস্ত রান্না হয়। সেটা আর পশ্চিমবঙ্গীয় বা রাঢ় দেশিয়দের একচেটিয়া নয়। রান্নায় ঝাল বেশি হলে এখন আর কেউ কাউকে বাঙাল বলে সন্দেহ করে না। খবরের কাগজে 'পূর্ববঙ্গীয় পাত্রী চাই' কিংবা 'পশ্চিমবঙ্গীয় ভাড়াটিয়া বাঞ্ছনীয়' এ ধরনের বিজ্ঞাপন ক্রমশই বিরল হয়ে আসছে।

পার্টিশনের পরে বাঙাল-ঘটির বিবাদ যতটা প্রখর হয়েছিলো, ঠিক ততটাই স্তিমিত হয়ে গেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। এখন আর সীমান্ত পেরিয়ে বাঙালেরা কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে আসে না, যারা আসে তারা বাঙাল নয়, তারা বাংলাদেশি। সে সব বাঙাল কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যাদের নিয়ে হাসির গান গাওয়া হতো।

'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা
আমি ঢাকার বাঙাল নই।'

বলা বাহুল্য, ঢাকার বাঙালই ছিলো, কুলীন শ্রেষ্ঠ বাঙাল কুল তিলক যাকে বলে কাঠ বাঙাল। তার হাবভাব, উচ্চারণ-আচরণ, অশন-ব্যসন সবই ছিলো উঁচু তারে বাঁধা। গঙ্গার এই তীরের বহু শতাব্দীর মার্জিত নাগরিকতার সঙ্গে তার ছিলো বিস্তর ফারাক।

★ ★ ★

বাঙাল-ঘটির আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আমার তেমন কৌতুক বোধ হচ্ছে না।

এই আলোচনা করার অধিকার আমার জন্মগত। আমিও এক সাবেকি বাঙাল। পনেরো বছর বয়েসে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি। তারপর ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে কবে এই নগর সভ্যতায় বিলীন হয়ে গেছি।

আমরা পূর্ববঙ্গীয় হলেও, সে মাত্র তিনশো বছরের ব্যাপার। মোঘল রাজত্বের মধ্যকালে বারো ভূঁইএ্যাদের সঙ্গে দিল্লিশ্বরের মারামারির যুগে নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদে আমরা পদ্মা-যমুনা-ধলেশ্বরী পেরিয়ে পালিয়ে যাই, যশোহরের কালিয়া পরগনা থেকে উত্তর মধ্যবঙ্গের আটিয়া পরগনায়।

এখনকার যশোহর বাংলাদেশের মধ্যে হলেও সেটা কখনো বাঙালের এলাকা ছিলো না। তখন তো নয়ই। কাপুরুষের মতো আমরা বাঙাল দেশে প্রবেশ করেছিলাম এবং আবার তিনশো বছর পরে কাপুরুষের মতো সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।

আমি নিজে বিয়ে করেছি খাঁটি পশ্চিমবঙ্গে। বারেন্দ্র বংশীয় বলে আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বহুকাল ধরে বাঙাল ও ঘটি দুইই আছে। দুই সমাজের সমস্ত দোষগুণ আমাদের পারিবারিক রক্তে ও চরিত্রে মিলে আছে। এখনো যখন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানে খেলা হয় আমরা কোনটা আমাদের দল ধরতে পারি না, ফলে যখন যে জেতে তারই পক্ষে চলে যাই। খেলা ড্র হলে দু'পক্ষকেই সমান গাল দিই।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের কথায় অন্য একটা কথা মনে পড়ছে, নিতান্ত দুঃখের কথা। এই দুই ফুটবল টিম যেমন বাঙাল-ঘটির প্রতীক, তেমনিই ইলিশ আর চিংড়ি এই দুই মাছ। দু'টি মাছই আরও অনেকের মতো আমার ঠিক সমান প্রিয়। আজকের এই অগ্নিমূল্যের দিনে যখন বাজারে গিয়ে এই দু'টি মাছের স্টল থেকে সমদূরত্বে থাকি, বারবার মনে পড়ে যায়, চল্লিশের-পঞ্চাশের কলকাতার কথা।

বাঙাল-ঘটির সেই মান অভিমান, চুলোচুলি, বাদবিসম্বাদের স্মরণীয় যুগে পুরো ব্যাপারটা কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো ইস্টবেঙ্গল-ইলিশ মাছ বনাম মোহনবাগান-চিংড়ি মাছ সংগ্রামে। সেই রেষারেষির মধ্যে কোথায় ছিলো একটা কৌতুকের আভাস, পুরোটা দমবন্ধ ব্যাপার ছিলো না।

সেদিনের বাংলা সাহিত্যের রথী মহারথীরা মায় তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলিতো বটেই বাঙাল-ঘটি নিয়ে লিখেছেন। আর সেই উদ্বাস্তু শিবিরে লোভী ভূতের মাছ ভাজা খাওয়ার চেষ্টা, বাঙালদের হাতে ভূতের নির্যাতন ও পলায়ন—শিবরাম চক্রবর্তীর সেই মর্মান্তিক গল্প পাঠ করে অনেক বাঙালই সেদিন হাসেননি।

এরও বহু আগে লেখা হয়েছিলো,

'বাঙাল মনুষ্য নয়,
উড়ে এক জন্তু।
লাফ দিয়া গাছে ওঠে
হাত নেই কিন্তু॥'

কিন্তু সর্বাধিক মর্মান্তিক গল্পটি লিখেছিলেন, বাঙাল-ঘটির চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের বহুকাল আগে বাংলা সরস রচনার পিতামহ প্রতিম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পুরনো গ্রন্থাবলী সিরিজের ত্রৈলোক্যনাথ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম কাহিনীটির নামই হলো 'বাঙাল নিধিরাম।'

বিসূচিকা রোগগ্রস্ত বাঙাল নিধিরাম মুমূর্ষু-অবস্থায় গঙ্গা তীরে শুয়ে ছটফট করছেন। বেলা দশটা, প্রচণ্ড সূর্য কিরণে জগৎ অগ্নিময়, নিধিরামের প্রাণ তবুও বাহির হয় না।

দু'জন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফেরার পথে কণ্ঠাগত প্রাণ নিধিরামকে দেখতে পেলেন। নিধিরাম তাঁদের বললেন, 'তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, যদি মুখে একটু জল দেন।'

বৃদ্ধরা জল দেওয়ার পরিবর্তে নিধিরামকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'মহাশয়ের নিবাস', 'মহাশয়ের নাম' ইত্যাদি মামুলি কথা, সে সব প্রশ্ন কোনো মৃত্যু পথযাত্রীকে করা যায় না। সে যা হোক অবশেষে তাঁরা নিধিরামের কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনার ব্যাতোন (বেতন)?'

নিধিরাম তখন বললেন, 'আমি চাকরি করি না আমার বেতন নাই, যান আপনারা বাড়ি যান। আমার জলে কাজ নাই।'

গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলায় সেদিন বাঙাল নিধিরামের যে বিপর্যয় হয়েছিলো, সেই দুর্ভোগের যুগ অবশ্য এখন আর নেই। বাঙাল-ঘটি মিলে মিশে প্রায় একাকার হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী নতুন প্রজন্মের বাঙালেরা প্রথম ধাক্কায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সন্তানেরা এখন অন্য প্রজন্মমুখী। তাদের কাছে এ দুয়ের পার্থক্য হাস্যকর।

হাস্যকর হোক যাই হোক, বাঙাল-ঘটি বাদ বিসম্বাদের পালায় শেষ যবনিকা নেমে আসার আগে এটুকু স্মরণে রাখা ভালো যে, এই কলহে যতটা মান অভিমান ছিলো ততটা তিক্ততা ছিলো না, যতটা রেষারেষি ছিলো ততটাই হাসাহাসি ছিলো ; অনেকটা শুকসারী গানের মতো এ বলে আমার এই ভালো তোমার ঐ খারাপ, সেও বলে আমার এই ভালো তোমার ঐ খারাপ।

ফেরিওয়ালা

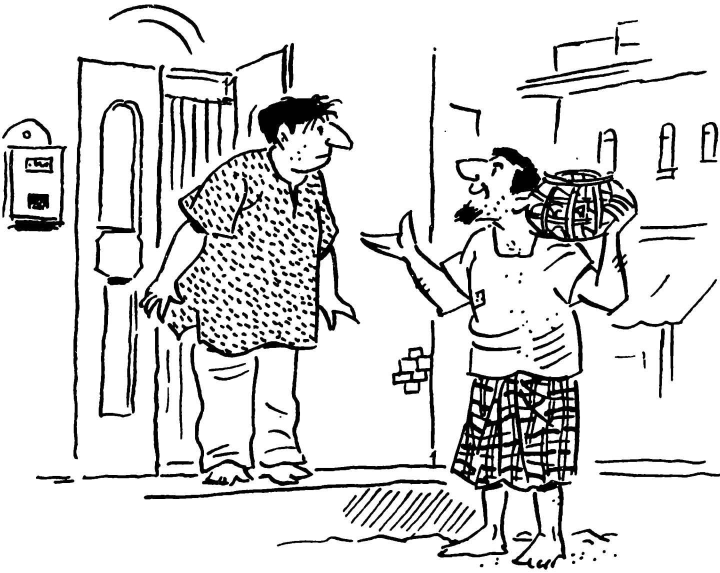

আমি যখন পণ্ডিতিয়ার বাড়িতে প্রথম আসি, খুব ভোরের দিকে প্রায় চারটে-সাড়ে চারটের সময় একজন লোক আমার দরজায় দাঁড়িয়ে 'ভীম, ভীম' বলে কাকে যেন ডাকতো। আমরা সাধারণত অনেক রাতে শুই। শোয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অর্থাৎ চারটে-সাড়ে চারটে আমাদের মধ্যরাত্রি। এই সময় কেউ যদি কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে এই রকমভাবে প্রতিদিন ভীম নামে একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোককে আমার বাড়িতেই খোঁজে, সেটা ভীষণ বিরক্তিকর।

তবে একটা সুখের কথা এই যে, লোকটা কড়া-নাড়া বা দরজা ধাক্কাধাক্কি এই সব পরবর্তী কার্যক্রমে উৎসাহী বা বিশ্বাসী নয়। ফলে একটু বাদেই কয়েকবার ভীমকে ডাকবার পরই ধীরে-সুস্থে চলে যায়। তবুও প্রতিদিনই শেষ রাতে এই একই উৎপাত। বাধ্য হয়ে একদিন উঠে দরজা খুলে দাঁড়ালাম। দেখি রোগামতন একজন লোক গেঞ্জি গায়ে, লুঙ্গি পরা, হাতে একটা তারের ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললাম, 'কি চাই ? এখানে ভীম নামে কেউ থাকে না।'

লোকটা আমাকে দেখে একটু ইতস্তত করছিলো। তারপরে একটু সামলিয়ে নিয়ে যা বুঝিয়ে বললো তার মানে দাঁড়ায়, ভীম নামে কোনো লোককে সে খুঁজছে না, আসলে সে ডিম বেচে। তার নিজের মুরগীর সদ্যপ্রসূত ডিম নিয়ে সে এই শেষ রাতে কয়েকজন বাঁধা

খদ্দেরকে পৌঁছে দেয়, এবং দরজায় কড়া না নেড়ে বা অন্যভাবে উৎপাত না করে 'ডিম-ডিম' করে জানান দেয়। বন্ধ ঘরের মধ্যে সেই কথাটাই আমাদের কানে 'ভীম, ভীম' বলে মনে হয়েছে। আমাদের বাড়ির পূর্বতন বাসিন্দা তার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন, সে আশা করছে আমরাও টাটকা ডিম হাতের কাছে নিয়মিত পাওয়ার এই সুযোগ ছাড়বো না।

আমি তাকে বললাম, এমন টাটকা ডিম এত সহজে সংগ্রহ করতে পারলে আমরা অবশ্যই খুশি হতাম, কিন্তু এই শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে উঠে প্রতিদিন ডিম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। লোকটা কেমন যেন নিরাশ হয়ে চলে গেলো।

ডিমওয়ালার কাছ থেকে অতি সহজে পরিত্রাণ পেলাম বটে, কিন্তু এ পাড়ায় আসার দু-চারদিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা ফেরিওয়ালাদের স্বর্গরাজ্যে এসে পৌঁছেছি।

প্রথমে খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের কথাই ধরা যাক। হাওয়া-মিঠাই অর্থাৎ বুড়ির চুল নামে আমাদের ছোটবেলার সেই অতি লোভনীয় এবং রহস্যময়ভাবে বায়বীয় খাবার যে এখনো পৃথিবীতে রয়েছে সেটা জানার অব্যবহিত পরই রাস্তা দিয়ে একসঙ্গে প্রায় একই রকম কর্কশ কণ্ঠে তীব্র প্রতিযোগিতা করতে করতে চলে গেলো কলকাতার ফুচকাওয়ালা এবং খাস বোম্বের ভেলপুরীওয়ালা। ভেলপুরী জিনিসটা আমাদের শৈশবে দেখিনি, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে, যখন বাড়িতে কেউ ছিলো না, জানলার আড়াল থেকে ভেলপুরীওয়ালাকে ডেকে পঞ্চাশ পয়সার ঐ ভেলপুরী কিনে খেয়ে দেখলুম, অপূর্ব।

শুধু ফুচকাওয়ালা বা ভেলপুরীওয়ালা নয়, প্রতিদিন বিকেলে পর্যায়ক্রমে তিনজন

সন্দেশওলা আসে এ পাড়ায়, তিনজনের তিনরকম বৈচিত্র্য। ক্ষীরের সন্দেশ, নারকেলের সন্দেশ এবং আইসক্রিম সন্দেশ। ক্ষীরের সন্দেশওলা ঐ জিনিস ছাড়াও শোনপাপড়ি বেচে।

আইসক্রিম বা চানাচুরের বা ঝালমুড়ির ফেরিওলা সর্বত্রই আছে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না, গভীর রাতে একটা লোক 'রুটি-আলুর দম', 'রুটি-আলুর দম' হেঁকে যায়। আমার সহধর্মিণীর ধারণা লোকটা এই খাদ্য-সমাহারের বিক্রেতা নয়, কোথাও খেয়ে প্রাণের আনন্দে ঐ রকম চেঁচাতে চেঁচাতে ফেরে। তিনি নাকি দেখেছেন লোকটা খালি হাতে যায়। আমি অবশ্য দেখিনি, ঘুমের ঘোরে কখনো কখনো তার চীৎকার শুনেছি। কোনোদিন যদি অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

গভীরতর রাতে একেবারে স্বপ্নের মধ্যে ডাক শুনতে পাই টাকায় তিনটে পাতিলেবুওলা, অথবা দার্জিলিং-এর ফুলকপির। যথাঋতুতে সজনে ডাঁটাওলা এবং কুমড়োফুলওয়ালা এই রকম গভীর রাতে অনিবার্য পথপরিক্রমায় বের হয়ে পড়ে। স্বপ্নের মধ্যেই তাদের কণ্ঠের রেশ ক্রমশ দূরদিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। একেক দিন সকালবেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠে ভাবি, ঐ নিঝুম নিশীথকালে কারা পাতিলেবু কেনে, কারা কেনে কুমড়োফুল ; কেন কেনে ?

তাই বলে বেলফুলওয়ালা বা ধূপওয়ালা যে নেই, তাও নয়, তারাও আছে। আছে এক অবাঙালি মালি সে কেন যে নৃত্য-গীত সহযোগে কপাল চাপড়িয়ে পাতাবাহার আর মরসুমী ফুল বেচে, ঈশ্বর জানেন। তার হয়তো সত্যিই মাথা খারাপ। কিন্তু যে লোকটা প্রতিদিন পুরানো গ্রামোফোন আর দেয়ালঘড়ি কিনতে আসে তারো কি মাথাখারাপ। তার উদ্দেশ্য কি ? প্রতিদিনই এত পুরানো গ্রামোফোন আর দেয়ালঘড়ি কারা বেচে ?

আর একজন আছেন অতি শৌখিন প্রকৃতির। তাঁকে আপনি করেই বলছি। তাঁর চোখে সুরমা, গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি, তিনি শুধু পুরানো বেনারসী শাড়ির পাড় কেনেন।

সেদিন কুকুরের বাচ্চা বেচতে এসেছিলো একটা লোক, কি বুঝে পাড়ার কুকুরেরা তাকে কামড়ে দিয়েছে। তার আগে তারা কামড়িয়েছিলো এক ভ্রাম্যমান্ জ্যোতিষীকে, তাঁর হাতের সামুদ্রিক বিদ্যার বইটিকে কুকুরেরা কেড়ে নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলো।

এখন এই কুকুরেরাই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু তারা কেন যে অন্য ফেরিওলাদের এমন কি বিচিত্রদর্শন হিং-বিক্রেতাকে পর্যন্ত কিছু বলে না সে এক রহস্য।

চিড়িয়াখানায়

আমার এই অতি হাস্যকর লেখক-জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ঘটেছিল চিড়িয়াখানায়। ঘটনাটা অনেক সময় হাসতে হাসতে অনেককে বলেছি, তবে কখনও লিখিনি। এখনও লিখতে একটু সঙ্কোচ হচ্ছে, একটু আত্মপ্রচারের মত হয়ে যাচ্ছে। তবু লিখছি, বুদ্ধিমান পাঠক ও বুদ্ধিমতী পাঠিকা দয়া করে লক্ষ্য করবেন নেহাত মজার গল্পের খাতিরেই ঘটনাটা লিখছি, আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

ষোল-সতের বছর আগেকার কথা। সেটা উনিশশ একাত্তর সাল। বাংলাদেশ যুদ্ধের বছর। আমার নিজের লোকেরা সব দেশ থেকে শূন্য হাতে কপর্দকহীন অবস্থায় কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। রীতিমত উদ্বেগ ও আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন যাচ্ছে। ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হল, বাবা-মা এবং আর সবাই বাড়ি ফিরল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

স্পষ্ট মনে আছে তারিখটা, নববর্ষের সকাল, বাহাত্তর সালের পয়লা জানুয়ারি। ডোডো আর তাতাইকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেছি। তাতাই আমার ছেলে, ডোডো তার বন্ধু। সেই সময়ে আমি সোমবারের আনন্দবাজারের আনন্দমেলার পাতায় সপ্তাহে সপ্তাহে ধারাবাহিক 'ডোডো-তাতাই' লিখছি।

এই সব দিনে যেমন হয়, সেদিন চিড়িয়াখানায় ভয়াবহ ভিড়। শোনা যায় এই সব ছুটির

দিনে বিশেষত শীতকালে চিড়িয়াখানায় লক্ষাধিক লোক হয়। এক লক্ষ লোক অবশ্য এক সঙ্গে ঢোকে না। সারাদিন ধরে লম্বা লম্বা লাইন দিয়ে ঢোকে। তবে কোন কোন সময় অন্তত হাজার পঞ্চাশেক লোক চিড়িয়াখানার ভিতরে থাকে। তার মানেই গাদাগাদা মানুষ, গিজগিজে ভিড়।

ঐ ভিড়ের মধ্যে বার বার ডোডো-তাতাই চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা খুবই ছোট, বড় জোর পাঁচ-ছয় বছর বয়েস। চিড়িয়াখানার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে যেখানে গণ্ডারের খন্দ রয়েছে সেই খন্দের রেলিংয়ের এপাশে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি ডোডো-তাতাইকে সাপের ঘর দেখতে পাঠালাম, সেখানে বিরাট লাইন দেখে আমি আর নিজে ঢুকলাম না। অনেকক্ষণ পরে ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দিক ভুল করে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম তার বিপরীত দিকে হন-হন করে রওনা হল। আমি 'ডোডো-তাতাই, এই ডোডো-তাতাই' বলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম।

আমার সামনে দিয়ে একদল লোক যাচ্ছিল, পরনে ধুতি-শার্ট, গায়ে র‍্যাপার মফস্বলের লোক, কথার টান দেখে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ বলে মনে হল। তারা আমার মুখে 'ডোডো-তাতাই' ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল, ততক্ষণে ডোডো-তাতাই ছুটে আমার কাছে চলে এসেছে। ওরা বুঝতে পারল, এই দুজনের নাম ডোডো আর তাতাই। দলের মধ্যে একজন লোক বাচ্চা দুটোকে ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর আমার প্রতি কটাক্ষপাত করে আমাকে শুনিয়ে বেশ জোরে জোরে বলল, 'শালা, আদেখলে, খবরের কাগজ দেখে ছেলেদের নাম রেখেছে।'

বলা বাহুল্য এই মন্তব্যে আমি সেদিন যথেষ্টই গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম এবং আমার রচনার এরকম স্বীকৃতি পাব কখনই আশা করিনি।

এই একটি ঘটনা ছাড়া চিড়িয়াখানা-জনিত আমার বাকি যা কিছু স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা তা খুব মধুর নয়। বানরের খাঁচার গায়ে খুব ছোট ছোট অক্ষরে কি একটা জটিল লেখা ছিল,

সেটা কাছে গিয়ে ভাল করে পড়তে যাচ্ছি, শিকের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা পাজি বানর আমার চোখ থেকে চশমাটা কেড়ে নেয়। তখন জেনেছিলাম, নোটিসটিতে অতি ক্ষুদ্র হরফে যা লেখা আছে তার মর্ম হল :—

'পাজি বানর আছে।
খাঁচার নিকটে আসিবেন না।'

এছাড়া অনেক আগে একবার ছোলা খাওয়াতে গিয়ে একটা কালো রাজহাঁস আমার হাতে ঠুকরে দেয়, অমন দীর্ঘগ্রীবা, ঝলমলে, রাজকীয় সৌন্দর্যময় একটি প্রাণী যে এত হিংস্র হতে পারে তা ভাবাই কঠিন।

শুধু রাজহাঁস কেন, একবার একটা জেব্রাও আমার হাত থেকে খাবার খেতে গিয়ে আচমকা ডানহাতের তর্জনীটা এমন চিবিয়ে দেয় যে একসঙ্গে দশ-পাতার বেশি লিখলেই এখনও আঙুলটা টনটন করে, বেশ ফুলে ওঠে। ফলে এ-জীবনে আমার কোন বড় লেখা, এমনকি পুজোর উপন্যাস পর্যন্ত লেখা হল না। এর জন্য কোনও কোনও পাঠক অবশ্য জেব্রাটিকে প্রভূত ধন্যবাদই দেবেন।

আমি যখন যে শহরেই যাই, খুব অসুবিধা না হলে সেই শহরে একটা চিড়িয়াখানা থাকলে সেখানে একবার যাওয়ার চেষ্টা করি।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানার গা-ঘেঁষেই বিশাল পাহাড়ী খাদ। হরিণের খাঁচার পাশ বরাবর ঢালু খাদ নেমে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি চিড়িয়াখানার এক কর্মচারীকে বলেছিলাম, 'এই খাদে নিশ্চয় মাঝে মাঝে কেউ কেউ পড়ে যায়।' সেই ব্যক্তি ঠোঁট উল্টিয়ে আমাকে জবাব দিয়েছিল, 'মাঝে মাঝে পড়ে না, পড়লে একবারই পড়ে। পাঁচশ ফুট খাদের নিচে মাঝে মাঝে পড়ার সুযোগ কোথায় ?'

বিদেশে আরও গোলমালে পড়েছিলাম। লস এঞ্জেলস শহরে এক মেমসাহেবকে আমি বলেছিলাম যে আমি জু দেখতে চাই। আমার বাঙাল উচ্চারণে 'জু' (Zoo) বোধহয় মেমসাহেবের কানে 'Jew' অর্থাৎ 'ইহুদি' হয়ে গিয়েছিল। তিনি পরপর দুবার যাচাই করলেন সত্যি আমি কী দেখতে চাই। আমি যখন তৃতীয়বারেও 'জু' বললাম, তিনি ধরে নিলেন, আমি নিশ্চয় কোন ইহুদিকে দেখতে চাইছি। তিনি নিজে ইহুদি, দু-পা এগিয়ে একদম আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেন সি মি, আই এ্যাম এ জু (Then see me, I am a Jew)।' ব্যাপারটা বুঝে উঠতে আমার বেশ সময় লেগেছিল।

ডিপ্লোম্যাট

বাংলা নিবন্ধের ইংরেজি নামকরণ নিশ্চয়ই কারো কারো অপছন্দ হবে, হতেই পারে ; কিন্তু ডিপ্লোম্যাট শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ চট করে খুঁজে পাচ্ছি না।

হয়তো কেউ কেউ বলবেন প্রতিশব্দটি হলো কূটনীতিবিদ, কিন্তু ডিপ্লোম্যাট শব্দের মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, ডিপ্লোমেসি শব্দটি যে আবহ রচনা করে কূটনীতিবিদ অথবা কূটনীতিতে সেটা সহজলভ্য নয়।

ইংরেজি ভাষায় ডিপ্লোমেসি শব্দটির একটি বহু প্রচলিত সংজ্ঞা পাওয়া যায়। সংজ্ঞাটি হলো, যখন তুমি লোককে বোঝাতে পারো যে, যে জিনিসটা তুমি পাবে না সেটা তুমি মোটেই চাও না সেই কলাকৌশলের নামই ডিপ্লোমেসি। সংজ্ঞাটি অনুবাদে কেমন ঘুলিয়ে গেল। এর চেয়ে অনেক প্রাঞ্জল হলো ডিপ্লোম্যাট সম্পর্কে ফরাসি চিন্তা।

ফরাসি ভাষায় একটা প্রশ্ন আছে, একজন ভদ্রমহিলার আর একজন ডিপ্লোম্যাটের মধ্যে পার্থক্য কি ?

প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে যত জটিল মনে হচ্ছে তা কিন্তু নয়।

প্রথমে ভদ্রমহিলার প্রসঙ্গে যাই। যদি কোনো ভদ্রমহিলা বলেন 'না'—তার মানে হলো 'হয়তো', তিনি যদি বলেন 'হয়তো' তার মানে হলো 'হ্যাঁ', আর তিনি যদি 'হ্যাঁ' বলেন, তিনি ভদ্রমহিলাই নন।

ডিপ্লোম্যাটের ব্যাপারটা ঠিক এর উলটো। কোনো ডিপ্লোম্যাট যদি বলেন 'হ্যাঁ' তার মানে 'হয়তো'। তিনি যদি বলেন 'হয়তো' তার মানে 'না'। আর তিনি যদি বলেন 'না', তিনি ডিপ্লোম্যাট নন।

এর পরেও যদি ব্যাপারটা স্পষ্ট না হয়ে থাকে তবে ডিপ্লোমেসির একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

জয়, সুজয়, জয়া, সুজয়া—এই রকম চারটি আট-দশ বছরের ছেলেমেয়ে অফিস-অফিস খেলছে। জয় হয়েছে বড়বাবু, সুজয় হয়েছে ক্যাশিয়ার, জয়া টাইপিস্ট, সুজয়া টেলিফোন অপারেটর। জয়দের বাড়ির বাইরের ঘরেই জয়ের বাবার অফিস, সুতরাং অফিসের ব্যাপারটা জয় ভালোই বোঝে।

খেলা ভালোই জমে উঠেছে। বড়বাবু ক্যাশিয়ারের কাছে টাকা চাইছেন, ক্যাশিয়ারবাবু বলছেন, 'সোমবারের আগে হবে না। তহবিলে টাকা নেই।' এরই পাশে একটা মোটা বই টেবিলের ওপর ফেলে টাইপিস্ট জয়া তার ওপরে আঙুল ঠুকে ঠুকে চিঠি টাইপ করে চলেছে আর সুজয় একটা খেলনা টেলিফোন কানে দিয়ে কিছুই না শুনে ক্রমাগত 'রং নাম্বার' বলে যাচ্ছে এবং এরই ফাঁকে দ্রুত দু-হাতে একটি অদৃশ্য উলের বলকে সোয়েটারে পরিণত করছে।

ঠিক এই মুহূর্তে প্রবেশ করলো বিজয়। তার বয়েস সাড়ে চার। বিজয় হলো জয় আর জয়ার খুড়তুতো ভাই, সুজয়, আর সুজয়ার জ্যাঠতুতো ভাই।

অসুবিধে হয়েছে এই অসামান্য প্রহসনে বিজয়ের ভূমিকা নিয়ে। অফিস-অফিস খেলাটি নষ্ট করে দেবার পক্ষে সে যথেষ্ট। কিন্তু তাকে খেলায় না নিলেও সমূহ বিপদ। সে কাঁদাকাটি করে খেলা মাথায় তুলবে, অভিভাবকেরাও হস্তক্ষেপ করবেন।

কিন্তু জয় হলো বর্‌ন ডিপ্লোম্যাট (Born Diplomat) জন্ম-কূটনীতিবিদ। সে নিজের কূটবুদ্ধি দিয়ে তখনই ব্যাপারটার সমাধান করে ফেললো। সে বিজয়কে বললো, 'আমরা অফিস-অফিস খেলছি। তুমি এই অফিসের পিওন। তুমি এখন অফিসে এসো না। তুমি আজ ক্যাজুয়াল লিভ মানে ছুটি নিয়েছো।' ছুটি নিয়ে খুশিমনে বিজয় বিদায় নিলো। আবার অফিস-অফিস খেলা জমে উঠলো।

★ ★ ★

যে গল্পটা লিখবো বলে এই গোলমেলে রচনাটায় হাত দিয়েছি, সেটা কিন্তু পিছিয়ে পড়েছে, স্থান অকুলান হওয়ার আগে সে গল্পটা লিখি।

গল্পটা অবশ্য সরাসরি কূটনীতি বা ডিপ্লোমেসির নয়, কিন্তু অতি সম্প্রতি গল্পটা আমি এই শহরেরই একটি ডিপ্লোমেটিক পার্টিতে শুনেছি। তবে গল্পটা শুনলে বোঝা যাবে এটা ঠিক অকূটনৈতিকও নয়।

একটি শৈলশহরের রাস্তায় পাহাড়ি খাদের ধার দিয়ে চারজন টুরিস্ট চলেছে। এর মধ্যে একজন ভারতীয় সে এসেছে কলকাতা শহর থেকে। আরেকজন আমেরিকান সে এসেছে নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে, তৃতীয় ব্যক্তি রাশিয়ান সে মস্কো নগরীর বাসিন্দা আর শেষজন হলো আফগান সে কাবুল শহরের লোক।

এই চারজন টুরিস্ট একই হোটেলে উঠেছে। সকালে সবাই একসঙ্গে পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা রাস্তার নেড়ি কুকুর, সাহেবরা যাকে মনগ্রেল

(mongrel) বলে, বিনা কারণে ঘেউ ঘেউ করে এদের তাড়া করে এলো।

মুহূর্তের মধ্যে কেউ কিছু বুঝবার আগেই কলকাতার টুরিস্টটি ঐ কুকুরটাকে একটা কিক্‌ করে খাদের অতল গহ্বরের মধ্যে ফেলে দিলো। কুকুরটির করুণ 'কেঁউ কেঁউ' আর্তনাদ ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মহাশূন্যে অন্তর্লীন হলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় অন্য তিন ব্যক্তিই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। রাশিয়ানরা পশুপ্রেমের জন্য বিখ্যাত, সে বললো, 'ছিঃ ছিঃ! এটা কি হলো?' আমেরিকানও রাগ করলো। শুধু আফগানটি গুম হয়ে রইলো।

কলকাতার টুরিস্টটি কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটেই পাত্তা দিলো না। সে স্বভাবোচিত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে জবাব দিলো, 'একটা কুকুর গেছে তো কি হয়েছে? আমাদের কলকাতার রাস্তায় এরকম নেড়ি কুকুর ঢের ঢের আছে।'

কলকাতার লোকটির মুখে এরকম একটা কথা শুনে নিউ ইয়র্কের টুরিস্টটি তাঁর কাঁধের ঝোলা নামিয়ে তার ভেতর থেকে একটা হুইসকির বোতল বার করে আনলো, তারপর বোতলের কর্কটা খুলে নির্জলা হুইসকি এক ঢোক খেয়ে প্রায় পূর্ণ বোতলটি খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

দুর্লভ এবং মহার্ঘ পানীয়ের এই অপচয় দেখে কলকাতার এবং কাবুলের টুরিস্টদ্বয় 'হায় হায়' করে উঠলো। মস্কোর ব্যক্তিটি গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, 'এটা কি হলো?'

আমেরিকানটি দম্ভের সঙ্গে বললো, 'কি আর হলো? হুইসকি ফেলে দিয়েছি। বেশ করেছি। এমন হুইসকি আমাদের দেশে ঢের ঢের আছে।'

আমেরিকানটির এই দাম্ভিক উক্তি শুনে রাশিয়ানটির অহমিকায় বোধহয় আঘাত লাগলো। সেও তার কাঁধ থেকে ঝোলা নামালো এবং তার ভেতর থেকে আস্ত একটা ভদকার বড় সাইজের এক লিটারের বোতল বের করে এক বিন্দু স্পর্শ না করে, ছিপি না খুলে সোজা খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

অবস্থার গতিক দেখে কলকাতার লোকটির তো চোখ কপালে উঠেছে, সে একই প্রশ্ন করলো, 'এটা কি হলো।'

রাশিয়ানটি গম্ভীর হয়ে বললো, 'এক বোতল ভদকা ফেলেছি তাই—কি হয়েছে? এরকম ভদকা আমাদের দেশে ঢের ঢের আছে।'

এর পরেই ঘটলো সবচেয়ে অভাবিত, অসম্ভব ঘটনা। আফগান টুরিস্টটি এতক্ষণ গুম হয়ে ছিলো, সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে রাশিয়ানটিকে খাদের গহন ভিতরে ফেলে দিলো। আর্ত চিৎকার করতে করতে রাশিয়ানটি নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কলকাতার এবং নিউইয়র্কের দুই টুরিস্টই সমস্বরে প্রশ্ন করলো, 'এটা কি হলো?'

আফগানটি বললো, 'একটা রাশিয়ান ফেলে দিয়েছি তো কি হয়েছে। এরকম রাশিয়ান আমাদের দেশে ঢের ঢের আছে।'

গোলমেলে

সেদিন কথায় কথায় এক সুধী পাঠক বললেন, 'মহাভারত একেক সময় খুব গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু করুন।'

যাঁরা মনে করেন যে মহাভারতের কোনো সুধী পাঠক থাকতে পারে না, এ বক্তব্য অবশ্যই তাঁদের জন্যে নয়। তাঁদের জন্যে এবং সেই উপরোক্ত ঐ সুধী পাঠকের জন্যে এবারের এই গোলমেলে নিবন্ধ লিখছি।

গোলমাল শুরু করা যাক বাড়ির সদর দরজা থেকে।

সেদিন এক পুরনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক আগে আমার প্রতিবেশী ছিলেন, এখন নতুন পাড়ায় বাড়ি করে উঠে গিয়েছেন।

অনেকদিন আমরা পাশাপাশি ছিলাম। আমাদের এই বন্ধুটির যে কোনোরকম বেড়াল-কুকুর বা পশুপ্রীতি আছে তা আগে জানতাম না। সেদিন তাঁর নতুন বাড়িতে গিয়ে দেখি বাড়ির সামনের দরজায় ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় বড় বড় হরফে নোটিশ টাঙানো,

'কুকুর হইতে সাবধান'

'Beware of Dog'

অত্যন্ত শঙ্কিতভাবে দরজায় কলিং বেল টিপে একটু সরে দাঁড়ালাম, দরজা খোলামাত্র কুকুরটা হঠাৎ যাতে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। পুরনো বন্ধু নিজেই হাসিমুখে

দরজা খুললেন। সুখের কথা কোনো কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়লো না। ভেতরে ঢুকেও কোনো কুকুর দেখতে পেলাম না।

সুতরাং প্রথমেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুকুর কোথায় ? কবে থেকে কুকুর পোষা আরম্ভ করলেন ?' ভদ্রলোক বললেন, 'কৈ কোনো কুকুর তো পুষিনি।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে অবাক হলাম। বললাম, 'তাহলে বাইরের দরজার ঐ ভয়াবহ নোটিশ কী জন্যে ?' ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'বেড়ালের জন্যে।'

আমি ততোধিক অবাক হলাম। জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম, 'বেড়ালের জন্যে কুকুরের নোটিশ ?' ভদ্রলোক বললেন, 'এ পাড়ায় এসে দেখছি বড় বেশি বেড়ালের উৎপাত। তাই ঐ নোটিশ টাঙিয়েছি।'

হতভম্ব হয়ে আমি বললাম, 'মানে ?' ভদ্রলোক আরেকবার হাসলেন এবং হাসতে হাসতে বললেন, 'ঐ নোটিশটা বেড়ালদের জন্যে। বেড়ালরা ঐ নোটিশ দেখে ভাববে বাড়িতে কুকুর আছে আর সেই জন্যে কুকুরের ভয়ে বাড়িতে ঢুকবে না।'

বেড়ালের বুদ্ধি সম্পর্কে ভদ্রলোকের ধারণা ভাঙাতে ইচ্ছে হলো না, তাই জিজ্ঞাসা করলাম না নোটিশে কোনো উপকার হচ্ছে কি না।

সে যা হোক, এর পরের গোলমেলে ব্যাপারটিও কুকুর নিয়ে এবং এখানে কুকুর অনুপস্থিত নয়, বরং দু'দুটো কুকুর।

গল্পটি অবশ্য আমার নয়। গল্পটি স্বনামধন্য হিমানীশ গোস্বামীর। গল্পটি হিমানীশবাবুর কাছে আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

পাঠক পাঠিকা, আপনাদের কারো কি শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর রসিকতা স্বকর্ণে শোনার সৌভাগ্য হয়েছে, তাহলে ব্যাপারটা বুঝবেন, সেটা এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ঠিক গল্প নয়, এটা একটা সমস্যা। হিমানীশ গোস্বামী বলেছিলেন যে তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে দুটো কুকুর আছে। তার মধ্যে একটা বড় কুকুর আর একটা ছোট কুকুর।

এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু এর পরেই তিনি বললেন, 'তবে বুঝলেন কি না। ও বাড়ির বড় কুকুরটাই ছোট কুকুর আর ছোট কুকুরটাই বড় কুকুর।'

ব্যাপারটার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। যাঁরা সমস্যাটা অনুধাবন করতে পারেননি, তাঁদের জানাই যে দুটো কুকুর দু'রকম জাতের। একটা ছোট জাতের কুকুর সেটা বয়সে বড়, আরেকটা বড় জাতের কুকুর সেটা বয়সে ছোট। তার মানে হলো ছোট কুকুরটাই বড় কুকুর এবং বড় কুকুরটাই ছোট কুকুর। উলটো দিক থেকে বললে বড় কুকুরটাই ছোট কুকুর আর ছোট কুকুরটাই বড় কুকুর।

জীবজন্তুর গোলমালের পর অতঃপর মানুষের গোলমালে যাই। মানুষের মধ্যে সেরা মানুষ ডাক্তার। গোলমাল দুই ডাক্তারে। একজন চোখের ডাক্তার আর অন্যজন দাঁতের ডাক্তার।

চোখের ডাক্তার দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছেন। সেখানে ডেন্টিস্ট সাহেবের সহকারী তাঁকে চেম্বারে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। চোখের ডাক্তার প্রতিবাদ করলেন, 'আমাকে ডেন্টিস্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আমিও একজন ডাক্তার, চোখের ডাক্তার। দাঁতের ব্যথায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। কোনো রোগী দেখতে পারছি না।'

দাঁতের ডাক্তারের সহকারী বললেন, 'আমাদের ডাক্তারবাবুরও ঐ একই অবস্থা।' চোখের ডাক্তার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেকি ? ডেন্টিস্টেরও দাঁতে ব্যথা হয়েছে ? আশ্চর্য কাণ্ড।'

সহকারী বললেন, 'না ডেন্টিস্ট সাহেবের দাঁতে ব্যথা হয়নি।' চক্ষু চিকিৎসক বললেন, 'তবে ?' সহকারী বললেন, 'তবে আর কি ? ডেন্টিস্ট সাহেবের চোখ খারাপ হয়েছে। নতুন চশমা না নেওয়া পর্যন্ত আর রোগী দেখতে পারবেন না।'

যদি এটা কোনো ছোট শহরের ঘটনা হয় এবং যদি সেই শহরে একজন মাত্র চক্ষু চিকিৎসক এবং একজন মাত্র ডেন্টিস্ট থাকেন তাহলে সমস্যাটা কিন্তু খুবই গোলমেলে ধরনের। চোখের ডাক্তার দাঁতের ডাক্তারকে আগে দেখবেন না দাঁতের ডাক্তারই চোখের ডাক্তারকে আগে দেখবেন, এ গোলমালের কি করে সমাধান হবে জানি না।

একেই বোধহয় ইংরেজিতে ভিশাস্ সার্কেল (Vicios circle) বলে। যার বাংলা করা যায়, বিষাক্ত বৃত্ত। এই বৃত্ত থেকে বেরোনোর পথ বন্ধ।

অর্থনীতিতে ভিশাস্ সার্কেলের একটা ভাল উদাহরণ আছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি গরিব বলে এসব জায়গায় ভারি শিল্পের অভাব। আবার অন্যদিকে ভারি শিল্পের অভাব থাকার ফলেই এই দেশগুলি গরিব।

তত্ত্বকথা থাক। বিষাক্ত বৃত্তের গোলমাল নিয়ে একটা গল্প বলি। বোধহয় কাণ্ডজ্ঞানে এ বিষয়ে লিখেও ছিলাম। তবে গল্পটা মজার, তাই আবার লিখছি।

একটা মেয়েকে নতুন প্রাইভেট টিউটর পড়াতে গেছেন। তিনি আগের দিন মেয়েটিকে কয়েকটি অঙ্ক দিয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটি সেগুলো কষে রাখেনি। এইরকম দু'চারবার হওয়ার পর মাস্টারমশায় ছাত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'এ রকম হচ্ছে কেন ? আমিতো সকালে আসি। দুপুরে অঙ্ক কষে রাখলেই পারো।'

ছাত্রীটি বললো, 'স্যার, দুপুরে খেয়ে উঠে বড় ঘুম পায়। অঙ্ক কষতে বসার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি।' মাস্টারমশায় বললেন, 'তা হলে বিকেলে ঘুম থেকে উঠে অঙ্ক কষবে।' ছাত্রী বললো, 'স্যার ঘুম থেকে উঠলে বড় খিদে পায়।'

মাস্টারমশায় বললেন, 'খাবে'। ছাত্রী বললো, 'স্যার খেলেই আমার ঘুম পায়।' একটু জেরা করতেই মাস্টারমশায় জানতে পারলেন ছাত্রীটির ঘুম থেকে উঠলেই খিদে, খিদের পর খাওয়া, খাওয়ার পর ঘুম। আবার খিদে, আবার ঘুম। এই বিষাক্ত বৃত্তের মধ্যে ছাত্রী বন্দী। এই গোলমেলে বৃত্ত থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারবে না। তার আর অঙ্ক কষাও হবে না।

সমান-সমান

পৃথিবীতে কোনো দু'টো জিনিস সমান-সমান নয়। হাতের দুটো আঙুল এক সমান নয়। দুটো মানুষ, এমনকি যমজ দুই ভাইও কখনো একরকম হয় না। কোথাও কিছু পার্থক্য থাকেই।

শুধু মানুষ কেন একই গাছের একই ডালের দু'টি পাতা যারা একই মুহূর্তে বিকশিত হয়েছে, একই রোদে হাওয়ায় একইরকম সবুজ হয়েছে, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে সেই পাতা দু'টির মধ্যেও বিস্তর না হোক সামান্য কিছু ফারাক রয়েছে। দু'টি তুচ্ছ দুর্বাদল, দু'টি ক্ষুদ্র পিঁপড়ে পরস্পরের সঙ্গে তাদের যত মিলই থাকুক, তবু কিছু ব্যতিক্রম থাকবেই।

উপকথার সেই বিখ্যাত বানর এই অসমানত্বের সুযোগ নিয়েছিল। কাহিনীটা সুবিদিত, বিস্তারিত লেখার কিছু নেই। একটা বানরকে দেওয়া হয়েছিল একটা পিঠে দুই সমান অংশে ভাগ করতে। সেই থেকে 'বানরের পিঠে ভাগ' প্রবাদটি চালু হয়েছে।

প্রথমবার বানর পিঠেটি ভাগ করলো, এক অংশ একটু বড় অন্য অংশ একটু ছোট। এবার বড় অংশটা একটু কমিয়ে ছোট অংশটার সমান করার জন্য বানর বড় অংশটায় একটা কামড় বসালো।

বানরের কামড়, সুতরাং সেটা একটু বড় কামড় হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রথম অংশটা এবার দ্বিতীয় অংশের চেয়ে ছোট হয়ে গেল। ফলে বানরকে দ্বিতীয় অংশে কামড় বসাতে

হলো প্রথম অংশের সমান করার জন্যে।

অতঃপর যা হওয়া উচিত্ত তাই হলো। দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের চেয়ে ছোট হয়ে গেল। ফলে আবার কামড়, এবার প্রথম অংশে, এবং পৌনঃপুনিকভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশে কামড় দিতে দিতে বানর সম্পূর্ণ পিঠেটি উদরস্যাৎ করলো। যারা বানরের কাছে পিঠে ভাগ করতে দিয়েছিল তারা শূন্যহাতে ফিরে গেল।

* * *

এবার সমান-সমানের দু-একটা জাগতিক উদাহরণ দিই।

মার্কিন ধনকুবের এনড্রু কারনেগির কাছে একবার এক সমাজতন্ত্রী গিয়েছিলেন। সেই সমাজতন্ত্রী কারনেগিকে বোঝাতে লাগলেন যে একজন মানুষের এত বেশি ধনসম্পদ, অর্থ থাকা খুবই অন্যায়। সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে অবিলম্বে কারনেগির সমস্ত সম্পদ সমস্ত মানুষের মধ্যে বণ্টিত হওয়া উচিত।

লোকটির কথা শুনতে কারনেগির মূল্যবান সময় বেশ কিছু ব্যয় হলো, তবে তিনি মনোযোগ দিয়ে এবং হাসিমুখে লোকটির কথা ভালো করে শুনলেন। তারপর তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে ডাকলেন, ডেকে বললেন, 'দ্যাখোতো, আমার সমস্ত সম্পত্তি বাড়ি-ঘর জমিজমা, শেয়ার ডিবেঞ্চার, কল-কারখানা সেইসঙ্গে নগদ আর ব্যাঙ্কের টাকা পয়সা, বাজারে পাওনা সব মিলিয়ে কত টাকা হয়?'

কিছুক্ষণ হিসেব করে ব্যক্তিগত সচিব বললেন, 'স্যার মোটামুটি অর্থের হিসেবে সমস্ত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় একশো কোটি ডলার।'

এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগের কথা। তখনকার বাজারদরে এই টাকার মূল্য অপরিসীম। সে যা হোক, এরপরে কারনেগি সমাজতন্ত্রী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, এখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত?'

কারনেগি কেন এসব প্রশ্ন করছেন সেসব ধরতে না পেরে ভদ্রলোক বললেন, 'একশো দশ কোটি ছিল, তবে এখন বেড়ে প্রায় সোয়াশো কোটি হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপরে রাখা কাগজের প্যাডে একশো কোটি ডলারকে সোয়াশো কোটি দিয়ে ভাগ করলেন কারনেগি, ভাগফল পাওয়া গেল আশি সেন্ট।

কারনেগি তখন তাঁর সচিবকে বললেন, 'এই ভদ্রলোককে ওঁর অংশের আশি সেন্ট দিয়ে দাওতো।' তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিটলো তো আপনার সমস্যা?'

* * *

সমীকরণের সমস্যা অবশ্য এত সহজে মেটানো সম্ভব নয়। জার্মান প্রবাদ আছে, একমাত্র গোরস্থানেই সবাই সমান। এ বিষয়ে স্কুল পাঠ্য বইতে সেই ইংরেজি কবিতা 'ডেথ দা লেভেলার' (Death the leveller) সেওতো প্রায় অনেকেরই পড়া।

মৃত্যুতে সবাই সমান, এই বহুস্বীকৃত এবং অতি প্রাচীন দর্শনতত্ত্ব নিয়ে ছেঁদো আলোচনার সুযোগ এই তরল কলমকারকে পাঠক দেবেন না। তবে তরলতর প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে কবি ওয়ালট হুইটম্যানকেও একটু স্মরণ করি, কারণ তিনি বলেছিলেন জীবনেও সবাই সমান।

হুইটম্যানের সেই 'মদীয় সঙ্গীত' (Song of myself) কবিতা তার থেকে অন্তত এই কয়টি পংক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :—

আমি যা ভাবি,
তুমিও তাই ভাবো।
কারণ প্রতিটি অণুকণা
যা আমার মধ্যে রয়েছে,
তা তোমার মধ্যেও রয়েছে।

কাব্য ও দর্শনান্তে এবার সমান সমানের আসল কাহিনীটি বলি।

শুকদেব একজন নবীন যুবক। এলোমেলো চুল। কবিস্বভাব, বেকার। দু-চারটে টিউশনি করে। বয়েস নিতান্ত একুশ। কিন্তু এই বয়েসেই সে প্রেমে পড়েছে। এবং সে সামান্য প্রেম নয়, সে প্রেমে পড়েছে পাড়ারই দিদিস্থানীয়া এক পঞ্চবিংশ বর্ষীয়া যুবতীর সঙ্গে। যুবতীটির নাম অনু।

অনুকে সুযোগ পেলেই শুকদেব বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কখনো মুখে বলে, কখনো চিঠি লেখে। অনু কোনো জবাব দেয় না। কিন্তু শুকদেব নাছোড়বান্দা। অবশেষে বৃহৎ পীড়াপীড়ির পর অনু একদিন কবুল করলো, 'ঠিক আছে, বাবাকে বলো।'

অনুর বাবা একজন ছিমছাম সরল প্রকৃতির (অর্থাৎ সাদা কথায় গবেট) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। সারা জীবন সরকারি কাজ করে কেবল 'উইথ রেফারেন্স টু ইয়োর মেমো নাম্বার....' করে তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি বহু আগেই লুপ্ত হয়েছে।

একদিন শুকদেব অনুর বাবার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেল। অনু একটা মরনিং স্কুলে পড়ায়, সকালে বাড়ি থাকে না। ওটাই প্রশস্ত সময়। সকালের দিকে অনুর বাবা বাইরের বৈঠকখানা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, শুকদেব গিয়ে নমস্কার করে সামনে দাঁড়ালো।

অনুর বাবা, 'কি চাই', জিজ্ঞাসা করাতে শুকদেব নিজের আত্মপরিচয় দিলো। দিয়ে বললো, 'মেসোমশায়, আমি এই পাড়াতেই থাকি। আপনার মেয়ে অনুদির সঙ্গে আমার লাভ্ হয়েছে। অনুদিকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

এই সহজ প্রস্তাবে মেসোমশাই বিহ্বল বোধ করলেন, কিন্তু ঐ 'অনুদি' শব্দটায় তাঁর কেমন খটকা লাগলো, তিনি আর কিছু জানতে না চেয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবাজীবন, তোমার বয়স কত ?'

শুকদেব গর্বিত হয়ে বললো, 'একুশ'।

অনুর বাবা বললেন, তোমাকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

চার বছর অপেক্ষা করতে হবে শুনে শুকদেব রীতিমতো দমে গেলো, তবু বললো, 'চার বছর কেন মেসোমশায় ?'

মেসোমশায় বললেন, 'এখন অনুর বয়েস পঁচিশ। চার বছর পরে তোমাদের দু'জনের বয়েস সমান-সমান হলে তখন বিবেচনা করে দেখবো। এখন এসো।'

অকারণে

শুধু বুদ্ধিমান এবং বাকপটু ব্যক্তিরা রসিকতার ইন্ধন সরবরাহ করেন তা নয়, এমন অনেক লোক যাঁরা তেমন-বুদ্ধিমান বলে পরিচিত নন তাঁরাও অনেক সময় না বুঝে, অভাবিতভাবে রসিকতা রচনা করেন। অপরিকল্পিত এবং অচিন্তিত এই রসিকতাগুলি বুদ্ধিদীপ্ত সরস বাক্যমালার চেয়ে কম উপাদেয় নয়।

ভবসুন্দরী হেয়ার কাটিং সেলুনের ক্ষৌরকার জগমোহনবাবুকে দিয়ে আরম্ভ করি। চুল কাটার সময় জগমোহনবাবু প্রায়শই তাঁর ব্যক্তিগত নানা কথা আমাদের বলতেন।

এর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আলোচনা ছিল তাঁর পিতৃদেবের বুদ্ধি নিয়ে। জগমোহনবাবুর পিতৃদেব তখন সদ্য স্বর্গত হয়েছেন, ফলে বাবার বিষয়ে তিনি একটু বেশিই বলছিলেন। আমরাও স্বাভাবিক ভদ্রতাবশত শুনে যাচ্ছিলাম।

একদিন একটা কথা খুব জোর দিয়ে বললেন, কথাটা হলো, 'বাবার জন্যে, বাবার বুদ্ধিতেই আজ খেয়ে-পরে বেঁচে আছি।'

চুল কাটা সবে আরম্ভ হয়েছে, হাতে অনেক সময় আছে সুতরাং জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার বাবা কি অনেক টাকা পয়সা, বিষয় সম্পত্তি রেখে গেছেন ?'

জগমোহনবাবু দু'দিকের জুলফি সমান করতে করতে বললেন, 'আরে তা নয়। আপনি তো জানেন, আমার বাবাও নাপিত ছিলেন। এ বাজারে কি আর টাকা পয়সা রেখে যেতে

পেরেছেন ?'

আমি বললাম, 'তবে ?' জগমোহনবাবু বললেন, 'দেখুন ছোটবেলায় আমার মার খুব ইচ্ছে ছিল আমি দরজি হই, কিন্তু বাবা বাধা দিলেন, বললেন, জাত ব্যবসা ছাড়া উচিত হবে না।'

চুলকাটা প্রায় শেষের দিকে এসেছে, ঘাড়ে পাউডার দিতে দিতে জগমোহনবাবু বললেন, 'বাবার কথা শুনেছিলাম বলে এই দুর্দিনে খেয়ে বেঁচে আছি। আজ দশ বছর ব্যবসা করছি। আজ পর্যন্ত একটা লোকও আমার কাছে জামা বানাতে আসেনি। সবাই আসে চুল কাটতে। বলুন তো বাবার কথা না শুনে মায়ের কথামত দরজি হলে মারা পড়তাম না।'

জগমোহনবাবুর সমস্যা তাঁর পিতৃদেব ভালই সমাধান করে গেছেন। সব সমাধান অবশ্য এত সহজ নয়। এমন অনেক সমাধান আছে যা না বুঝে অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে। উপকার করতে গিয়ে অপকার হয়।

কলকাতা থেকে কিছু দূরের এক জেলার সদর স্টেশনে রেলগাড়ি থেকে খবরের কাগজ বান্ডিল সকালবেলা একটা যাত্রীবাহী বাসের ড্রাইভারের কেবিনে তুলে দেওয়া হয়। যেখানকার যে হকারের যে রকম চাহিদা সেই অনুযায়ী বান্ডিল করে জায়গার নাম লিখে দেওয়া হয়। যথা, 'রামপুর ৩২', 'শ্যামগঞ্জ ২৫', 'যদুহাট ৪০' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাসের ড্রাইভার ভদ্রলোক জায়গার নাম দেখে বান্ডিল মিলিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে কাগজের বান্ডিলগুলো পথের পাশে ফেলে দেন, হকারেরা সময়মত সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বিলি করেন।

সেদিনও ড্রাইভার ভদ্রলোক যথারীতি কাজ করছিলেন। পথের পাশে জায়গামত কাগজের বান্ডিল ফেলতে ফেলতে দ্রুতগতি ছুটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি জিপ গাড়ি পেছন থেকে দ্রুতগতিতে ছুটে এসে বাসটার পথ আটকালো। তারপর রামপুর, শ্যামগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় যে কাগজের বান্ডিলগুলি রাস্তার পাশে হকারদের জন্যে ফেলা হয়েছিল সেগুলো সেই জিপচালক বাসের ড্রাইভারকে ফেরত দিলেন, বললেন, 'আপনার বাস থেকে রাস্তার মধ্যে নানা জায়গায় এগুলো সব পড়ে গিয়েছিল। আমি আপনার পিছনেই আসছিলাম, দেখতে পেয়ে সব কুড়িয়ে আনলাম।'

* * *

উপরের দু'টো আখ্যানেই দেখা যাচ্ছে যে জগমোহনবাবু বা জিপচালক কারোরই কোনো রসিকতার ইচ্ছে ছিল না। জগমোহনবাবু সরলভাবে যে কথা বলেছেন সেটা যেমন হাস্যকর তেমনিই জিপচালক যা করেছেন সেটা আন্তরিকভাবেই করেছেন কিন্তু তিনি হাস্যকর সমস্যা তৈরি করেছেন।

অতঃপর এক সরলচিত্ত মহিলার কথা বলি। ভদ্রমহিলা বিধবা। ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা যে যার মত নিজেদের জায়গায় থাকে।

ভদ্রমহিলার আর্থিক কোনো অসুবিধে নেই। একটা বাড়ি আছে, সে বাড়িতে কয়েক ঘর ভাড়াটে। ভাড়ার আয় ভালোই হয়। ছেলেরাও যে যার সাধ্যমত মাসে মাসে কিছু কিছু পাঠায়। তা ছাড়া তাঁর স্বামী সরকারি চাকরি করতেন, কিছু পেনসনও তিনি পান।

বড় ছেলে বিহারের একটা শহরে একটা আধাসরকারি ব্যাঙ্কে ম্যানেজার। সে কয়েকদিনের ছুটিতে মায়ের কাছে এসেছে। একদিন কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করলো,

'আচ্ছা মা, এই যে আমরা মাসে মাসে তোমাকে টাকা পাঠাই, বাড়ি ভাড়ার টাকা পাও, বাবার পেনসন পাও—সব টাকা তোমার খরচ হয় ?'

মা হেসে বললেন, 'ধুর ! আমার আর কি খরচ ? অর্ধেকের বেশি টাকা তো মাসে মাসে জমে যায় ।' ছেলে মাকে জানতো, কিঞ্চিৎ দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোনো ব্যাঙ্কে রাখো ?'

মা বললেন, 'ব্যাঙ্কে রাখতে যাবো কেন ? সে খুব হাঙ্গামা । তা ছাড়া বাড়িতে এত বড় পুরনো আমলের সিন্দুক রয়েছে । ঐ সিন্দুকের তালা কোনো চোরে ভাঙতে পারবে না ।'

'কিন্তু মা, শুধু চুরির কথা নয় । টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে তুমি তো বেশি সুদ পেতে', ছেলে বললো, 'শুধু সুদের টাকাটা কম পাচ্ছো ।'

মা বললেন, 'তুই আমাকে বোকা পেয়েছিস ? আমি মাসে মাসে সিন্দুকে টাকা রাখার সময় সুদ বাবদ আরো কিছু টাকা ঐ সঙ্গেই সিন্দুকে ঢুকিয়ে দিই ।'

মায়ের এই অত্যাশ্চর্য আর্থিক বুদ্ধি দেখে ব্যাঙ্কার ছেলে হতভম্ব হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তার মুখে আর কথা যোগালো না ।

* * *

এর পরের গল্পটি, সেটাই শেষ অকারণ রসিকতার প্রসঙ্গ, একটু গোলমেলে ।

এক অফিসের বড়সাহেব মিটিং করতে ব্যস্ত ছিলেন । সেই সময়ে তাঁর একটি ফোন আসে । ফোনটি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ধরেন ।

বড়সাহেব মিটিং করে ফিরে এলে ব্যক্তিগত সচিব একটি কাগজের স্লিপ তাঁকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্যার একটা ফোন এসেছিল । এইখানে টুকে রেখেছি ।'

বড়সাহেব তাকিয়ে দেখলেন স্লিপটিতে কী সব হিজিবিজি উলটোপালটা লেখা, হাতের লেখাও অস্পষ্ট, প্রায় কিছুই বোধগম্য নয় ।

বড়সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এসব কী হাবিজাবি লিখেছেন । কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না ।' ব্যক্তিগত সচিব বললেন, 'স্যার যিনি ফোন করেছিলেন, তিনি কী যে কীসব বললেন আমিও কিছু বুঝতে পারিনি ।'

* * *

অকারণে পুনশ্চ :

দীঘায় সমুদ্রতীরে এক ভদ্রলোক জামাজুতো খুলে রেখে সমুদ্রস্নান করতে নেমেছিলেন । উঠে এসে দেখেন যে একটি শিশু তাঁর জামাটি বালির মধ্যে পুঁতছে । পাশেই এক মহিলা দাঁড়িয়ে, তাঁকে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'ঐ যে বাচ্চাটি আমার জামা বালিতে পুঁতছে ও কি আপনার ছেলে ?' ভদ্রমহিলা বললেন, 'না, না । ও আমার ছেলে নয়, ও আমার বোনপো । আমার ছেলে ঐ যে জলের ধারে আপনার জুতোজোড়া সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলছে ।'

স্মৃতির খেয়া

হৈহৈ করে বইমেলা চলছে শহরে। সারা বছর তুচ্ছাতিতুচ্ছ রসিকতায়, ইয়ারকি দিয়ে কেটে যায়। অন্তত এবার একটা বইয়ের কথা লিখি।

বাংলা কাগজের রীতি আছে, বৎসরান্তে লেখক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে জানতে চাওয়া এ বছর কী কী বই পড়লেন। তাঁরা যা বলেন, তাঁর শতকরা নব্বুইটি ইংরেজি বই। এমন কেউ কেউ আছেন এমন কি তার মধ্যে বঙ্গভাষার লেখকও আছেন যিনি একটিও বাংলা বইয়ের নাম উল্লেখ করেন না। সস্তা, বাজিমাৎ করা, গিমিক সর্বস্ব। কিংবা পণ্ডিত পাঠ্য বিলিতি শুষ্ক কাষ্ঠ গ্রন্থের চমৎকার একটি তালিকা পাওয়া যায় এসব প্রতিবেদনে। এঁরা বোধহয় মনে করেন বাংলা বইয়ের নাম করলে নিজেদের দাম কমে যাবে। আমার বিদ্যা অতদূর নয়। তা ছাড়া এই সামান্য কথিকায় অত কচকচি পোষাবে না।

সরাসরি একটা বাংলা বইয়ের কথা বলি, সাহানা দেবীর 'স্মৃতির খেয়া'। বইটি আগে দেখেছিলাম, দশ বছর হল বেরিয়েছে কিন্তু পড়া হয়নি। সম্প্রতি পড়লাম।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাগিনেয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পাত্রী, শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যা আজীবন সঙ্গীত সাধিকা সাহানা দেবী—তাঁর এই বইতে শান্তিনিকেতনের গান আর অসহযোগের আন্দোলন, দেশবন্ধুর শেষযাত্রা আর অরবিন্দের পণ্ডিচেরী অনায়াস ভাষায় সাবলীল সহজ বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন।

এই শতকে প্রথম দুই দশক। কত ঘটনা, কত আন্দোলন তারই ফাঁকে ফাঁকে কৌতুকময় ঘটনাবলী। যে পৃথিবী চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আমরা জন্মাবার আগেই সেই জগতের ছবি এঁকেছেন সাহানা দেবী।

বড় ঘটনা আপাতত থাক ইতিহাসের পৃষ্ঠার জন্যে। ইতিহাসে ঠাঁই পাবে না এমন দু'একটা কৌতুকময় কাহিনী 'স্মৃতি খেয়া' থেকে তুলে দিচ্ছি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে একটি বিয়েতে ঘরে দরজা বন্ধ করে মহিলাদের আসর বসেছে। সেখানে সাহানা দেবী অতুলপ্রসাদের 'বঁধূ ধরো ধরো মালা পরো গলে' গানটি গেয়ে নাচ শুরু করেছেন। হঠাৎ দেখা গেল ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ সেই নাচ দেখছেন। সাহানা দেবী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে কবিকে ধরলেন, 'আপনি যে বড় লুকিয়ে আমার নাচ দেখছিলেন ?' উজ্জ্বল দুষ্টুমিভরা চোখে কবি তাঁর সেই অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি যদি কথা দাও যে নাচবে তাহলে আমি আবার একটা বিয়ে করি !'

* * *

পিতৃহীন সাহানা দেবী মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন। মামা হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধুর অনেক কাহিনী, অনেক গল্প স্মৃতির খেয়ায়।

সেটা সেই অসহযোগের বছর। ষাট ইঞ্চি বহরের শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি ছেড়ে দেশবন্ধু তখন চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের খদ্দর পরতে লেগেছেন। এই সময়ের একটা মজার ঘটনার কথা সাহানা দেবী লিখেছেন।

....'আমাদের এক পিসিমার বাড়িতে বিকেলের দিকে মামাবাবু বেড়াতে এসেছেন। এই পিসিমা দুর্গামোহন দাশের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। মামাবাবুর পরিধানে খদ্দরের ধুতি চাদর ইত্যাদি ছিল ; কিন্তু পায়ে ছিল বিলিতি জুতো। দেখে পিসিমা ঠাট্টা করে দেওরকে বললেন, 'এ দিকে তো খদ্দর পরেছো, পায়ে তো দেখি বিলিতি জুতো !' মামাবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'বিলিতি বলেই তো পায়ের নিচে রাখতে ভালবাসি।'

* * *

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেই রসা রোডের দেশবন্ধুর বাড়ি থেকে ডাক পড়তো সাহানা দেবীর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গান শিখতে যাওয়ার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথ যেবার কবির সঙ্গে আসতেন সেবার বেশির ভাগ গানই দীনেন্দ্রনাথ শেখাতেন, যদিও কবি সেখানে উপস্থিত থাকতেন। দীনেন্দ্রনাথ না এলে কবি নিজেই শেখাতেন।

একবার খুবই মজার একটা ব্যাপার হয়েছিল। দীনেন্দ্রনাথ কলকাতা এসেই টেলিফোনে সাহানা দেবীকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'চলে এসো। অনেক নতুন গান আছে।'

সাহানা দেবী ছটফট করছেন যাওয়ার জন্যে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোনো গাড়ি কিছুতেই জোগাড় করে ওঠা গেল না। ভবানীপুরের থেকে জোড়াসাঁকো কম দূরের পথ নয়, সাহানা দেবী আছেন মামার বাড়ি অর্থাৎ রসা রোডে চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে (এখন যেটা চিত্তরঞ্জন সেবাসদন) আর দীনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন—জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে।

প্রায় সত্তর আশি বছর আগের কথা এসব। রাস্তাঘাটে মহিলাদের যাতায়াত অত সহজ

ছিল না, গাড়ি ঘোড়াও বা কোথায়।

সাহানা দেবী যেতে পারলেন না। কিন্তু তার জন্যে গান শেখা মোটেই বন্ধ রইল না। ব্যারিস্টার সি আর দাশের ব্যস্ত চেম্বারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টেলিফোনযোগে চোদ্দটা গান শিখে নিলেন সাহানা দেবী। দীনেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে টেলিফোনে গাইছেন আর তিনি ভবানীপুর রসা রোডে টেলিফোন ধরে গান শিখছেন।

সাহানা দেবীর ভাষায়, 'সে ভারি মজা! কবি তো শুনে অবাক। এই কথা যে কত লোককে উনি পরে বলেছিলেন, এমন গান পাগলা আমি আর কোনো মেয়েকে দেখলুম না।'

গানের পরে অভিনয়ের কাহিনী বলি।

নিউ এম্পায়ারে 'বিসর্জন' অভিনয় হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জয়সিংহ।

অভিনয় আরম্ভ হতো সাহানা দেবীর কণ্ঠে 'তিমির দুয়ার খোলো এসো এসো নীরব চরণে' গানটি দিয়ে। স্টেজে প্রবেশ করবার পথে সাহানা দেবী দেখলেন কবি জয়সিংহের সাজে সেজে ভোঁ হয়ে বসে আছেন, যেন কিসের মধ্যে তলিয়ে গেছেন।

সাহানা দেবীর ডাক নাম ঝুনু। তিনি গান শেষ করে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসতেই রবীন্দ্রনাথ রঙ্গ করে বললেন, 'ঝুনু, তুমি তো দেখছি বেশ সহজভাবে স্টেজে চলে যাও? ভয় ভাবনার ধার ধারো বলে তো মনে হয় না?'

সাহানা দেবী হেসে বললেন, 'আমার খুব আনন্দ হয়। খুব মজা লাগে স্টেজে ঢুকতে।'

একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ আরো মজা করে বললেন, 'তাই তো দেখছি। আর আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে এত স্টেজে অভিনয় করেও স্টেজে যাবার আগে আজও বলসঞ্চয় করে নেবার জন্যে একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে নিতে হয়।' যাঁরা কাছে ছিলেন সবারই হেসে গড়িয়ে পড়বার মতন অবস্থা কবির এই রকম মজার ভঙ্গি করে বলা দেখে।

অভিনয়ের দ্বিতীয় রাত্রে সাহানা দেবীর গায়ে জ্বর। সেই জ্বর গায়েই গান করলেন। সেদিন অভিনয় শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহানা দেবীর কাছে এসে কবি কৌতুকভরা নয়নে মৃদু মৃদু হেসে বললেন, 'শোনো ঝুনু, জ্বর হলে যদি তোমার এমন গান হয় তবে আমি তোমার জ্বর হয়েছে শুনে দুঃখ করবো না খুশি হবো, সে কথা তুমিই বলো, তোমার কি মত?'

* * *

অজস্র ঘটনা। উজ্জ্বল স্মৃতি চিত্রমালা। আর কিছু সরস কিছু ব্যক্তিগত ব্যথা বেদনার। সুখ-দুঃখের ভালবাসার কথা, গানের কথা। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু থেকে অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে দিলীপকুমার রায়। চমৎকার ভাষায় লেখা তর তর করে বয়ে গেছে স্মৃতির খেয়া। মহামানবদের আমাদের নিত্যদিনের চৌহদ্দির মধ্যে হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব আর গানের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন সাহানা। অনেক বড় কথার মধ্যে তুচ্ছ কৌতুকের স্মৃতিও তিনি জুড়ে দিয়েছেন। স্মৃতির খেয়ার মত বই সচরাচর লেখা হয় না।

নব্বুই অতিক্রান্ত হয়েছেন চিরসবুজ সাহানা দেবী। পণ্ডিচেরী আশ্রমে এখনও ভাগ্যবানেরা তাঁর কণ্ঠের গান, কোনো কোনো দিন গানের পর গান শুনতে পায়। এরকম যেন আরো বহুদিন চলে।

টাকা মাটি, মাটি টাকা

কলকাতায় পাতাল রেল তৈরির কাজ যখন প্রথম শুরু হল সেই সত্যযুগে, আমাদের পুরনো কালীঘাট পাড়ার এক ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মাথা খারাপের কারণ ছিল ঐ পাতাল রেল। পাতাল রেল চালু হতে তখনো ঢের বাকি, পাতাল রেলের মাটি খোঁড়া দেখেই তিনি বেশামাল হয়ে পড়েন। যতদূর মনে পড়ছে, ভদ্রলোকের নাম ছিল যতীন কিংবা সতীন পাল। সে যাই হোক, পালমশায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দুবেলা দুবার করে চৌরঙ্গীতে গিয়ে পাতাল খোঁড়া দেখতেন। শুধু গর্ত আর গর্ত খোঁড়া হচ্ছে, রাস্তা থেকে বিপজ্জনকভাবে উঁকি দিয়ে পাতাল রেলের অতল গহ্বরের হদিস করতে গিয়ে আমাদের পালমশায়ের মাথা ঘুরে যেত। মাথার আর দোষ কি ? এইভাবে মাথা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একদিন তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল। তিনি পাগল হয়ে গেলেন।

পাগল হওয়ার একটা নিয়ম আছে। সব মানুষই পাগল হয় কোনও না কোনও কিছু উপলক্ষ করে, পরে অবশ্য পাগলামির বিষয়ের পরিধি বা ঘের ক্রমশ বাড়তে থাকে, কিন্তু প্রথম উপলক্ষটা খুব নির্দিষ্ট ধরনের হয়।

পালমশায়ের উপলক্ষটা হয়েছিল পাতাল রেলের মাটি। যন্ত্রচালিত কড়াইতে করে হাজার হাজার কিউবিক ফুট মাটি কলকাতার গর্ভ থেকে তুলে আনছে নতুন পৃথিবীর কারিগরেরা, কলকাতার ভূগর্ভ ট্রেনের কৌশলীরা। মাটি, শুধু মাটি। এসব দেখে অনেকেই

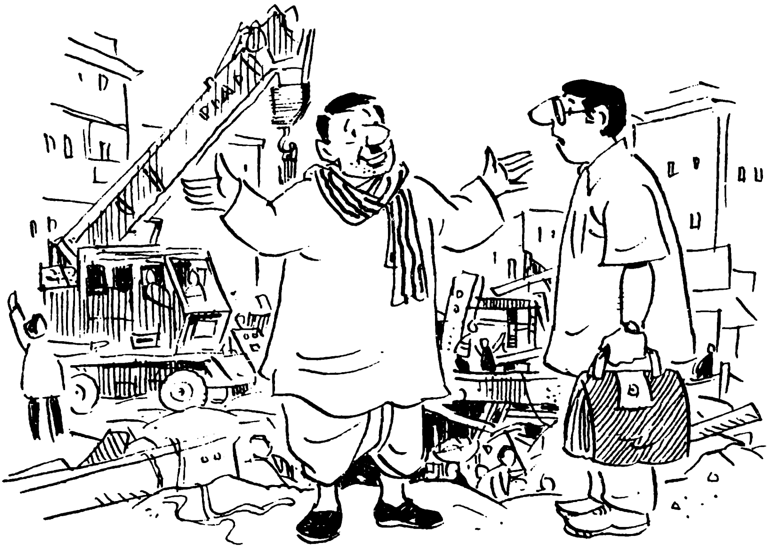

সে সময় থতমত খেয়ে গিয়েছিল। একাধিক পত্রকার খবরের কাগজে চিঠি দিয়েছিলেন, 'দু-হাজার সালের আগে কলকাতায় পাতাল রেল চালু হবে না, চালু হতে পারে না।' এক রাজনৈতিক ভাঁড় বলেছিলেন, 'সব মাটি করে দিল।' আরেক অসহায় আধুনিক কবি কিছুই বুঝতে না পেরে লিখেছিলেন, 'কলকাতার পেটে পেটে এত মাটি ছিল, এত দিন কে জানত ?'

পালমশায়ের সমস্যা অবশ্য আলাদা। চিরদিন পাগলদের সমস্যা একটু আলাদাই হয়। তাঁর মাথায় চিন্তা ঢুকেছিল এই এত মাটি, ঝুড়ি-ঝুড়ি, রাশি-রাশি, পাহাড়-পাহাড় মাটি, এত মাটি কোথায় রাখা হবে ? ভয়াবহ সমস্যা। এ সমস্যা শুধু পালমশায়ের নয়, এ সমস্যা সে সময়ে আমাদের প্রত্যেকের মাথায় ঢুকেছিল। এত মাটি কি হবে ?

পালমশায় পাগল হয়ে গেলেন কিন্তু আমরা পাগল হইনি। কারণ পাগল হওয়া অত সহজ নয়। এই যে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পাতাল রেল হয়েছে, হুশ্ করে পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে টালিগঞ্জ থেকে এসপ্ল্যানেড এবং কিছুকালের মধ্যেই একইরকম হুশ্ করে পৌঁছে যাওয়া যাবে বেলগাছিয়া, দমদম।

....দম মারো দম।.....

শুধু হিন্দি সিনেমায় এমন সম্ভব ছিল। সেবার পালমশায়ের পাগলামো সারানো প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আমাদের কালীঘাট পাড়ায় এক নতুন ভাড়াটে আসেন, তুখোড় বুদ্ধি তাঁর। যতদূর মনে পড়ছে, ভদ্রলোকের নাম ছিল যতীন কিংবা সতীন পালচৌধুরী। সে যাই হোক পালচৌধুরীমশায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় পালমশায়ের সঙ্গে চৌরঙ্গীতে গিয়ে পাতাল খোঁড়া দেখতে লাগলেন। অবশেষে একদিন পালচৌধুরীমশায় পালমশায়ের সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

খুব সহজ সমাধান।

পালচৌধুরীমশায় পালমশায়কে বললেন, 'জানেন, মাটি ব্যাপারটা কিছু নয়। জানেন, পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ বলেছেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা।'

পালমশায় স্বীকার করলেন যে, তিনি সেটা জানেন কিন্তু মাটি, এত মাটি। সারা শহর জুড়েই তো গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছে, এত মাটি পাতাল কোম্পানি রাখবে কোথায় ? পালচৌধুরীমশায় তখন পালমশায়কে বুঝিয়ে বললেন, 'আরে সেজন্যে আপনি চিন্তা করছেন কেন ? আরেকটা করে বড় গর্ত এই লাইনের পাশেই খোঁড়া হবে। খুবই বড় গর্ত হবে সেটা, সেই গর্তের মধ্যে এই মাটিগুলো রাখা হবে।'

পালমশায় একথা শুনে সাময়িকভাবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তাঁর পাগলামিও হ্রাস পেয়েছিল কিন্তু কয়েক দিন পরেই আবার প্রশ্ন তুললেন, 'কিন্তু ঐ দ্বিতীয় গর্তের মাটিগুলো কোথায় রাখা হবে ?'

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের জবাব পালমশায়কে পালচৌধুরীমশায় কিংবা অন্য কেউ দিতে পারেনি।

পালমশায়ের পাগলামি আর সারানো সম্ভব হয়নি। পরের দিকে তাঁর পাগলামি অবশ্য অন্য খাতে প্রবহমান হয়েছিল। কালীঘাট পাড়া বহুদিন ছেড়ে চলে এসেছি, বহুদিন পালমশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। জানি না এখন তিনি কেমন আছেন। বছর পাঁচেক আগে তাঁকে শেষবার দেখেছিলাম এসপ্ল্যানেডের চৌমাথায়। তখন পাতাল রেলের লাইন পাতা হয়ে গেছে, গর্তগুলোর মধ্যে মাটিচাপা দেওয়া হচ্ছে পাতাল রেলের সুড়ঙ্গ। হাজার হাজার পাওয়ারের ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে রাতের বেলা কাজ হচ্ছে। সেই সময়ে দেখেছিলাম, সেই কর্মযজ্ঞের একপাশে দাঁড়িয়ে পালমশায় চেঁচাচ্ছেন, 'দাদারা ভুল করবেন না। গর্তে মাটি চাপা দেওয়ার আগে সুড়ঙ্গের মধ্যে রেলগাড়িটা ঢুকিয়ে নিতে ভুলে যাবেন না।'

গল্পটা অতিবাস্তব হয়ে গেল। এবার পাতাল রেলের একটা অবাস্তব গল্প বলি। গল্পটা তেমন পুরনো নয়, তবে আগে কোথাও বোধহয় বলেছি। পাতাল রেল চলতে আরম্ভ করার আগে এর দরজাগুলো নিজে-নিজে বন্ধ হয়ে যায়। দরজা ঘেঁষে দাঁড়ানো বিপজ্জনক, এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা মাইকে সর্বদাই ঘোষিত হয়। কিন্তু ভবানীপুরের সনাতন মিস্ত্রি এ সব সতর্কবাণীর ধার ধারেন না। একদিন গাড়িতে উঠে ঐরকম দরজা ঘেঁষে দাঁড়াতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। সতর্কবাণী সত্ত্বেও সনাতন সরলেন না, অবশেষে দরজা চেপে আসতে যখন কোনওমতে সরতে গেলেন তাঁর একটা কান আটকে গেল দুই দরজার ভাঁজে, মুহূর্তের মধ্যে কানটা ছিঁড়ে প্ল্যাটফর্মের ওপরে পড়ে গেল। রক্তারক্তি কাণ্ড, হইচই, চেঁচামেচি। পাতাল রেল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এক ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে সনাতন মিস্ত্রির ছেঁড়া কানটা কুড়িয়ে আনলেন। সনাতন মিস্ত্রি সেই কানটা দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না এটা আমার কান নয়। অন্য কারও কান।'

সনাতন মিস্ত্রির কথা শুনে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। সনাতন মিস্ত্রি বুঝিয়ে বললেন, 'আমার কানে একটা লাল-নীল পেন্সিল গোঁজা ছিল। এটা সে কানে নেই।'

অচলপত্র

ডাক্তার : অভিনন্দন রামবাবু। আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন।
রামবাবু : কিন্তু মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো।
ডাক্তার : মন খারাপ কেন ? মাথা খারাপ সেরে গিয়ে মন খারাপ হলো কেন ?
রামবাবু : মন খারাপ হবে না ? এতদিন নিজেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভাবতাম। এখন আবার সেই নিতান্ত রামবাবু হয়ে গেলাম।

* * *

তিরিশ বছরের পুরনো 'অচলপত্রে'র উপরের কথোপকথনটি পেশ করলাম। তাও স্মৃতি থেকে।

কয়েক সপ্তাহ আগে 'তামাক' পর্বে পুরনো অচলপত্রের আরেকটি গল্প লিখেছিলাম এবং সেই সূত্রে অচলপত্র নামক অধুনালুপ্ত জনপ্রিয় পত্রিকা এবং সে পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের কথা বলেছিলাম। একথা উল্লেখ করেছিলাম যে হাতের কাছে বা চেনাশোনা কোথাও 'অচলপত্র' পত্রিকা নেই, তা হলে অন্তত এক পর্ব অচলপত্র স্মৃতিচারণ করা যেতো।

এক প্রাজ্ঞ পাঠক আমার সেই দুঃখ দূর করেছেন। বর্তমানের ঠিকানায় রেজিস্টার্ড

বুকপোস্টে মেদিনীপুরের মহিষাদল থেকে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন পঁচিশ বছর আগের এক বছরের বাঁধানো অচলপত্র।

ভদ্রলোক অনুরোধ করেছেন, 'দয়া করে নামোল্লেখ করবেন না। ব্যবহার করেছেন দেখলেই আমার যোগ্য প্রাপ্তি ঘটবে।'

সুতরাং তাঁর নাম লিখে তাঁকে বিব্রত করবো না, কিন্তু একথা স্বীকার করতে বাধা নেই একালে এ ধরনের পাঠক বিরল। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই পাঠক কাগজের পৃষ্ঠায় লেখা পড়ে তাঁর পঁচিশ বছর আগের বাঁধানো পত্রিকা রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—তাঁর প্রতি এই সামান্য লেখকের কৃতজ্ঞতা না জানালে অন্যায় হবে।

উনিশ শো চৌষট্টি সালের বাঁধানো অচলপত্রের সেট এটা। অচলপত্রের সরসতা তখন অনেক কম। আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মাসিক অচলপত্র সাপ্তাহিক হয়েছে। রাজনীতির দিকেই ঝোঁক বেড়ে গেছে। মাসিক অচলপত্রের স্বর্ণযুগ গেছে পঞ্চাশের দশকে। সেটা ছিল রঙ্গব্যঙ্গের সরস সাহিত্য পত্রিকা। ষাটের দশকের রাজনৈতিক ঝাঁঝ ঢুকে যায় সাপ্তাহিক অচলপত্রে এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ অনাবশ্যক রাগ ও তিক্ততা।

অচলপত্রের প্রসঙ্গে রাগ ও তিক্ততার কথা থাক, বরং দুয়েকটা সরস উদাহরণ দিই।

এই নিবন্ধের প্রথমে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি সেটা স্মৃতি থেকে, রসিকতাটা মাসিক অচলপত্রের সময়কার। আর এর পরেরগুলি চৌষট্টি সালের সাপ্তাহিক অচলপত্র থেকে।

অচলপত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিভাগ ছিল 'সাহিত্য দুঃসংবাদ'এবং চিঠি পত্তরের জঞ্জাল। 'সাহিত্য দুঃসংবাদ' জনপ্রিয় হয়েছিল প্রধানত নারায়ণ দাশশর্মার তির্যক, সরস ও মর্মান্তিক মন্তব্যের জন্যে। এ ছাড়াও সাহিত্য দুঃসংবাদ বী. না. ব. এবং সম্পাদক স্বয়ং লিখতেন।

যতদূর মনে পড়ছে চিঠিপত্তরের জঞ্জাল সম্পাদক সাধারণত নিজেই দেখতেন।

তখন কেনেডি সদ্য নিহত হয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জনসন। চিঠি পত্তরের জঞ্জালে একজন প্রশ্ন করেছেন, 'কেনেডির তুলনায় জনসন কেমন ?'

দীপ্তেন সান্যালের সরাসরি জবাব, 'এখনো বেবি জনসন।'

আরেকটি প্রশ্ন। 'পাঁঠার মাংস পাঁচ টাকা হয়ে গেল কি বরাবরের মতো ?'

জবাব : 'না আরও বাড়বে পাঁঠার দাম। চলচ্চিত্র থেকে সাহিত্য-সঙ্গীত-শিক্ষা-রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই পাঁঠার দাম বাড়তে থাকবে।'

আজ পঁচিশ বছর পরে যখন মাংসের দাম প্রায় পঞ্চাশ টাকা ছুঁয়ে দশগুণ হয়েছে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে বলেই বলা যায়। শুধু মাংসের পাঁঠা নয়, সব রকম পাঁঠার দামই বাড়ছে, বাড়বে।

এই সময়েই একটি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন দীপ্তেন সান্যাল। নেহরু তখনো বেঁচে তবে অসুস্থতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এক পাঠক প্রশ্ন করলেন, 'জয়প্রকাশ নারায়ণ কি ভাবী পি-এম ?' দীপ্তেন সান্যালের জবাব, 'ইন্দিরা থাকতে ? সন্তান থাকতে অন্য কাউকে কেউ এ্যাডপট (Adopt) করে ?'

ঠিক এই সময়েই পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রসঙ্গে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতাকে কটাক্ষ করে দীপ্তেন লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।'

রাজনীতির কচকচি থাক। অচলপত্রের একটা সিনেমা সংক্রান্ত মন্তব্যের কথা বলি। মন্তব্যটি এক এবং অদ্বিতীয় সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে।

এক পাঠক চিঠি দিয়েছিলেন, অচলপত্রে, 'সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় গল্পের নাম পালটে চারুলতা করেছেন, জানেন ?'

দীপ্তেন সান্যাল জবাব দিলেন, 'এখন তো কলির সন্ধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম পালটে দেননি, বাঙালীর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য ভালো……'

এ ধরনের তিক্ত ও তির্যক মন্তব্য হয়তো অনেকেরই এখন আর পছন্দ নয়। কিন্তু বয়েসের গুণেই হোক বা চরিত্র দোষেই হোক আমরা এসব পড়ে বেশ মজা পেতাম।

একবার দীপ্তেনবাবুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'শুনছি, আপনি নাকি জেলে যাবেন এবার ?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি কোথায় আছি বলে আপনার ধারণা ?'

ঠিক এই রকম নয় তবে প্রায় সমজাতীয় একটা রসিকতাও ছাপা হয়েছিল অচলপত্রে, সেটা হুবহু তুলে দিচ্ছি…

জন্মান্তরে অবিশ্বাসী একজন জিজ্ঞেস করলো তার জন্মান্তরে বিশ্বাসী এক বন্ধুকে যে, 'তা হলে তুমি কি বলতে চাও যে আমি আসছে বার শুয়োর হয়েও জন্মাতে পারি।'

জন্মান্তরে বিশ্বাসী বন্ধু শুনে বললো, 'না তা পারো না। দুবার এক রূপ কেউ পরিগ্রহণ করে না।'

* * *

অচলপত্র প্রসঙ্গ শেষ করার আগে দুটি উল্লেখযোগ্য কথা জানিয়ে রাখি। এক, অচলপত্রের প্রচ্ছদে একটি এবড়ো খেবড়ো ক্যাকটাস গাছের অর্থাৎ ফনিমনসার ছবি ছাপা হতো। এবং দুই, প্রচ্ছদের নিচে লেখা থাকতো, সর্বাধিক কম বিকৃত সাপ্তাহিক।

অবশেষে একটি অচলপত্রীয় রসিকতার উদাহরণ দিয়ে এই স্মৃতিচারণা শেষ করি :—

রোগী : ডাক্তারবাবু, আমার কী হবে ?

ডাক্তার : পোস্টমর্টেমের পর বলা যাবে।

পুনশ্চ : আরেকটি অচলপত্রীয় আখ্যান।

এক চিত্রকর বহুদিন ধরে একটি ছবি আঁকছিলেন। তাঁকে যখন সবাই জিজ্ঞেস করলো কিসের ছবি আঁকছেন। তিনি বললেন, 'ভগবানের ছবি আঁকছি।'

তখন সবাই বললো, 'সে কী করে সম্ভব। কেউ জানেই না ভগবান কী রকম দেখতে।'

চিত্রকর গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন, 'এবার থেকে এই ছবি দেখে জানতে পারবে।'

সংসারে সবাই যবে

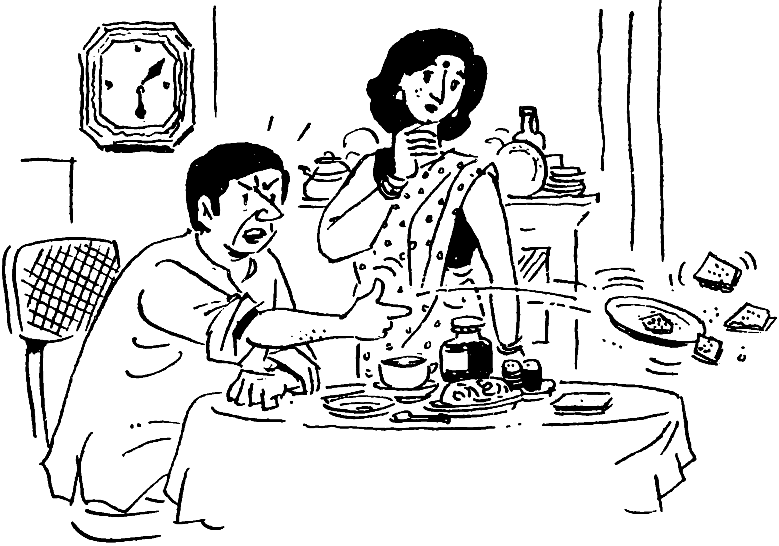

অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটা রচনা আরম্ভ করা যাক। কবি লিখেছিলেন,

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত
তুই শুধু ছিন্ন বাধা পলাতক বালকের মতো···

* * *

এ রচনা রান্নাঘর নিয়ে। সংসারের ঘোরাপথে রান্নাঘরে যাচ্ছি এবং বলাবাহুল্য, আমাদের এই হাস্যকর, অতি তরল নিবন্ধের কোনো সম্পর্কই নেই ঐ আশ্চর্য কবিতার সঙ্গে, নিতান্তই নামকরণের অজুহাতে ঐ পংক্তিদ্বয়ের অবতারণা।

সংসারে নানা মানুষের নানা কাজ। কেউ ফসল বোনে, কেউ নৌকো চালায়। কেউ কলম চালায়, চোগা-চাপকান পরে অফিস-আদালতে যায়। কেউ ধান ভানতে শিবের গীত গায়। আবার কারো কোনো কাজ নেই, সে বসে বসে খই ভাজে—নেই কাজ তো খই ভাজ।

এসব কাজের আবার নানা রকম ভাগ আছে। কোনো কাজ ছেলেদের, কোনো কাজ মেয়েদের। জাতি-গোত্র ধরেও কাজের ভাগ আছে। মুচি জুতো সেলাই করে, দর্জি জামা বানায়, ধোপা কাপড় কাচে।

হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা সামাজিক কাজের ভাগের ওপরেই গড়ে উঠেছিল। আজকাল অবশ্য এসব হিসেব মোটেই খাটে না। ছেলেদের কাজে মেয়েরা যাচ্ছে, মেয়েদের কাজে ছেলেরা। ধীবরের ছেলে ডাক্তার হচ্ছে, ক্ষৌরকারের বংশে এঞ্জিনিয়ার। আবার বামুন কায়েতের ছেলে লেদার টেকনোলজি পাস করে চর্মকার হচ্ছে।

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে এককালের সাদামাটা ভাগ ছিল মেয়েদের কাজ রান্নাঘরে, ছেলেদের কাজ অফিসঘরে। এখনো অনেকে সেই রকম ভাবে।

কিন্তু রান্নার ব্যাপারটা মেয়েদের একচেটিয়া নয়। যেমন অফিস কাছারিতে পুরুষ মনোপলির যুগ বহুকাল শেষ হয়েছে। পাণ্ডবজায়া দ্রৌপদীর রন্ধনকুশলতার যে খ্যাতি সেই কিংবদন্তীকে মনে রেখেই বলা চলে যে আমাদের আশেপাশেই রয়েছে অনেক পুরুষপাচক। বিশেষ করে যারা বিদেশে একা থেকেছে যেখানে দোকানের খাবার অতি মহার্ঘ তারা বাধ্য হয়ে রান্না শিখেছে। এবং যেহেতু সে শিক্ষা নিজের উদরপূর্তির জন্যে, স্বাভাবিক কারণেই ক্রমশ তাদের রান্নার হাত উন্নত হয়েছে।

এ রকম দু'চারজনের রান্না আমি চেখে দেখেছি, কারো কারো রান্নার হাত সত্যি অসাধারণ। এরকমই একজন স্বশিক্ষিত প্রবাসী অধ্যাপক পাচক আমাকে বলেছিলেন, 'মেয়েদের রান্না ভালো করার ব্যাপারটা একটা নিতান্তই মিথ, মেয়েদের বাধ্য করে রান্নাঘরে রাখবার জন্যে একটা চক্রান্ত। এই সূত্রে এই তথ্যটা স্মরণ রাখবেন যে পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় পাঁচতারা হোটেলের এবং বিখ্যাত রেস্তোঁরাগুলির এমনকি কলকাতা শহরের আমিনিয়া, আমজাদিয়া, ওয়ালডরফ বা জিমিস কিচেনের পাচকও পুরুষ।'

* * *

তত্ত্বকথা থাক।

মহিলাদের রান্নার গল্প বলি।

এখনও খুব-বেশি-পুরনো-হয়নি এমন এক নববধূ তাঁর প্রতিবেশিনীকে বলেছিলেন, 'দিদি, আমার বরের বোধহয় মাথা খারাপ।'

দিদি বললেন, 'কেন ? তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন ?' বিষণ্ণ কণ্ঠে মেয়েটি বললো, 'গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে হনিমুন থেকে ফিরে এসে একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পর ওকে এগ-টোস্ট করে দিলাম। ও খেয়ে খুব তারিফ করলো। পরের দিন দিলাম খুশি মনেই খেলো। তার পরের দিনও খেলো। কিন্তু আজ কয়েকদিন হলো কী হয়েছে, এগ-টোস্ট দেখলেই খেপে যায়। গত সপ্তাহে চা আনতে রান্নাঘরে গিয়েছি ফিরে এসে দেখি জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাবারগুলো রাস্তার কুকুরগুলোকে খাওয়াচ্ছে। আর কালকে তো খাবার প্লেট সামনে দেওয়ামাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলো।'

বুদ্ধিমতী দিদি এবার একটু বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলেন 'কালকেও এগ-টোস্ট দিয়েছিলে ?' নববধূ অধোবদনে স্বীকার করলেন, 'তা দিয়েছিলাম।'

দিদির কেমন সন্দেহ হলো বললেন, 'এই এক মাস ধরে, তোমাদের হনিমুনের থেকে ফেরার পর থেকে তুমি কি প্রত্যেক দিনই তোমার বরকে এগ-টোস্ট দিয়ে যাচ্ছো ?' নববধূ বললেন, 'ও যে এগ-টোস্ট ভালোবাসে। তাই দিই। কিন্তু কী যে হলো ?'

সত্যিই কী যে হলো আমরাও বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারি দৈনিক

পোলাও মাংস খেতে খেতে রাজা-মহারাজারা হঠাৎ একদিন যে কারণে অস্থির হয়ে বৈরাগী হয়ে যেতেন এ ক্ষেত্রেও প্রায় সেই রকম ঘটতে যাচ্ছিলো। নববধূর ভাগ্য ভালো যে স্বামী বিবাগী হয়ে যায়নি।

প্রতিবেশিনী দিদি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন, তিনি সৎ পরামর্শ দিলেন নববধূকে, বললেন, 'তুমি বাপু চিঁড়ে, মুড়ি, রুটি যা পারো যা হোক জলখাবার বরকে দিয়ো কিন্তু এখন অন্তত বছরখানেক ঐ যে এগ-টোস্ট নাকি বললে ঐ জিনিসটা কিছুতে দিয়ো না।'

এক্ষেত্রে ঐ এগ-টোস্ট হয়তো সুস্বাদুই হতো, অন্যদের খেলে হয়তো ভালোই লাগতো কিন্তু দিনের পর দিন ঐ একই জিনিস খেয়ে বর বেচারির মাথা বিগড়িয়ে গিয়েছিল।

অন্য একটা গল্প বলি। সে গল্পটা এর চেয়ে করুণ।

একদিন স্বামী অফিস থেকে ফিরে দেখলেন তাঁর স্ত্রী শোয়ার ঘরে বিছানায় শুয়ে চোখের জল মুছছেন। স্বামী অবাক হয়ে গেলেন, কান্নার এমন কী কারণ হয়েছে তিনি ধরতে পারলেন না।

অনেক সাধাসাধি, অনুনয়-বিনয় পর যা জানা গেলো সে খুবই দুঃখজনক। আজ সকালে ভদ্রলোক বাজার থেকে ভেটকি মাছ এনেছিলেন। সেই মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে, পুর বানিয়ে খবরের কাগজের রন্ধনপ্রণালী দেখে ভদ্রমহিলা সারা দুপুর পরিশ্রম করে মালয়ালাম ফিস কাবাব বানিয়েছিলেন। তারপর ফ্রিজের ওপরে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে রেখে দেন এবং অত্যধিক ক্লান্তিতে বিছানায় এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এখন ঘুম থেকে উঠে দেখছেন যে কাবাব নেই, বাড়ির পোষা বেড়াল ফ্রিজের ওপর উঠে সেই কাবাব নিঃশেষে চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে। স্বরচিত মালয়ালাম ফিস কাবাবের এই পরিণতিতে ভদ্রমহিলা শোকে দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

স্বামী ভদ্রলোক কী বুঝলেন কে জানে, তবে তিনি যা বললেন তা খুবই বিপজ্জনক। স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ছিঃ, বেড়ালের জন্যে কেঁদো না। আমাদের অফিসে একটা মেনি বেড়ালের চমৎকার সব ছানা হয়েছে, তার থেকে একটা তোমাকে এনে দেবো।'

বিষয়টি সত্যিই গোলমেলে। আমরা বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাবো না। তবে স্বামীর কেন ধারণা হলো যে স্ত্রীর তৈরি ফিস কাবাব খেয়ে পোষা বেড়াল মরে গেছে এবং স্ত্রীর এত কষ্টের রান্নার প্রতি কেনই বা এই কটাক্ষপাত—কোনো কোনো ভুক্তভোগী হয়তো ভালো বলতে পারবেন ; আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাই।

সুখের বিষয় বর্তমান প্রসঙ্গে স্ত্রী অনুপস্থিত। ঘটনাটা ঘটেছিল আমারই অফিসে। একটি নতুন ছেলে এসেছে। প্রতিদিনই টিফিনের সময় দেখি টিফিনের কৌটো খুলে মুখ ব্যাজার করে স্বগতোক্তি করে, 'ধুৎ আবার সেই রুটি বেগুনভাজা।'

একদিন আর সহ্য করতে পারলাম না। তাকে বললাম, 'বাড়িতে বললেই পারো, তোমাকে অন্য কিছু টিফিন দেবে।' সে বললো, 'বাড়িতে আবার কী বলবো ? আমি তো এখানে একা থাকি। আমাদের বাড়ি তো বাঁকুড়ায়।' আমি বললাম, 'তা হলে ?' সে করুণ হেসে বললো, 'ও টিফিন আমিই সকালবেলা নিজে বানিয়ে কৌটোয় ভরে নিয়ে আসি।'

প্রজাপতির কাহিনী

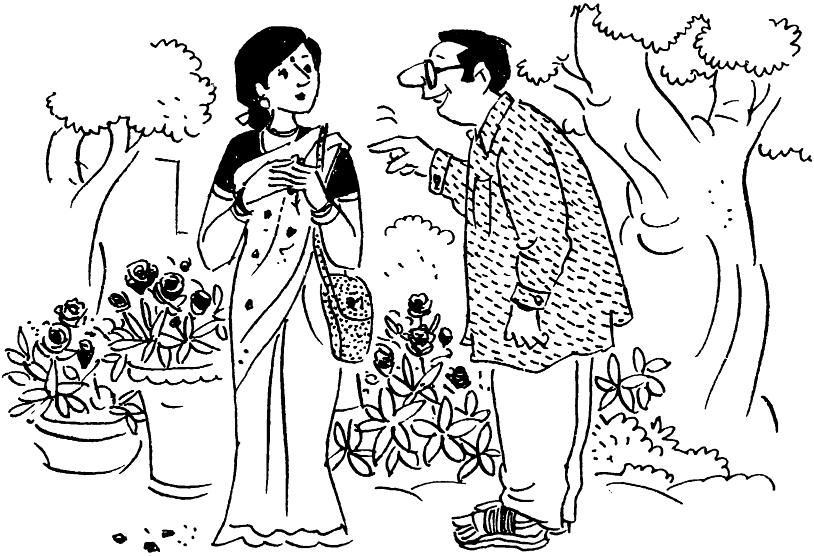

শিবপুরের বাগানে দুটো রঙিন প্রজাপতির মধ্যে গভীর প্রেম হয়েছিল। এ সব ক্ষেত্রে যেমন হয় একদিন ছেলে প্রজাপতিটা মেয়ে প্রজাপতিকে প্রস্তাব দিলো। 'চলো, কলকাতা থেকে বেরিয়ে আসি।'

একটু দোনামনা করে মেয়ে প্রজাপতি প্রশ্ন করলো, 'তুমি পথ চিনে কলকাতায় যেতে পারবে ?' ছেলে প্রজাপতি জবাব দিলো, 'সে আর কঠিন কি ?' মেয়ে প্রজাপতি তবু বললো, 'যদি কোনো বিপদ হয় ?' দুবার রঙিন পাখা কাঁপিয়ে ছেলে প্রজাপতি বললো, 'আমি পাশে থাকতে তোমার বিপদ ?'

পরের দিন সকাল সকাল দু'জনে রওনা হলো কলকাতার দিকে। প্রজাপতির তো আর ট্রাম-বাস দরকার পড়ে না দু'জনে ওড়া পথে রওনা হলো। হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত এসে তারপর হাওড়া ব্রিজ ধরে উড়ে উড়ে গঙ্গা পার হতে লাগলো তারা।

যখন পুল প্রায় পার হয়ে এসেছে হঠাৎ পুরুষ প্রজাপতিটা ভাবলো মেয়েটাকে একটু বীরত্ব দেখাই, সে বললো, 'জানো আমার ডানার ধাক্কা দিয়ে এই পুলটাকে একদম ভেঙে ফেলতে পারি।'

নিচে ব্রিজের ওপর দিয়ে এক বৃদ্ধ হেডমাস্টার হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সত্যি কথা বলার বাতিক আছে, পুরুষ প্রজাপতির এই কথাটা তাঁর কানে যাওয়ায় তিনি সেটাকে কাছে

ডাকলেন, প্রজাপতিটা যখন উড়তে উড়তে তাঁর কাছে এলো তখন সেটাকে বললেন, 'এ সব বাজে কথা বলা কোথায় শিখেছো ? এত বড় একটা ভারী ব্রিজকে তুমি তোমার ঐ তুচ্ছ হালকা ডানা দিয়ে ভেঙে দিতে পারবে ?'

পুরুষ প্রজাপতিটা মাস্টার মশায়ের ধমক খেয়ে ঘাবড়িয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বললো, 'না স্যার। ও কথা আমি এমনি এমনি বলেছি। আমার সঙ্গে ঐ পিছনে আমার যে মেয়ে বন্ধুটা আসছে ওর কাছে বাহাদুরি নেয়ার জন্যে মিছিমিছি ও কথা বলেছি।'

মাস্টার মশায় লোক খারাপ নন, তার ওপরে প্রজাপতিটার সঙ্গে তার সঙ্গিনী রয়েছে। তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে যাও। কিন্তু আর মিথ্যে কথা বলো না।'

মাস্টার মশাইয়ের কাছে ধমক খেয়ে প্রজাপতিটা তার সঙ্গিনীর কাছে ফিরে যেতে কৌতূহলবশত সেই সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলো, 'ও ভদ্রলোক তোমাকে কী বললেন, গো ?' পুরুষ প্রজাপতিটা বললো, 'কী আর বলবেন। অনুনয়, বিনয় করলেন, খুব অনুরোধ করলেন ব্রিজটা যেন ভেঙে না ফেলি। মানুষজন তো আমাদের মতো উড়ে যেতে পারে না ব্রিজটা ভেঙে ফেললে তাদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাবে।' এর পরে খুব সুবিবেচকের মতো মুখ করে সে তার সঙ্গিনীকে বললো, 'ঠিক আছে, ভাঙবো না।'

* * *

এরপর অন্য এক রঙিন প্রজাপতির কাহিনী বলি। এই প্রজাপতিটি একটি মানুষী তরুণী।

এই তরুণীটি একদিন রাতে ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখলো যে সে একটা ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার চারপাশে সবুজ পাতা, রঙিন ফুল আর ঝলমলে হাজার হাজার প্রজাপতি।

হঠাৎ সেই প্রজাপতির ভিড় থেকে প্রজাপতিদের রাজকুমার, যে কোনো মানুষের থেকে সে অনেক বেশি সুন্দর অনেক চমৎকার দেখতে, সেই রাজকুমার উড়তে উড়তে এসে সেই তরুণীটিকে দুই ডানার মধ্যে জাপটিয়ে ধরে ফুলের বনের মধ্যে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চললো।

তরুণীটির খুব ভাল লাগছিল এই স্বপ্নভ্রমণ, প্রজাপতির এই রঙিন আলিঙ্গন। কিন্তু মানবীজনোচিত স্বাভাবিক ব্রীড়াবশত সে সামান্য বাধা দিল, বললো, 'এই কী হচ্ছে কি ?'

প্রজাপতি রাজকুমার আরো ঘন করে জড়িয়ে ধরে তাকে বললো, 'কী আর হচ্ছে ? আমি তোমাকে কোলে করে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

স্বাভাবিকভাবেই এবার মেয়েটি প্রশ্ন করতে বাধ্য হলো, 'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ?' প্রজাপতি রাজকুমার এবার তার আলিঙ্গন উন্মোচন করে দিয়ে বললো, 'কোথায় যাচ্ছি আমি কী করে বলবো ? এতো তোমার স্বপ্ন তুমি দেখছো, আমি কী জানি ?' মেয়েটি ঘুম ভেঙে বিছানায় পড়ে গেলো।

এর পরের গল্প একটু অন্যরকম। এক ভদ্রলোক তাঁর তৃতীয়বার বিয়ের সময় বললেন, 'এই তৃতীয় পক্ষের বৌটাকেই আমার প্রথমবারে বিয়ে করা উচিত ছিল। সেই ছোটবেলা থেকে ভালবাসা, পরিচয় আমাদের। পাড়ার লোকে বলতো, যেন দুটি রঙিন প্রজাপতি', বলে ভদ্রলোক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

যারা শুনছিল বললো, 'ভালোই তো হলো। শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গেই আবার আপনার

বিয়ে হলো।'

ভদ্রলোক নতুন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাতো হলো। কিন্তু প্রথম বারেই বিয়েটা হয়ে গেলে আর কিছু না হোক অন্তত দুটো শ্রাদ্ধের খরচ বাঁচতো আমার।'

* * *

বিবেক বলছে, প্রজাপতির কাহিনীকে শ্রাদ্ধের মধ্যে নিয়ে আসা খুব অন্যায় হচ্ছে।

সুতরাং অন্য গল্পে যাই।

এক মেয়ে প্রজাপতির মাতাঠাকরুন খুবই সন্দিগ্ধমনা। তিনি সদাসর্বদা তাঁর মেয়েকে চোখে চোখে রাখতে চান, যতটা পারেন আগলাতে চান।

মেয়ে বিকেলে একটু বেরিয়েছে। ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। মেয়ে ফেরামাত্র মা চেপে ধরলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?' মেয়ে মুখ বুজে জবাব দিলো, 'সুভাষ সরোবরে।'

মাতৃদেবী এ কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে গেলেন, 'এই ভর সন্ধ্যায় একা একা সুভাষ সরোবরে?' মেয়ে বললো, 'একা একা নয়। অনলদা সঙ্গে ছিল।'

মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সন্ধ্যাবেলা অনলদার সঙ্গে সুভাষ সরোবরে? বাড়ি ফিরলি কী করে?'

মেয়ে বললো, 'অনলদা টিউশনি করতে চলে গেল। বেলেঘাটার মোড়ে কালুর সঙ্গে দেখা হলো। সেই রিকসা করে বাড়ি পৌঁছে দিলো।'

মা বললেন, 'কালু? কোন্ কালু?' মেয়ে বললো, 'সেই যে সাউথ পয়েন্টে আমার সঙ্গে পড়তো।' মা বললেন, 'সেই কালুকে তুই এখনো ভালবাসিস?'

মেয়ে বললো, 'মা, তুমি আমার ভালবাসা নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছো কেন? তোমার কি?' মা বললেন, 'ভালবাসা নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো না? সুনীল গাভাসকর ক্রিকেট নিয়ে মাথা ঘামায় না? শৈলেন মান্না ফুটবল নিয়ে মাথা ঘামায় না? প্রফুল্ল সেন রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না? ওরা কি এখনো খেলে? খেলে না কিন্তু মাথা ঘামায়। আমিও খেলি না কিন্তু মাথা ঘামাই। ঘামাতেই হয়।'

পুনশ্চঃ

শেষ গল্প প্রজাপতিভরা এক গোলাপ বাগানের। এক গণিতের অধ্যাপক তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে গোলাপ বাগানে ঘুরে ঘুরে প্রেম করছিলেন।

প্রেমের বাড়াবাড়ি দেখে প্রেমিকাটি একটু সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠে। একটা পুরনো প্রথায় সে তার ভালবাসা নিরিখ করতে যায়।

সামনের একটা গোলাপ গাছ থেকে একটা গোলাপফুল ছিঁড়লো প্রেমিকাটি। তারপর তার পাপড়িগুলি হাত দিয়ে একের পর এক ছাড়াতে ছাড়াতে গুণতে লাগলো, 'তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাসো', তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাসো না।'

উদ্দেশ্যটা এই যে শেষ পাপড়িটা যা হবে সেটাই হবে আসল কথা।

অঙ্কের অধ্যাপক যখন বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী তখন দেখলেন খুব সময় নষ্ট হচ্ছে। বাধ্য হয়ে প্রেমিকাকে বললেন, 'এতো সময় আর পরিশ্রম ব্যয় করছো কেন? কতগুলো পাপড়ি আছে গুনে ফেলো। যদি বেজোড় হয় আমি তোমাকে ভালবাসি আর যদি জোড় হয় তা হলে আমাদের এই জোড় মিথ্যে।'

কুৎসিত

গড়াতে গড়াতে, নামতে নামতে অবশেষে 'কুৎসিত' পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। কুৎসিত শব্দের অর্থ কদাকার, বিশ্রী বা জঘন্য।

মানুষ দেখতে কুৎসিত হয়, তার ব্যবহার কুৎসিত হয়। কুৎসিত পরিবেশের ব্যাপারটা আমরা জানি। কুৎসিত চিন্তা বা কুৎসিত ছবি, বই সিনেমা— কুৎসিত বিশেষণটি আমরা হামেশাই ব্যবহার করি।

তবে কুৎসিত ব্যাপারটা আপেক্ষিক। আমার কাছে যে কুৎসিত অন্যের কাছে এমন কি আপনার কাছেই হয় তো সেটা মোটেই কুৎসিত নয় বরং রীতিমতো গ্রহণযোগ্য। যে মেয়েকে কুদর্শনা ভেবে রাম তাকিয়েও দেখেনি তারই প্রেমে গদগদ হয়ে রামের বন্ধু শ্যাম সেই মেয়ের গলায় মালা দিয়েছে।

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। কিন্তু শুধু তাই নয় একজনের চোখে যা সুন্দর, অন্যের চোখে তা সুন্দর নয়। যেমন কুৎসিতের তেমনি সুন্দরের নিকষে নিরিখ করার কোনো মাপকাঠি নেই।

সে যা হোক, আমরা আপাতত সুন্দর-কুৎসিতের দ্বন্দ্বে যাচ্ছি না। আমরা এখন শুধু কুৎসিত, যাকে বলে হাড় কুৎসিত, সেই হাড় কুৎসিতের আখ্যানে সীমাবদ্ধ থাকবো

হাড় কুৎসিত শব্দটার আসল মানে কি আমার তা বোঝানোর সাধ্য নেই। হাতের কাছে

দুটো অভিধান আছে তার মধ্যেও শব্দ দুটো দেখতে পাচ্ছি না।

তবে একটা গল্প বলি। তাতে অর্থটা নিশ্চয় স্পষ্ট হবে।

গল্পটা পুরনো। আমি নিজেও আগে একবার লিখেছি ; তবে রক্ষা এই যে মহাভারতে নয়। বেতারেও কৌতূহল বিষয়ে একটা রচনায় গল্পটা পড়েছিলাম। তবে সে আর কে শুনেছে।

দুই বোন। দুজনেই উত্তরযৌবনা, অবিবাহিত এবং ডাকসাইটে কুৎসিত। মেয়েলি ভাষায় যাকে বলা চলে, 'এ বলে আমাকে দ্যাখ্, ও বলে আমাকে দ্যাখ্।' দুই বোনের মধ্যে বড় বোন বাড়িতে থাকে আর ছোট বোন অন্য জায়গায় চাকরি করে। বড় বোনের অসুখ হয়েছে। খবর পেয়ে ছোট বোন এসেছে। পাড়ার ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছে, তিনি দু-চারদিন চিকিৎসার পর ব্যাপার বেগতিক দেখে বললেন, 'স্পেশালিস্ট দেখাতে হবে। আমি অসুখটা ঠিক ধরতে পারছি না।' ছোট বোন জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিদির কী অসুখ হয়েছে বলে মনে হয় আপনার ?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'বললাম তো আমি কিছু ধরতে পারছি না। আর তা ছাড়া সেটা জেনে আপনার কী লাভ হবে ? আপনি তো আর চিকিৎসা করবেন না, চিকিৎসা করবো আমি।'

স্পেশালিস্টকে ডাকা হলো। কিন্তু অসুখটা কী সেটা জানতে হবে, ডাক্তারবাবুরা হয় তো বলবেন না, গোপন রাখবেন। দু-বোনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, রোগী দেখা হয়ে যাওয়ার পর রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে ডাক্তারবাবুরা যখন বাইরের ঘরে যাবেন তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে নিশ্চয় অসুখটা নিয়ে আলোচনা করবেন, সেই সময় বাইরের ঘরের ভিতরের দরজার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ডাক্তারেরা কী কথাবার্তা বলেন সেটা ছোট বোন শুনবেন এবং তাহলেই অসুখটা কী, কতটা গুরুতর সেটা বোঝা যাবে।

পরামর্শমত কাজ হলো। ডাক্তাররা রোগিণীকে দেখে হাত ধুয়ে বাইরের ঘরে এসে বসলেন প্রেসক্রিপশন লেখার কাগজ নিয়ে। ছোট বোন পর্দার আড়ালে লুকিয়ে শুনতে লাগলেন ডাক্তারবাবুরা কী বলেন। তিনি আগে থেকেই পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছেন। বাড়ির কাজের মেয়েটি ততক্ষণ ডাক্তারবাবুদের দেখেছে। সে বাড়ির মধ্যে গেলো ভিজিটের টাকা আনতে। কিন্তু এদিকে অসুখ নিয়ে কোনো কথা না বলে স্পেশালিস্ট ডাক্তার বাইরের ঘরে আসামাত্র বললেন, 'আরে মশায়, আপনার এই রোগিণী। এর যা রোগ হয়েছে সে তো আলাদা কথা কিন্তু এ রকম কুৎসিত দেখতে মহিলা জন্মেও চোখে পড়েনি।' এই শুনে পারিবারিক চিকিৎসক বললেন, একে আর কি কুৎসিত দেখলেন, এর একটা ছোট বোন আছে, সেটাকে দেখাতে পারলাম না : সেটা যেন কোথায় গেছে। সেটা দিদির এককাঠি ওপরে। একেবারে আসল হাড়-কুৎসিত যাকে বলে তাই।'

পর্দার আড়ালে ধপাস করে একটা শব্দ হলো। ছোট বোন, যিনি এতক্ষণ লুকিয়ে ডাক্তারবাবুদের কথোপকথন শুনছিলেন আত্মবর্ণনা শুনে অজ্ঞান হয়ে মেজেতে পড়ে গেলেন।

এরই কাছাকাছি আরো একটা কাহিনী আছে।

এক ভদ্রমহিলার কোন শোধ-বোধ নেই। জায়গা-অজায়গা নেই, কারণে-অকারণে তিনি উলটোপালটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেন।

ভদ্রমহিলা একদিন তাঁর এক বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। বাইরের ঘরের ড্রইংরুমে বান্ধবীটি তখন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ভদ্রমহিলা এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে ঐ ভদ্রলোককে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ভদ্রলোক উঠে চলে যেতেই তিনি তাঁর বান্ধবীকে প্রশ্ন করলেন, 'এই রকম ঘোড়ামুখো, কদাকার দেখতে লোকটা কে ?'

বান্ধবী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'কেন ? ওতো আমার দেওর। অনিমেষের ছোট ভাই।' বলাবাহুল্য অনিমেষ বান্ধবীটির বরের নাম। একথা শুনে প্রশ্নকারিনী একটু বিপাকে পড়লেন। ব্যাপারটা এরকম গড়াবে তিনি ভাবতে পারেননি। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করার জন্যে বললেন, 'দ্যাখো কাণ্ড ! আমার যেন কী হয়েছে। সব গুলিয়ে ফেলি। চেহারায় এত মিল। ও ভদ্রলোককে দেখেই তো আমার বোঝা উচিত ছিল ও অনিমেষের ভাই।'

* * *

কুৎসিতের কাহিনীর সঙ্গে বিনা প্ররোচনায় ডাক্তাররা কেন যেন জড়িয়ে যান। প্রথম গল্পে দুজন ডাক্তার ছিলেন, শেষ গল্প দুটিতেও একজন করে ডাক্তার আছেন।

শেষ গল্পের প্রথমটিতে ডাক্তারবাবু অতি সাবধানী। তিনি তাঁর এক দুর্বল হৃদয় রোগীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'এমন কিছু করবেন না যাতে হঠাৎ শক লাগতে পারে। মনের মধ্যে ধাক্কা লাগে।'

তারপর অনেকক্ষণ ভেবে, অনেক চিন্তা করে তেমন-ভালো-দেখতে-নন সেই রোগীকে ডাক্তার বললেন, 'আমি বলি কি এখন দুয়েকমাস দাড়ি-টাড়ি কামাবেন না, আয়নায় মুখ-টুখ দেখতে যাবেন না, কোনো দরকার নেই।'

শেষ কাহিনীটি আমার নিজেকে নিয়ে। সেখানেও ঐ ডাক্তার।

আমি যে দেখতে পরম সুন্দর নই, সে কথা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব যা বলেছিলেন সে বড় মর্মান্তিক।

কি একটা দরকারে আমার একটা এক্স-রে তুলতে হয়েছিল। সেই এক্স-রেটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ডাক্তার সাহেব কয়েক মুহূর্ত অপলক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'আপনি ভিতরে-বাইরে সমান কুৎসিত।'

স্মরণ-বিস্মরণ

সোজা কথা হলো মনে রাখা এবং ভুলে যাওয়া। সেই এক অবচীন কবি একদা লিখেছিলেন,

'মনে রাখা নিয়ে আজ
আমাদের অনেক সংশয়...... ।'

মনে রাখা নিয়ে মনের মধ্যে সংশয় সকলেরই রয়েছে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দরজায় চাবি না দিয়ে বেরোনো, বাজার করতে গিয়ে আসল দরকারি জিনিস কিনতে ভুলে যাওয়া। ট্রামে ছাতা ফেলে আসা—কতরকম ভুল আমাদের।

আমরা লাইব্রেরির বই ঠিক সময়ে ফেরত দিতে ভুলে যাই, সিনেমার টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা মনে থাকে না। চিঠি লিখে পকেটে করে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে তারপর ডাকবাক্সে ফেলতে ভুলে যাই। তারপর সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরে খেয়াল হয়, 'আরে চিঠিটা যে বুক পকেটে রয়ে গেছে'।

শিবরাম চক্রবর্তীর সেই গল্পটা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্ত্রী চিঠি লিখে স্বামীকে দিয়েছেন পোস্ট করতে, স্বামীকে বারবার বলে দিয়েছেন, 'দেখো, ভুলে যেয়ো না যেন, রাস্তার মোড়ের ডাকবাক্সেই সবার আগে চিঠিটা ফেলবে তারপর অন্য কাজে যাবে।' স্বামী মাঝে মাঝে ডাকবাক্সে চিঠি ফেলতে আর অন্য দশজনের মতোই ভুলে যান, আজ কিন্তু ভুলে

গেলেন না।

মোড়ের মাথায় পৌঁছেই স্বামী সযত্নে স্ত্রীর চিঠিটি ডাকবাক্সে ফেললেন। তিনি আজো হয়তো চিঠি ফেলতে ভুলেই যেতেন, মোড়ের মাথায় ডাকবাক্স পেরিয়ে আনমনে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে এক সম্পূর্ণ অচেনা পথচারী তাঁকে ডেকে বললেন, 'ও দাদা আপনার বৌয়ের চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলতে ভুলবেন না যেন ?'

পথচারীর প্রশ্ন শুনে স্বামী তাড়াতাড়ি ফিরে ডাকবাক্সে চিঠিটা ফেললেন বটে কিন্তু তাঁর মনে খটকা লাগলো, 'আমাকে যে আমার বৌয়ের চিঠি পোস্ট করতে হবে সেটা এ ব্যাটা জানলো কী করে ?'

গোলমালটা কিন্তু সারাদিন ধরেই অব্যাহত রইলো। চিঠি ডাকবাক্সে ফেলার পরেও পরিত্রাণ পাওয়া গেলো না, ক্রমাগতই রাস্তায় এবং তারপরে অফিসে এবং তারো পরে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধেবেলায় পথের অচেনা লোকজন, অফিসেও চেনা লোকেরা শুধাতে লাগলো, 'ও দাদা বৌদির চিঠিটা ডাকে ফেলেছেন তো ?' 'ও ভাই বৌমার চিঠিটা পোস্ট করতে ভুলে যাওনি তো ?'

স্বামী বেচারা এই অলৌকিক প্রশ্ন এবং উপদেশমালায় বিভ্রান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরলেন, মনে মনে ঠিক করলেন যে আজ বৌকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। চিঠি ডাকে দেয়ার ব্যাপারটা কী করে এত লোক জানাজানি হলো।

বাড়ি ফিরে কিন্তু জবাবদিহির কোনো প্রয়োজন পড়লো না। গায়ের জামাটি খুলে বেচারা যখন আলনায় রাখতে গেছে, সবিস্ময়ে দেখলো জামার পিঠে আলপিন দিয়ে একটা চিরকুট লাগানো আছে, তাতে লেখা,

'আমার বরের বড় ভুলো মন।

ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন যেন আমার চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলতে ভুলে না যায়।'

* * *

(পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় শিবরাম চক্রবর্তী নিশ্চয়ই স্বর্গ থেকে এই খণ্ডলেখককে ক্ষমা করবেন। তাঁর এই ব্যর্থ অনুকারক এবং অসফল শিষ্য কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারলো না 'ভুলে যাওয়া' সম্পর্কে তাঁর ঐ অসামান্য উপাখ্যান। গল্পটা খুঁজে বের করার অবসর নেই এই তাৎক্ষণিক রচনায়, যা মনে পড়ে, মনে আসে তাই লিখলাম।)

* * *

বিস্মরণের অন্যান্য কাহিনীতে যাই।

প্রথম কাহিনীটি বিলিতি, মনোসমীক্ষক জড়িত আছেন এই গল্পে।

এক ভদ্রলোক, যিনি সব কিছু ভুলে যান। মনোসমীক্ষককে দিয়ে চিকিৎসা করাতে গেছেন।

চিকিৎসক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার অসুবিধেটা কী ?'

রোগী বললেন, 'সব কিছু বড় ভুলে যাই।'

চিকিৎসক বললেন, 'কী ভোলেন এত ?'

রোগী বললেন, 'সকালে কী খেয়েছি দুপুরে মনে থাকে না। চিঠি লিখতে বসে ভুলে যাই

কাকে লিখবো ? তাও যদি মনে পড়ে কি লিখবো মনে করতে পারি না। টেলিফোনে ডায়াল করতে করতে ভুলে যাই, কেন-কাকে ডায়াল করছি। ক্যালেন্ডারে তারিখ দেখতে গিয়ে মনে পড়ে না আজ কি বার। ফলে বার আর তারিখ দুইই গুলিয়ে যায়।'

চিকিৎসক এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরকম ঠিক কতদিন হলো হয়েছে আপনার ?'

রোগী বললেন, 'কীরকম স্যার ?'

চিকিৎসক বললেন, 'এই যে এতক্ষণ বললেন সব।'

চিন্তিত রোগী মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'কি বললাম স্যার ? কিছুতে মনে করতে পারছি না।'

এর পরের গল্প ঠিক বিস্মরণের কিনা বলা কঠিন। কেউ হয়তো বলবেন এটা নির্বুদ্ধিতার গল্প।

বাড়ির সদর দরজার কলিং বেলটা কয়েকদিন হলো খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাড়ার মোড়ের দোকানে ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে বলে এসেছিলাম, সে বলেছিল, 'বিকেলে যাবো।'

সেদিন বিকেলে তো এলোই না, তার পরেও দু'দিন গেল ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কোনো পাত্তা নেই। সুতরাং তিনদিনের মাথায় অফিস থেকে ফেরার পথে আবার মিস্ত্রির খোঁজে তার ইলেকট্রিকের দোকানে গেলাম।

সেখানে গিয়ে যা শুনলাম তা শুনে বেশ বোকা বনে গেলাম। মিস্ত্রি বললো, 'দুদিন আপনার বাসায় গিয়ে ঘুরে এসেছি। কেউ সাড়া দেয়নি।' আমি অবাক হয়ে গেলাম, 'সে কী ? বাসায় তো সব সময়েই লোক ছিল। এর মধ্যে তো কখনো বাসা ফাঁকা ছিল না।'

মিস্ত্রি সবিস্ময়ে বললো, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেল। আমি অতক্ষণ ধরে বেল টিপলাম। কেউ তো দরজা খুললো না। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম।'

আমি মিস্ত্রিকে বোঝাতে যাচ্ছিলাম, 'কলিং বেল খারাপ। তুমি সেটাই সারাতে গেছো। এ কথা তুমি খেয়াল করলে না, সেই ভাঙা বেলটাই টিপে সাড়া না পেয়ে ফিরে এলে'। কিন্তু এসব কিছু বলতাম না, শুধু বললাম, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো। এখনই সারিয়ে ফেলবে।'

এর পরের কাহিনীটি এক পণ্ডিত ব্যক্তির। ভদ্রলোক রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি এক ওষুধের দোকানে গেছেন, দোকানে ঢুকে কি যেন ভুলে গেলেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তারপর ওষুধের দোকানদারকে বললেন, 'আমাকে একটু অ্যাসেটিল স্যালিসিলিক অ্যাসিড দিতে পারেন ?'

দোকানদার কিছুক্ষণ চিন্তা করে তারপর জানালেন, 'এ নামে কোনো ওষুধের খবর তাঁর জানা নেই।' অধ্যাপক চিন্তিত মনে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ ফিরে এলেন এবং কি যেন মনে পড়ার আনন্দে উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে জিনিসটার নাম হলো অ্যাসপিরিন।'

ওষুধের দোকানদার হতবাক হয়ে রসায়নের অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, এ কিরকম ব্যক্তি যে এত বড় একটা কথা অ্যাসেটিল স্যালিসিলিক অ্যাসিড মনে রাখতে পারে অথচ সামান্য অ্যাসপিরিন মনে রাখতে পারে না !

অতঃপর এই অধ্যাপক মহোদয়কে শেষ করে বিস্মরণ বৃত্তান্ত শেষ করি।

অধ্যাপক মহোদয় একদিন সকালবেলা বিছানায় শুয়েছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি মারা গেছেন। কেউ ধরতে পারলো না, তাঁর কী হয়েছিল শুধু তাঁর অভিজ্ঞা স্ত্রী বললেন, 'যা ভুলো মন, হয়তো নিঃশ্বাস নিতেই ভুলে গিয়েছিল।'

গুরু-শিষ্য সংবাদ

আজকাল লেখাপড়ার বোঝা বড় বেড়ে গেছে। যেমন বইয়ের বোঝা, তেমনই খাতার বোঝা। আর খাতার বোঝা মানেই হোমটাস্কের বোঝা। যে ইস্কুলের যত বই-খাতা, যত হোমটাস্কের চাপ সেই ইস্কুলের তত নাম, তত কদর। সেখানে ভর্তি হওয়াও তত কঠিন।

শোনা যায়, প্রসূতি সদন থেকে সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে মায়েরা সে সব ইস্কুলে বাচ্চার নাম রেজিস্ট্রি করে যায় যাতে পাঁচ কিংবা ছয় বছর পরের ভর্তির পরীক্ষায় বাচ্চাটি বসতে পারে। এর চেয়ে দেরি হলে নাকি ভর্তির পরীক্ষাই দেয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন, কর্পোরেশনে বার্থ রেজিস্ট্রেশনের আগেই ইস্কুলের ওয়েটিং লিস্টে নাম লেখানো উচিত ও সুবিধাজনক।

এ সব করে হয়তো ভর্তির পরীক্ষায় বসা গেল এবং মা-বাবার কপালগুণে এবং পাঁচ-ছয়জন প্রাইভেট টিউটরের বৎসরাধিক নিরন্তর অধ্যবসায়ে সাড়ে পাঁচ বছরের বাচ্চাটি হয় তো ভর্তির পরীক্ষায় উতরিয়ে গেল।

তারপর ?

তারপর সে এক বিভীষিকা। বই-বই, বই জমতে জমতে পাথর ! মুখে হাসি নেই, চোখের কোণায় কালি, খেলা নেই, ধুলো নেই—বইয়ের ভারে নুয়ে পড়েছে ছয় বছরের শিশু। কেউ বলার নেই, 'বইগুলো সরিয়ে নাও'।

একটি সামান্য শিশুকে এখন যে কত রকম বিচিত্র বিষয়ে জটিল অধ্যয়ন করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই।

আর কে লক্ষ্মণের একটি বিখ্যাত কার্টুনে একটি স্কুলঘরের ছবি আছে। অপ্রসন্ন মুখে চশমা চোখে খোঁচা গোঁফওয়ালা হেডমাস্টার মশায় বসে রয়েছেন অফিস ঘরে, টেবিলের উলটোদিকে এক ভদ্রলোক তাঁর কোলে এখনো সব দুধের দাঁত ওঠেনি এমন এক শিশু।

শিশুর পিতাকে হেডমাস্টার মশায় বলছেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনার ছেলে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, প্রাচীন সাহিত্য, প্রকৃতি বিজ্ঞান, ভূগোল আর মধ্যযুগের ইতিহাসে অত্যন্ত কাঁচা।' পিতা বিস্মিত মুখে হেডমাস্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এবং দোষী শিশুটি হতভম্ব হয়ে বাবার কোলে বসে রয়েছে।

হয়তো এতটা নয়। কার্টুনিস্ট তো একটু বাড়াবাড়ি অবশ্যই করবেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে একালের শিশুদের পাঠের বোঝা যে সত্যিই কত গুরুতর অভিভাবক মাত্রেই সেটা জানেন।

বহু অভিভাবকের সারাদিনের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেলে বা মেয়ের ইস্কুলের হোমটাস্ক করে দেয়া। আর সে কী হোমটাস্ক—খাতার পর খাতা, পাতার পর পাতা। শুধু ছেলেমেয়ে কেন বাবা মায়ের পক্ষেও সেগুলো করা কম কঠিন নয়।

একটা গল্প আছে এ সম্পর্কে। ইস্কুলে মাস্টারমশায় ছাত্রদের হোমটাস্কের খাতা দেখছেন। একটি ছাত্রের খাতা দেখে খুব বিরক্ত হলেন তিনি, খালি ভুল আর ভুল। ভুলগুলো কাটতে কাটতে অশেষ বিরক্তভরে মাস্টারমশায় ছেলেটিকে বললেন, 'একজনে এত ভুল করতে পারে ভাবাই যায় না।' ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কিন্তু স্যার সব ভুল তো আমি একা করিনি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'মানে ? তুমি কী বলছো কিছু বুঝতে পারছি না।' ছেলেটি বললো, 'মানে আর কি স্যার ? আমার বাবাও আমাকে হোমটাস্ক করার সময়ে সাহায্য করেছেন। তাই বলছিলাম যে সব ভুল তো আমি একা করিনি।'

এরপরের গুরু-শিষ্যের গল্পেও হতভাগা বাবা বেচারী রয়েছেন।

দুদিন কামাই করে ছাত্রী ইস্কুলে এসেছে। দিদিমণি বললেন, 'তুমি কী জন্যে দুদিন ক্লাশে আসোনি। তোমার ছুটির দরখাস্ত কই ?'

মেয়েটি করুণমুখে বললো, 'মা খুব ব্যস্ত ছিল সকালে। তাই দরখাস্তটা লিখে উঠতে পারেনি।' দিদিমণি বললেন, 'কেন তোমার বাবা বাসায় ছিলেন না। তিনিই তো লিখে দিতে পারতেন।' মেয়েটি বলল, 'আমি তো ইচ্ছে করে কামাই করেছি। মিথ্যে মিথ্যে বানিয়ে দরখাস্ত লিখতে হবে। বাবা ওটা ভালো পারে না। কাল মাকে দিয়েই দরখাস্তটা লিখিয়ে নিয়ে আসবো।'

ক্লাশ কাহিনীমালায় পিতৃদেবের আরো একটি গল্প আছে। ভূগোলের মাস্টারমশায় ছাত্রের খাতায় আঁকা ভারতবর্ষের ম্যাপ দেখে ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ম্যাপ আঁকায় তোমাকে কে সাহায্য করেছে ?'

ছাত্র বললো, 'কেউ করেনি স্যার।'

উত্তর শুনে মাস্টারমশায় ধমকে উঠলেন, 'তুমি বলতে চাও এই ম্যাপ আঁকার সময় তোমার বাবা তোমাকে সাহায্য করেননি। তুমি একাই এঁকেছো ম্যাপটা।'

ছাত্র বললো, 'না স্যার, আমাকে বাবা মোটেই সাহায্য করেনি। বাবা নিজেই একা ম্যাপটা এঁকেছে।'

অতঃপর পিতৃদেবকে ছুটি দিচ্ছি। ইস্কুলের অন্য গল্পে যাই।

ছাত্র ক্লাশে দেরি করে এসেছে। মাস্টারমশায় তাকে ধরলেন, 'কি হে দেরি হলো কেন ? ছাত্র অসঙ্কোচে বললো, রাস্তায় আস্তে আস্তে আসছিলাম, তাই দেরি হলো।'

মাস্টারমশাই এই জবাব শুনে স্বাভাবিকভাবেই রেগে গেলেন, বেত উঁচিয়ে বললেন, 'আস্তে আস্তে এলে কেন ? জোরে এলে কি ক্ষতি হতো।' ছাত্র বললো, 'স্যার ইস্কুলের রাস্তায় নোটিশ বোর্ডে দেখলাম

"সামনে ইস্কুল।
আস্তে যাও।"

তাই দেখে আস্তে আস্তে এলাম নোটিশ ভঙ্গ করবো কী করে ?'

বলা বাহুল্য, এ ছাত্রটি শয়তান। তবে এ তবু ইস্কুলে এসেছে। অন্য একটি ছেলের গল্প জানি। যে মোটেই ইস্কুলে যাওয়া পছন্দ করতো না ; যদি বা যেতো, সেও খুব শুকনো মুখে।

এই ছেলেটির আর দুই ভাই আছে, তারা বড়ো। এক রবিবার দিন ঐ দুই ভাই ঠিক করলো ইস্কুল-ইস্কুল খেলবে। ছোটটিকেও খেলতে ডাকলো। ছেলেটি যখন শুনলো খেলাটা ইস্কুলঘটিত সে খেলতে অস্বীকার করলো। অবশেষে দাদাদের জোরাজুরিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে খেলতে রাজি হলো তবে একটি শর্তে। শর্তটি হলো ইস্কুল-ইস্কুল খেলায় সে সাজবে ইস্কুল পালান ছেলে।

* * *

পুনশ্চ :

ইস্কুলের ক্লাশে মাস্টারমশায় ছাত্রদের বিভিন্ন শব্দের মানে জিজ্ঞাসা করছেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো দেখি নরখাদক মানে কি ?'

মানেটা খুব কঠিন নয়, শব্দের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু ছাত্রটি একটু বোকাসোকা। বেশ কিছুক্ষণ ঘাড়-মাথা চুলকিয়ে তারপর কবুল করলো, 'জানি না, স্যার।'

মাস্টারমশায় এবার একটু কায়দা করে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যদি তোমার মা বাবাকে খেয়ে ফেলো তাহলে তুমি কি হবে ?'

এবার উত্তর দিতে ছাত্রটির এক বিন্দু দেরি হলো না, দাঁত বার করে হেসে সে বললো, 'আমি অনাথ হবো স্যার।'

স্বাস্থ্যই সম্পদ

স্বাস্থ্যই সুখ। তাই শরীর খারাপ হওয়াকে বলে অসুখ। অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—স্বাস্থ্যই সব। বিদ্যা, ঐশ্বর্য, সম্মান, প্রতিপত্তি স্বাস্থ্যের অভাবে এ জীবনে সব কিছু বিফল হয়ে যায়, কিছুই কাজে লাগে না।

যিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, তার পক্ষে কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয় স্বাস্থ্যহীনতার কষ্ট, অসুখের যন্ত্রণা।

একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়ছে। এক আদিম অফিসের এক প্রান্তে দুই জীর্ণ শীর্ণ প্রৌঢ় কেরানি মুখোমুখি বসতেন। দু'জনেই ব্যাজার মুখে অফিসে এসে নিজেদের প্রান্তের আলো নিবিয়ে আবছায়া অন্ধকারে সারাদিন কোনো কাজ না করে চুপচাপ বসে থাকেন।

চুপচাপ কথাটা অবশ্য ভুল হলো। মাঝে মধ্যে খুব নিচু গলায় এঁরা নিজেদের মধ্যে শরীর নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো অম্ল এবং অজীর্ণ। দু'জনেরই প্রিয় আলোচ্য হলো চোঁয়া ঢেকুর। মিষ্টি কুমড়োর ছক্কা শুকনো লঙ্কা ভাজা দিয়ে খেয়ে কবে ভয়াবহ চোঁয়া ঢেকুর হয়েছিল, ডিমের বড়া খাওয়ার পরে মৌরি ভেজানো জল এবং প্রচুর অ্যান্টাসিড খেয়েও কবে চোঁয়া ঢেকুর সারেনি, একবার সাঁতরাগাছিতে বিয়ের ভয়াবহ নেমন্তন্ন খাওয়ার পরে ভেজা চালভাজা চিবিয়ে খেয়ে কি করে অম্বল ঠেকানো গিয়েছিল— এইসব ধারাবাহিক আলোচনা হতো তাঁদের মধ্যে।

ভালোই চলছিল। কিন্তু বাদ সাধলো এক শক্তসমর্থ গ্রাম্য যুবক। সে সদ্য চাকরি পেয়ে মফঃস্বল থেকে এসে এই অফিসে কাজে লেগেছে। তার চেয়ার জুটেছে এই দুই চোঁয়া ঢেকুরতাড়িত ব্যাজার মুখো প্রৌঢ়ের কাছেই।

অবশ্য প্রৌঢ়দ্বয় তাকে আলো জ্বালাতে দিচ্ছে না, সে আধো আলোতে কোনো রকমে নিজের কাজ করছে। আর সেই সঙ্গে ক্রমাগত শুনছে এই দুই প্রৌঢ়ের চোঁয়া ঢেকুর নিয়ে আলোচনা। কবে কী করে কী হয়েছিল, কী হয়নি।

এই স্বাস্থ্যবান সদ্য মহানগরে আসা মফঃস্বলী যুবকটির কোনো অসুখ বাতিক নেই, চোঁয়া ঢেকুর ব্যাপারটা সে ভালো বোঝে না। তবে এঁদের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে।

অবশেষে একদিন টিফিনের সময় ছেলেটি অফিসের পিছনের ফুটপাথ থেকে একটা মোগলাই পরটা কিনে আলুর তরকারি সহযোগে খেলো। কিছুক্ষণ পরে এক গেলাস জল খেয়ে অফিসে এসে চেয়ারে বসে তার কেমন একটা টকটক অম্বলের ঢেকুর উঠলো। সে তখন স্বাভাবিক কৌতূহলবশতই ওই প্রবীণ সহকর্মীদের সরলভাবে প্রশ্ন করলো, 'দাদা এই যে আমার একটু টকটক ঢেকুর উঠছে, এটাকেই চোঁয়া ঢেকুর বলে ?'

আর, যায় কোথায় ? এই সামান্য প্রশ্নে ঐ অম্বলগ্রস্ত দুই প্রৌঢ় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন নতুন ছেলেটি তাঁদের উপহাস করছে, একজন তো ছাতা উঁচিয়ে মারতে এলেন। মফঃস্বলী ছেলেটি কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। অফিসের অন্যেরা কোনো রকমে দৌড়ে এসে গোলমাল মেটালো।

* * *

এ খুব সাদামাটা গল্প হয়ে গেল। অন্য গল্প বলি।

এক স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে পারিবারিক ডাক্তারবাবুকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ভদ্রলোকের উদ্যোগ-আয়োজন, খাওয়া-দাওয়া সবই খুব সাত্ত্বিক ধরনের। ডাক্তারবাবু আবার ঝাল-তেল-মশলা ইত্যাদি রগরগে খাবারের খুব ভক্ত এবং সেই সঙ্গে ভালো বিলিতি মদেও আসক্তি রয়েছে তাঁর।

কিন্তু সে সব এখানে কিছু হলো না। অবশেষে খাওয়া দাওয়া অন্তে গল্পগুজব হচ্ছে ডাক্তারবাবু এবার উঠবেন ; সেই সময় ডাক্তারবাবুকে গৃহকর্তা প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তারবাবু আমার তো পঞ্চাশ পূর্ণ হলো। আপনি তো আমাকে অনেক দিন দেখছেন, আপনার কি মনে হয় আমি একশো বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারি ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনি ঝাল মশলা দেয়া কোনো খাবার খান না।'

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'কখনো খাই না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'মদ খান না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'না। কখনোই না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সিগারেটও নয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'অল্প বয়েসে দু-একটা খেয়ে দেখেছি। ভালো লাগেনি। তারপর আর গত ত্রিশ বছর খাইনি।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার তো অন্য কোনো চরিত্র দোষও নেই। এই যেমন জুয়ো, রেস খেলা কিংবা নারীঘটিত।'

ভদ্রলোক জিব কেটে বললেন, 'সর্বনাশ। এসব কি বলছেন ? এসব দোষ আমার কস্মিনকালেও ছিল না।'

পায়ের জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ওঠার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'তাহলে কোন দুঃখে, কিসের সাধে একশো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চাইছেন ?'

একশো বছর বাঁচার ঠিক এর উলটো একটা গল্প আছে। সে গল্পটা কিছুদিন আগেই লিখেছি, কিন্তু এই সূত্রে স্মরণীয়।

সে গল্পে এক প্রবীণ ব্যক্তিকে ডাক্তারবাবু মদ, মাংস, ধূমপান, নারীসঙ্গ— এসব নিষেধ করেছিলেন। রোগী করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল। 'ডাক্তারবাবু, এত সব যে মানা করছেন, এসব মেনে চললে কি আমি একশো বছর বাঁচবো, শতায়ু হবো।' স্বল্পবাদী ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তা হয়তো বাঁচবেন না কিন্তু সব সময় মনে হবে একশো বছর বেঁচে আছেন।'

শতায়ু বিষয়ক দুটো গল্প যখন হলো তবে চার্চিল সাহেবের সেই বিখ্যাত আখ্যানটিও এখানে সংক্ষেপে স্মরণ করি।

চার্চিল সাহেবের পঁচাত্তর বছর বয়েসের জন্মদিন সেটা, অলঙ্কারের ভাষায় হীরক (মতান্তরে প্লাটিনাম) জন্মজয়ন্তী। এক যুবক ফটোগ্রাফার এসেছে চার্চিল সাহেবের ছবি তুলতে। ছবি তোলা শেষ হলে সে খুব সপ্রতিভভাবে চার্চিল সাহেবকে বললো, 'আশা করি আপনার জন্ম শত বার্ষিকীতেও এইভাবে এসে আপনার ফটো তুলতে পারবো।'

স্যার উইনস্টন চার্চিল চোখ তুলে বেশ অভিনিবেশ সহকারে কয়েক মিনিট যুবক ফটোগ্রাফারটিকে পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর বললেন, 'তোমার স্বাস্থ্য তো ভালোই দেখছি, আশা করি এতদিন তুমি বেঁচে থাকবে।'

* * *

এবার শতায়ু থেকে নেমে আসি। সুস্বাস্থ্যের প্রকৃত গল্প বলি।

পুরনো দিনের রাজগীর খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা ছিল, সেখানকার ভুবনবাবুর হোটেল ছিল বিখ্যাত। সেই ভুবনবাবুকে আমার দাদামশায় একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনাদের এখানকার জল বায়ু তো বেশ ভালো ?'

ভুবনবাবু কাষ্ঠ হেসে বলেছিলেন, ভালো বলতে ! গত বছর এক ঘাটের মড়া বুড়ো এলো আমার হোটেলে গরুর গাড়িতে শুয়ে। হাঁটতে পারে না, ভালো করে কথা বলতে পারে না। অস্থি চর্মসার, বুক দিয়ে হাপরের মত নিঃশ্বাস উঠছে আর পড়ছে। প্রায় যায়-যায় অবস্থা। আমি ধরে নিলাম শিগগিরই মারা পড়বে। কিন্তু আমার হোটেলে থাকতে এসেছে ফেরাতে তো আর পারি না।'

দাদাবাবু প্রশ্ন করলেন, 'বুড়ো এখানকার জলবায়ুতে ভালো হয়ে গেল ?'

ভুবনবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ভালো ? ভালো বলছেন কি মশায় ? সেই ঘাটের মড়া বুড়ো এক মাসের মাথায় রাতের বেলায় দোতলার বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পিছনের বাগানে নেমে আট-ফুট দেয়াল টপকিয়ে আমায় পয়সা না দিয়ে পালিয়ে গেল।'

সুস্বাস্থ্য

গতবারে লিখেছিলাম 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। দূরদর্শন থেকে ধার করে এবারের শিরোনাম হলো 'সুস্বাস্থ্য'।

ঠিক দিনে ঠিক সময়ে টিভির নব ঘোরালেই আমরা 'সুস্বাস্থ্য' অনুষ্ঠানের মুখোমুখি হতে পারি, একশো কি দু'শো টাকা ভিজিটের গগনচুম্বি চিকিৎসকেরা সেখানে বিনামূল্যে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ, হৃদরোগ থেকে ঘামাচি, সম্ভব-অসম্ভব, সহনীয়-অসহ্য সমস্ত রকম স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ নিয়ে সুরসিকা প্রতিবেদিকার সঙ্গে হাসিমুখে কথোপকথন করেন।

প্রকৃত জীবনে সুস্বাস্থ্য এত সহজ, এত সরস নয়। এক অজ্ঞাতনামা ইংরেজ কবি লিখেছিলেন,

আমরা স্বাস্থ্য নষ্ট করি
সম্পদের সন্ধানে
আমরা উপার্জন করি, সঞ্চয় করি
আমাদের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে।
তখন আমাদের পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ
আমরা ব্যয় করি
আমাদের স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার জন্যে।

কবিতার ব্যাপারটা মনে হচ্ছে জমলো না। বরং স্বাস্থ্যের বিড়ম্বনা ঘটিত দু'একটা ঘটনা বলি। বলা বাহুল্য, সব ঠিক ঘটনা নয়, কিঞ্চিৎ গল্পকথাও আছে। অবশ্য এত জবাবদিহির বোধহয় দরকার নেই। পাঠিকা ঠাকরুণ সবই বুঝতে পারবেন।

প্রথমে একটা ঘটনা বলি।

উংচু চুংউ নামে একটি চীনা ছেলে কলেজে আমার সঙ্গে এক বছর পড়েছিল। সে আমার মত গরিবের ঘরের ছেলে নয়, কলেজে পড়ার তার দরকার ছিল না। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে তাদের ছিল বিশাল পারিবারিক পাদুকালয়।

সেটা পঞ্চাশ দশকের গোড়ার কথা। তখনকার কলকাতায় জুতোর দোকান এত সহজলভ্য ছিল না। বাটা, ফ্লেক্স, রাদু, কলেজ স্ট্রিট আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট প্রায় এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল জুতোর কারবার। এর বাইরে সবই ছুটকো ছাটকা।

সে যা হোক, সেই উংচু চুংউ অল্প কিছুদিন পড়ার পর কলেজ ছেড়ে দেয় কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আজো বহাল রয়ে গেছে। পুরো ব্যাপারটা সস্তায় জুতো কেনার স্বার্থঘটিত নয়। উংচু চুংউকে আমার চিরকালই ভালো লাগে। যাতায়াতের পথে কখনো সময় পেলে তার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের দোকানে এখনো উঁকি দিই। সেই এখন দোকানের মালিক। খুব মোটা হয়ে গেছে আজকাল, তবে অল্প বয়েসের সেই হাসি মুখ রয়ে গেছে। বহু পুরুষ ধরে কলকাতায় থেকে তার আচার-আচরণে একটা বাঙালিয়ানা এসে গেছে। চমৎকার ঝরঝরে বাংলা বলে সে। তার মা না ঠাকুমা কে যেন বাঙালি ছিল। তার চেহারায় সেই ছাপ রয়েছে। শরীরের পীত রং ছাড়া আর কোথাও চৈনিকতা নেই।

অনেক দিন পরে সেদিন বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে উংচুর দোকানে গেছি। খাদি গ্রামোদ্যোগে কিছু কেনাকাটা ছিল, ভাবলাম ফেরার পথে উংচুর একটু খোঁজ নিয়ে যাই। গিয়ে দেখি উংচুর শরীর একদম ভেঙে গেছে, চোখমুখ বসা, সেই ভুঁড়ি চুপসিয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে তোর ?' উংচু ম্লান হেসে বললো, 'আর বলিস না। ঘোর বিপদে পড়েছিলাম। বহু কষ্টে প্রাণে বেঁচেছি।'

এরপরে উংচু যা বললো তা ভয়াবহ। তাদের পাড়ার পুরনো বুড়ো ডাক্তার মরে গেছে, সে জায়গায় এসেছে এক নতুন চিকিৎসক। উঁংচুর মাস কয়েক আগে সামান্য জ্বরজারি হয়। তখন সে ঐ নতুন ডাক্তারকে দেখাতে যায়। উংচুকে দেখে কথাবার্তা শুনে ডাক্তার বুঝতে পারেনি যে সে চীনা। তাই গাত্রবর্ণ দেখে ডাক্তার তার জণ্ডিসের চিকিৎসা করে। ঝাড়া চার মাসে জণ্ডিসের চিকিৎসায় তার এই হাল দাঁড়িয়েছে। মাছ-মাংস, ঝাল-মশলা, তেল-ঘি সব বন্ধ ছিল সেই সঙ্গে কড়া ওষুধ। মাত্র গতকালই ভুলটা ধরা পড়েছে। আবার নতুন করে চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে, এখন দেখা যাক কী হয়।

★ ★ ★

উংচু নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। তার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। এবার অন্য কথা।

ভুল ওষুধের গল্পের পরে এবার আমার সঠিক ওষুধের একটা গল্প বলি।

এক ভদ্রমহিলা ওষুধের দোকানে তাঁর কুকুরের জন্যে একটা ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন। ওষুধের বোতলটা নিয়ে উলটে পালটে দেখে বললেন, 'এর গায়ে তো কোথাও লেখা নেই, কুকুরের জন্যে বা জীবজন্তুর জন্যে ?'

দোকানদার বললেন, 'এই ওষুধটা মানুষ ও জন্তু দুইয়ের জন্যেই। তাই আলাদা করে

কিছু লেখা নেই।'

ভদ্রমহিলা একথা শুনে বললেন, 'একই ওষুধে মানুষ আর পশু দুইয়েরই উপকার হবে ?'

দোকানদার বললেন, 'তাই তো বলছি।'

ভদ্রমহিলা তখন বললেন, 'তা হলে আমাকে আরো এক বোতল দিন আমার স্বামীর জন্যে।'

স্বামীর ওষুধের গল্প আরো একটা মনে পড়ছে, তবে সেটা একেবারে অন্যরকম।

সদা ক্লান্ত নিরুদ্যম স্বামীর জন্যে ওষুধ আনতে গেছেন স্ত্রী। বিস্তারিত শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার স্বামীর মনে হচ্ছে কিছু হয়নি। একটু মনের শান্তি আর বিশ্রাম দরকার। এই ঘুমের ওষুধটা নিয়ে যান।'

স্ত্রী বললেন, 'এটা ওঁকে কখন খাওয়াব ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওঁকে খাওয়াতে হবে না। এটা আপনার জন্যে দিলাম। আপনি খেয়ে ঘুমবেন। তা হলেই ওঁর বিশ্রাম হবে।'

রোগীর স্ত্রী হলো, এবার ডাক্তারবাবুর স্ত্রী।

ডাক্তারবাবুর চেম্বারের পাশেই ডাক্তারবাবুর শোবার ঘর। সেখান থেকে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ডাক্তারবাবু রোগীদের কী জিজ্ঞাসা করেন সবই শুনতে পান।

একদিন কৌতূহলবশত ডাক্তারবাবুকে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ গো তুমি তোমার সমস্ত রোগীকে কাল রাতে কি খেয়েছে জিজ্ঞাসা করো কেন ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঐ প্রশ্ন করে রোগীর আর্থিক অবস্থা কি সেটা বুঝে নিই। সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করি।'

কিছু বুঝতে না পেরে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন, 'সে আবার কী ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বুঝলে না ? কেউ যদি বলে, রাতে রুটি তরকারি খেয়েছে বুঝতে পারি এ দশ-বিশ টাকার খদ্দের। তার চিকিৎসা সেই রকম হয়। আবার কেউ যদি বলে রাতে লুচি-রাবড়ি খেয়েছে কিংবা মাংসের বিরিয়ানি আর চিকেন কোরমা বুঝতে পারি হাজার টাকার কম খরচে একে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না।'

পুনশ্চঃ

ডাক্তারবাবুর চেম্বারে একটা জরুরি ফোন কল এলো, 'ডাক্তারবাবু, সর্বনাশ হয়েছে।'

কণ্ঠস্বর এক খ্যাতনাম্নী লেখিকার। ডাক্তারবাবুর বেশ চেনা। ডাক্তারবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'কি সর্বনাশ হয়েছে ?'

লেখিকা বললেন, 'আমার ছোটো নাতনি এইমাত্র আমার টেবিল থেকে কালির দোয়াত নিয়ে, প্রায় আধ দোয়াত কালি ছিল, পুরোটা খেয়ে ফেলেছে। আমি লিখছিলাম, কিছু খেয়াল করিনি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি এই ব্যাপার। নাতনির ঠোঁট দিয়ে, নাক দিয়ে কালি চোয়াচ্ছে। দোয়াত খালি। আর সেও হেঁচকি তুলছে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমার চেম্বারে দুজন পেশেন্ট আছে। আমি ওদের দেখেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি। ততক্ষণ আপনি কি করছেন ?'

ভদ্রমহিলা বিরস কণ্ঠে জানালেন, 'কি আর করবো ? ডট পেনে লিখছি। ডট পেনে লিখতে ভালো লাগে না কিন্তু কী করবো বলুন। দোয়াতে কালি এক ফোঁটাও তো নেই।'

দন্তরুচি কৌমুদী

দন্তরুচি কৌমুদী একটি জটিল শব্দ। সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' অনুসারে এই সমাসবদ্ধ পদটির প্রথম অর্থ হলো 'অতি শুভ্র জ্যোৎস্না'। অবশ্য আরো একটা মানেও দেওয়া আছে অভিধানে, সেটা হলো, 'হাসিবার সময় সুন্দর সাদা দাঁতের যে শোভা দেখা যায়।'

ঠিক দন্তরুচি কৌমুদী নয়, এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো সরাসরি দাঁত।

দাঁত খুব গোলমেলে জিনিস। সুকুমার রায় লিখেছিলেন, 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি—গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।' কিন্তু গোঁফ নয় আসলে দাঁত দিয়ে যায় চেনা। দুর্ঘটনায় নিহত বিকৃত ছিন্নবিচ্ছিন্ন শবদেহ সনাক্ত করা হয় দাঁত দেখে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়া বিধ্বংসী বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার পরে তাঁর খণ্ডবিখণ্ড দেহ শেষ পর্যন্ত সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছিল তাঁর দাঁত দেখে এবং সনাক্ত করার জন্যে তাঁর ডেনটিস্টকে নিয়ে আসা হয় দুর্ঘটনাস্থলে।

আমরা ডেনটিস্ট সাহেবের কাছে পরে যাচ্ছি। তার আগে দাঁতের গোলমেলে ব্যাপারটা সেরে নিই।

দাঁতের মর্যাদা বলে একটা পুরনো কথা আছে। পুরো কথাটা হলো, 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝা।' এ কথাটার মানে খুব স্পষ্ট, দাঁত পড়ে গেলে বোঝা যায় দাঁতের মূল্য ;

একটা মানুষ বিদায় নেওয়ার পরে অনুভব করা যায় সেই মানুষটার গুরুত্ব ও ভূমিকা।

এর চেয়ে অনেক কঠিন হলো দাঁত ফোটানো। এমন অনেক লেখা ছাপা হয় কাগজে (মহাভারত নয়) যাতে আমরা দাঁত ফোটাতে পারি না। সেগুলো সব দাঁত ভাঙা ব্যাপার।

দাঁত ভাঙা ব্যাপার আপাতত থাক, এবার আমরা দাঁতের গল্পে, ডেনটিস্ট সাহেবের কাছে যাবো, সে অনেক সরস ব্যাপার।

দন্তচিকিৎসকের চেম্বারে এক রোগী দাঁত তোলার পর ডেনটিস্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিজিট কত ?' ডেন্টিস্ট বললেন, 'বত্রিশ টাকা।'

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত রোগী দাঁতের ব্যথায় কাতর ছিলেন। এখন দাঁত ওঠানোর পরে যথাক্রমে মনে ও শরীরে শান্তি ও শক্তি ফিরে পেয়েছেন। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, 'সামান্য একটা দাঁত তোলা। মাত্র দশ সেকেন্ড লাগলো, তার জন্যে আপনার ভিজিট বত্রিশ টাকা ?'

দাঁতের ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তাহলে আপনি যদি বলেন, এরপর থেকে আপনার দাঁত আমি খুব ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ সময় দিয়ে তুলবো।'

আমাদের এই গল্পের রোগী নিশ্চয়ই মূর্খ নন। দাঁত তোলার মত যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা তিনি নিশ্চয় বিলম্বিত করতে চাইবেন না এবং দাঁতের ডাক্তারবাবুর নির্দিষ্ট বত্রিশ টাকা ভিজিটটুকুও দেবেন।

একালে লোকাল অ্যানেসথিসিয়া করে যন্ত্রণাহীন, বেদনাহর দাঁত তোলা হয়। একটি ছোটো ছেলের মাড়ির দাঁতে পোকা হয়েছিল। না তুলে উপায় নেই, কিন্তু বালকটা দাঁত তুলতে ভয় পাচ্ছে। তাকে বোঝানো হলো এই ডাক্তারবাবু একেবারে বেদনাহীন, কোনো ভয়ের কিছু নেই।

দাঁত তুলে ছেলেটি বাসায় ফিরে এসে বললো, 'তোমরা যে বলেছিলে ডাক্তারবাবু বেদনাহীন নাকি যেন, সে সব কিছু নয়।' এ কথা শুনে বালকটির মা প্রশ্ন করলো, 'কেন, তোর লেগেছিল নাকি ?'

সে বললো, 'না আমার মোটেই লাগেনি।' মা জিজ্ঞাসা করলো, 'তবে ?' ছেলেটি বললো, 'তবে আর কি। আমি যখন দাঁত তোলার সময় ডাক্তারবাবুর হাতটা কামড়ে ধরেছিলাম, ডাক্তারবাবু 'ওরে বাঁচারে, মরে গেলাম' বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন।'

অন্য এক বালকের গল্প মনে পড়ছে। তারও মাড়ির দাঁতে পোকা। দাঁত তুলতে হবে এবং দাঁত তোলায় তার ভয়ঙ্কর ভয়।

তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেনটিস্টের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হলো। বলাবাহুল্য সে নিজের দাঁতের যন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পাচ্ছিলো, তাই গেলো। না হলে তাকে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল না।

ডেনটিস্টের চেম্বারে ঢোকার পর সে আর দাঁত তোলার চেয়ারে বসবে না, কিছুতেই বসতে চায় না। প্রচুর জোর জবরদস্তি, ধমক, অনুরোধ, ধাক্কাধাক্কি করে তাকে সেই ভয়াল চেয়ারে তোলা হলো।

কিন্তু এর পরে আরো কঠিন সমস্যা দেখা দিলো। সে কিছুতেই মুখ খোলে না। ডাক্তারবাবু গলদঘর্ম হয়ে গেলেন, শত চেষ্টাতেও, নানা রকম কসরত এবং অনুরোধ করেও তিনি বালক রোগীর মুখ খোলাতে পারলেন না।

তখন ডাক্তারবাবু এক বুদ্ধি করলেন। তিনি তাঁর সহকারীকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে তার হাতে একটা আলপিন দিয়ে বললেন, 'আমি আবার ওকে মুখ খুলতে বলছি। ও নিশ্চয় খুলবে না। তুমি পাশে দাঁড়িয়ে ওর কনুইয়ে আলপিন দিয়ে খোঁচা দেবে। খোঁচা খেয়ে ছোকরা চেঁচাবার জন্যে হাঁ করবে, আমি ওর দাঁতটা তুলে ফেলবো।'

কথামত কাজ হলো। আলপিনটা ফোটাতেই হাঁ করে ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠলো। ডাক্তারবাবু সেই অবসরে পোকা ধরা দাঁতটা তুলে ফেললেন।

দাঁত তুলে ফেলার পরে ডাক্তারবাবু ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি লাগলো?' ছেলেটি বললো, 'না ঠিক লাগেনি', তারপর কনুইয়ের যেখানে আলপিনটা ফোটানো হয়েছিল সে জায়গায় হাত বুলিয়ে বললো, 'দাঁতের শিকড় যে এতদূর পর্যন্ত নামে তা আমি কখনো ভাবিনি।'

* * *

দাঁতের শেষতম গল্পটা মানুষের দাঁতের নয়, গরুর দাঁতের। বলাবাহুল্য এই গল্পটা এত ভালো যে এর আগে এটা আমি একশো সাতবার বলেছি, এবার নিয়ে একশো আটবার হবে।

এক ব্যক্তি শুনেছিল যে গরুর দাঁত গুনে গরুর বয়েস নির্ধারণ করা যায়। একদিন সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। দেখে রাস্তার পাশে একটা গরু খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে, তার খুব কৌতূহল হলো, দেখাই যাক না গরুটার দাঁতগুলো গুনে, তারপর এটার মালিককে জিজ্ঞাসা করবো এর বয়েস কতো। সত্যিই গরুর দাঁত গোনার হিসেবটা সঠিক কিনা একবার পরখ করে দেখা যাক।

লোকটি গরুটার মুখের মধ্যে হাত গলিয়ে দিলো। এদিকে ঠিক সেই মুহূর্তে গরুটারও কৌতূহল হলো জানতে মানুষের হাতে আঙুল কটা থাকে। সুতরাং মুখের মধ্যে হাতটি যাওয়া মাত্র সে তার দাঁত দিয়ে চেপে আঙুল গুনতে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার, রক্তারক্তি কাণ্ড। সরল লোকটির চারটি আঙুল ছিন্ন হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলো গরুর মুখ থেকে।

* * *

পুনশ্চঃ

রসিকতাটা এক মহাকৃপণ ভদ্রলোককে নিয়ে। বিলিতি জোকবুকে এসব গল্প স্কটল্যান্ড দেশীয়দের নামে চলে, ঐ দেশের লোকেরা নাকি মিতব্যয়িতার জন্যে স্মরণীয়।

সে যা হোক, এক ভদ্রলোকের দাঁতে গর্ত হয়েছে। তিনি ডেনটিস্টের কাছে গিয়েছেন। ডেনটিস্ট দেখে বললেন, 'দাঁতের ক্যাভিটি ফিলিং করতে (অর্থাৎ গর্তটা বোজাতে) একশো টাকা লাগবে।'

ভদ্রলোক এ কথা শুনে বললেন, 'কিন্তু সেদিনতো আপনার কাছে একটা দাঁত তুললাম মাত্র কুড়ি টাকা দিয়ে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'দাঁত তোলা অনেক সোজা ব্যাপার। দাঁত তুলতে কুড়ি টাকাই নিই আমি। কিন্তু ফিলিংয়ের ব্যাপার আলাদা।'

একথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে আমার এ দাঁতটা তুলেই দিন। ফিলিং দরকার নেই।'

সচিত্র ভারত

'লালেরা সব লালই ছিলো, কৃষ্ণেরা লাল হচ্ছে কি ? রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ মেনন, কৃষ্ণা হাতী সিংহেরা মন্দিরেতে ঠেকা দিয়ে ইন্দিরা গান ধরছে কি ? রুশ ভালুকের কাঁধে চড়ে নাচছে ভারত ফিঙ্গেরা। আমরা সবাই নাচবো কি ?

অবাক কাণ্ড তেলাপোকা ধরছে যে আজ কাঁচপোকী !'

সজনীকান্ত দাস

শারদীয়া সচিত্র ভারত

১৩৬০

* * *

সচিত্র ভারত থেকে অসচিত্র এই মহাভারত অনেক দূর, সময়ের হিসেবে উপরোক্ত শারদীয়া সংখ্যা থেকে সাড়ে তিন দশকের দূরত্ব।

অল্প কিছুদিন আগে মহাভারতের এই কলমে স্বর্গীয় দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল মহোদয়ের অচলপত্রের কথা লিখেছিলাম। সেটাও সম্ভব হয়েছিল এক সহৃদয় পাঠকের সৌজন্যে, যিনি পুরনো অচলপত্র পাঠিয়ে আমাকে ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সেই সময়েই ভেবেছিলাম 'সচিত্র ভারত' নিয়েও আমার কিছু লেখা কর্তব্য। রসিকতার

পাঠশালায় যে সব শিক্ষাদাতার কাছে আমি ঋণী তার মধ্যে অধুনালুপ্ত ঐ সাপ্তাহিক সচিত্র ভারত পত্রিকার স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত আমার নিকটে।

একটা উদাহরণ দিই। অনেক দিন আগে সেই কাণ্ডজ্ঞানে উল্লেখ করেছিলাম।

'চুল কাটার সেলুন নিয়ে অনেক মজার ছবি এঁকে ছিলেন প্রমথ সমাদ্দার। প্রমথবাবুকে কেউ কি মনে রেখেছেন ? আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর এবং তারো আগে কার্টুন আঁকতেন প্রমথ সমাদ্দার, তাঁর হাতের আঁকা এবং রসবোধ দুইই ছিলো চমৎকার।'

কাণ্ডজ্ঞানে কেশচর্চার ঐ নিবন্ধে যে কথাটা উল্লেখ করা হয়নি সেটা হলো এই যে প্রমথ সমাদ্দারের ঐ চমৎকার কার্টুনগুলো সবই আমি দেখেছিলাম সচিত্র ভারত সাপ্তাহিকে, সেই তিন যুগ আগে।

সচিত্র ভারতের ঐ কার্টুনটার কথা বলি। সেলুনে এক ভদ্রলোক চুল কাটছেন। ভদ্রলোকের পায়ের কাছে ঠিক চেয়ারের নিচেই বসে রয়েছে একটি অতিকায় হিংস্রদর্শন কুকুর। কুকুরটি খুব মনোযোগ দিয়ে চুলকাটা লক্ষ্য করছে। সারমেয় প্রবরের এই মনোযোগ দেখে খদ্দের ক্ষৌরকারকে বললেন, 'আপনাদের এই কুকুরটা দেখছি খুব শিক্ষিত। কি রকম স্থির হয়ে বসে চুলকাটা দেখছে।' ক্ষৌরকার চুল কাটতে কাটতেই নিজের জিভ কেটে বললেন, 'না স্যার, শিক্ষিত-টিক্ষিত কিছু নয়, ও বড়ো লোভী স্যার।'

খদ্দের অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'লোভী ?' ক্ষৌরকার উত্তর দিলেন, 'আমি স্যার অনেক সময়ে চুল কাটতে কাটতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে খদ্দেরদের জুলফির মাংস, কানের লতি এই সব হাত ফসকিয়ে কেটে ফেলি। আমার কুকুরটা সেই মাংসের টুকরোর লোভে বসে আছে স্যার।'

পঁয়ত্রিশ বছর আগের দেখা কার্টুন এটা। কিঞ্চিৎ ভুলভ্রান্তি, অতিরঞ্জন হয়তো হয়ে গেল। তবু স্বীকার করা ভালো যে এরকম কার্টুন আজকাল চোখেই পড়ে না। সরল, সরস, নির্দোষ কার্টুনের দিন যেন সচিত্র ভারত আর প্রমথ সমাদ্দারের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।

প্রমথ সমাদ্দার ছাড়াও সচিত্র ভারতে আরো কার্টুন আঁকতেন স্বনামধন্য কাফী খাঁ এবং শৈল চক্রবর্তী। সেই সঙ্গে ছিলেন রবীন ভট্টাচার্য এবং অমিয় (ওমিয়ো-Omio)। কোন এক অজ্ঞাত কারণে একমাত্র কাফী খাঁ এবং শৈল চক্রবর্তী ছাড়া সবাই কার্টুনে ইংরেজিতে নাম সই করতেন। কাফী খাঁ তাঁর এই ছদ্মনামেই সই করতেন আর শৈল চক্রবর্তী কার্টুনের নিচে স্বাক্ষর দিতেন শ্রীশৈল।

সচিত্র ভারত ঠিক অচলপত্র জাতীয় কাগজ ছিল না। রাজনৈতিক বা সাময়িক ব্যাপারে তার খুব মাথাব্যথা ছিল না। তবে তখনকার দেশ পত্রিকায় 'ট্রামে বাসে' কিংবা পরবর্তীকালে আনন্দবাজারে শিবরাম চক্রবর্তীর 'অল্প বিস্তর' জাতীয় একটা কৌতুকী কলম ছিল যাতে সাময়িক ঘটনা নিয়ে সরস মন্তব্য করা হতো।

একটা উদাহরণ দিই, 'এবার পূজার ভোগের চাউল বরাদ্দের জন্য সরকারি ভোগ কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রার্থীরা ইহাকে বলেন ভোগান্তি কমিটি।'

কার্টুন, কৌতুকী এবং হাসির লেখা থাকলেও সচিত্র ভারত ছিল উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা। পরশুরাম কিংবা বনফুল, সুবোধ ঘোষ কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এমনকি অন্নদাশংকর রায় এই পত্রিকায় লিখতেন। কদাচিৎ তরুণ বা অনামি লেখকের রচনা দেখা যেতো। কবিতা বা ভারি প্রবন্ধ কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

বিলিতি 'পাঞ্চ' জাতীয় কাগজ ছিল না সচিত্র ভারত তবে সরস সাহিত্যপত্র হিসেবে হয়তো 'নিউ ইয়র্কার' কাগজের সঙ্গে এর কিছুটা তুলনা চলতে পারে।

হাতের কাছে রয়েছে সচিত্র ভারতের শারদীয়া ১৩৬০ সালের সংখ্যাটি। যেখানে থেকে এ নিবন্ধের প্রথমেই সজনীকান্ত দাসের 'খাপ ছাড়া' কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছি।

এই সংখ্যাতেই পরশুরামের 'একগুঁয়ে বার্থার' মত অবিস্মরণীয় গল্প প্রকাশিত হয়েছে, সে গল্পের ছবি এঁকেছেন শৈল চক্রবর্তী স্বয়ং। এছাড়া রয়েছে বনফুলের, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রমথনাথ বিশীর গল্প এবং অন্নদাশংকরের ছড়া।

সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত গল্প 'নিমের মধু'ও এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী এবং বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সরস গল্প।

* * *

নিজের অজান্তে একটু অ্যাকাডেমিক হয়ে গেলো এই আলোচনাটি, এখন আর ফেরার পথ নেই। তবু সরসতার খাতিরে সচিত্র ভারতের দু'একটা কৌতুকের কথা বলি।

প্রমথ সমাদ্দারের একটা কার্টুন। জেলের সুপার ওয়ারডেনকে বলছেন, 'কী—জেলের

কয়েদিরা সব স্ট্রাইক করেছে ? কাজ করছে না ? লক আউট করে দাও জেলের দরজা।'

রবীন ভট্টাচার্যের কার্টুনগুচ্ছে রয়েছে একটি কৌতুক কাহিনী, কোন ক্যাপসন নেই, ছবির মধ্যেই গল্প নিহিত রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছেন। স্ত্রী দু'হাতে জিনিস কিনছেন আর একটার পর একটা প্যাকেটের বোঝা স্বামীর কাঁধে চাপিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে প্যাকেটের নিচে ডুবে গেলেন স্বামী। বাজার থেকে বাড়ি ফিরে স্বামীকে নিয়ে ঘরে ঢুকে প্যাকেটের বোঝায় মুখ ও অবয়ব ঢাকা স্বামীর ওপর থেকে প্যাকেটগুলো নামিয়ে নিতে দেখা গেল এ স্বামী সে স্বামী নয়, স্বামী বদলিয়ে গেছে প্যাকেটের নিচে।

অবশেষে পুরনো সচিত্র ভারত থেকে একটি মজার আখ্যান বলি, এটি একটি কথোপকথন।

সহকারী : স্যার বাইরে একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছে।

স্যার : (মোটা ফাইল থেকে চোখ না তুলে) বলে দাও আমি খুব ব্যস্ত।

সহকারী : বলেছি স্যার। কিন্তু লোকটি বলছে, তার হলো জীবন-মরণের ব্যাপার, ঐ যাকে বলে লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোশ্চেন।

স্যার : কি সাংঘাতিক কথা। লোকটাকে নিয়ে এসো।

লোকটিকে সহকারী গিয়ে বাইরে থেকে স্যারের ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো, একটু পরে বোঝা গেল লোকটি লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট, জীবন বীমার দালাল।

এ বারের নিবন্ধ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে গেল তবু সচিত্র ভারতের অন্তত আরেকটা সরস আখ্যান উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে।

মেসের ম্যানেজারবাবু নবনিযুক্ত ভৃত্যকে বলছেন, 'দ্যাখো বোর্ডারদের কারো বাড়ি থেকে যদি কোন টেলিগ্রাম আসে বা খারাপ খবর, মৃত্যুসংবাদ, অসুখ বিসুখ, মামলায় পরাজয় বা কারো পরীক্ষার ফেলের খবর অফিস থেকে সে মেসে ফেরা মাত্র বিকেলের চা জলখাবার বা রাতের খাওয়ার আগেই তাকে জানিয়ে দেবে।'

এই আদেশ শুনে সরল ভৃত্যটি প্রশ্ন করলো, 'কেন বাবু ?' ম্যানেজারবাবু বললেন, 'আরে এতে খাবার অনেক বেঁচে যায়। মাস-খরচা অনেক কম পড়ে।'

নিজেই নিজের কাছে

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, 'আত্মানং বিদ্ধি।' অর্থাৎ নিজেকে জানো।

অন্য সব কিছু জানার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও জানতে শিখতে হয়। আমি মানুষটা কেমন, আমার কী কী দোষগুণ, আমি কী চাই, আমি কী ভালোবাসি, কী কী পছন্দ করি, কী কী অপছন্দ করি, এমনকি আমি দেখতে কেমন—এসব বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা আমাদের কারোরই নেই। এমনকি আমরা যে নিজেকে ভালো জানি না, সেটাও আমরা জানি না।

নিজের সম্পর্কে আমরা যেমন জানি না কিংবা কম জানি, অন্যেরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবে তাও আমরা জানি না, টের পাই না কিংবা খেয়াল করি না।

অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। ছুটির দিনের সকাল, পণ্ডিতিয়া রোডের বাইরের ঘরে বসে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করছি। এমন সময় একটি ছেলে এসে বললো, 'মেসোমশায়, আপনার টেলিফোনটা যদি একটু করতে দিতেন।'

এই ছেলেটিকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। আমাদের পাশের গলিতেই থাকে। খুবই ভালো ছেলে। বছর খানেক আগে ওর বাবা, তিনিও আমাদের পরিচিত ছিলেন। কসবা লেভেল ক্রশিংয়ে আচমকা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন। ছেলেটি এখন নিজেই কষ্ট করে পড়াশুনা করছে, তাদের ছোটো সংসারটাকেও রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

বলা বাহুল্য, ছেলেটিকে আমি পছন্দ করি। আমার সাধ্যমত সম্ভব হলে সাহায্য করি,

খোঁজখবর রাখি। সুতরাং আজ ছেলেটি ফোন করতে চাওয়া মাত্র আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই ফোন করবে, এ আর বেশি কথা কি।'

সামনের টেবিলে আমার হাতের কাছেই ফোনটা ছিল। সেটা এগিয়ে দিলাম। ভাগ্য ভালো, মাত্র দু'তিনবার ডায়াল করতেই ছেলেটা তার লাইন পেয়ে গেল।

যেহেতু আমার সামনে কথাবার্তা হচ্ছে, আমি ছেলেটি কী বলছে সব শুনতে পেলাম।

'হ্যালো, এটা কি ডাক্তার চক্রবর্তীর বাড়ি ?··· একটু ডাক্তার চক্রবর্তীকে ডেকে দেবেন···হ্যালো ডাক্তার চক্রবর্তী আপনি আমাকে চিনবেন না···আপনার মেয়েকে পড়ানোর জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটর চাইছেন শুনলাম···হ্যালো কি বললেন, একজনকে নেওয়া হয়ে গেছে··· সে কী রকম পড়াচ্ছে···খুব ভালো পড়াচ্ছে··· ঠিক আছে বিরক্ত করলাম কিছু মনে করবেন না।'

ছেলেটির বাক্যালাপ শুনে সহজেই ধরতে পারলাম সে একটি প্রাইভেট টিউশনি পাওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু পেল না। একটু খারাপ লাগলো ব্যাপারটা। ছেলেটি ফোনটা নামিয়ে রাখতে আমি তাকে সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'কি টিউশনিটা হলো না বুঝি ?'

ছেলেটি একটু হেসে বললো, 'না মেসোমশায়, টিউশনিটা আমিই করছি।'

আমি একটু অবাক হলাম, মুখে বললাম, 'তবে ?'

ছেলেটি আমাকে বুঝিয়ে বললো, 'মেসোমশায়, আজ দু'সপ্তাহ হল আমি টিউশনিটা আরম্ভ করেছি। এর আগে তো কোথাও পড়াইনি। তাই একটু কায়দা করে জেনে নিলাম আমি ঠিক কেমন পড়াচ্ছি।'

এ ছেলেটি নিজের সম্পর্কে অন্যের কী ধারণা সেটা যাচাই করার চেষ্টা করছে। সে জানে তার ত্রুটি থাকতে পারে। এবং সে অবশ্যই অভ্রান্ত নয়।

কিন্তু সত্যিসত্যিই নিজেকে শতকরা একশোভাগ অভ্রান্ত মনে করে—এমন লোকের সংখ্যাও অগণ্য। তারা নিজেদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে সেটা এতই উঁচু যে কোনোদিন যাচাই করার কথাও ভাবে না।

এক খবরের কাগজের অফিসে এইরকম এক ভদ্রলোক কাজ করেন, যিনি ভাবতেই পারেন না যে তিনি কখনও কোনো ভুল করতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ কাগজের দপ্তরেই এ ধরনের দু'য়েকজন লোক থাকেন, যাঁদের ধারণা তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু জানেন, সমস্ত কিছুর খবর রাখেন এবং সব ব্যাপারেই তাঁরা সংশোধনের ঊর্ধ্বে।

একদিন হঠাৎ একটা ব্যতিক্রম ঘটে গেল। এই ভদ্রলোক সহকর্মীদের বললেন, 'দেখুন আজ একটু আগে আমি একটা বড় ভুল করে ফেলেছিলাম।'

সহকর্মীরা ভদ্রলোকের এই অভাবিত বিনয় ভাষণ শুনে হতবাক হয়ে গেল, তারা সমস্বরে বললো, 'বলেন কি ?'

ভদ্রলোক স্থির হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ সত্যিই ভুল করেছিলাম।' শুনে একজন খুব করুণভাবে প্রশ্ন করলো, 'সে কি, আপনিও ভুল করেছিলেন ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি তাই। একটু আগে আমি ভেবেছিলাম আমি ভুল করেছি। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি সত্যি সত্যি তখন আমি কোন ভুল করিনি। ভুল করেছি ভাবাটাই ভুল হয়েছিল।'

এবার একটা অন্য ধরনের গল্প বলি আত্মানুসন্ধান সম্পর্কে।

শ্যামলীর সঙ্গে শ্যামল প্রেমে পড়েছিল। তিন মাস গল্প-গুজব, আড্ডা-ঠাট্টা, হাত ধরাধরি, রেস্তোরাঁ, পার্ক, পিকনিক ইত্যাদির পর শ্যামলী শ্যামলকে বললো, 'তোমাকে আমার পছন্দ নয়, আমি তোমাকে বিয়ে করবো না।'

শ্যামল দুঃখিত হয়ে বললো, 'কেন ? কী রকম তোমার পছন্দ শুনি ?'

শ্যামলী বললো, 'আমার বর হবে অন্তত ছ'ফুট লম্বা, রং ফর্সা, সুবেশ, বুদ্ধিমান, ভালো চাকুরে। কলকাতায় বাড়ি থাকবে, গাড়ি থাকবে।'

শ্যামল আর সহ্য করতে পারলো না। এতদিন যা করেনি, যা বলেনি তাই করলো। দাঁত খেঁচিয়ে বললো, 'তুমি যে এতসব চাইছো, তার বদলে তুমি কী দেবে ? কোনোদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার শাকচুন্নির মত গায়ের রঙ, ঘোড়ার মত মুখ... ।'

এরপর শ্যামল যা যা বললো সেসব কহতব্য নয়, আমার এ কলমে সেসব খারাপ কথা লেখাও উচিত হবে না। তবে এটুকু বলতে পারি, উপনিষদের ঋষির পরামর্শ মান্য করে শ্যামলী যদি নিজের পরিমাপ করত তা হলে সেদিন শ্যামলের কাছে অতটা অপমান হতো না।

পুনশ্চঃ

এই আমিত্বের কাহিনীর শেষে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা জুড়ে দিই।

চৌরঙ্গীতে অপেক্ষা করছিলাম। হাতে একটু সময় ছিল। সামনের জুতো পালিশওয়ালাকে দিয়ে পায়ের জুতোজোড়া কালি করতে গেলাম। পালিশ আরম্ভ করেই লোকটি বললো, 'স্যার আপনি খুব চালাক আছেন।'

কেন একথা বললো বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম। আমি কিছু বললাম না দেখে লোকটি আবার বললো, 'স্যার আপনি সবচেয়ে চালাক।'

এরকম দু'তিনবার হওয়ার পরে বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলাম, 'ব্যাপারটা কী ?'

লোকটি বললো, 'বুঝলেন না স্যার এই রাস্তায় আমিই সবচেয়ে ভালো জুতো পালিশ করি। আপনি খুব চালাক বলেই না আমাকে দিয়ে পালিশ করাচ্ছেন।'

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

আমার এই অনিত্য ও তাৎক্ষণিক রচনা, এই হাস্যকর জগাখিচুড়ি, এর উপযুক্ত নামকরণ হতে পারতো 'মুখ ভরে যায় চানাচুরে'। কিন্তু আমার স্বভাব মন্দ, আমার চরিত্রে দোষ, একটি পবিত্র কাব্যগ্রন্থের নাম জড়িয়ে দিলাম আমার এই খেলো নিবন্ধে।

এবারের বিষয় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন বড় জটিল ব্যাপার। প্রথমে সেই ওষুধের দোকানের মালিকের বিজ্ঞাপনটা দিয়ে শুরু করি।

এক ওষুধের ফার্মেসির স্বত্বাধিকারীর বৌ কি কারণে কার সঙ্গে যেন পালিয়ে গিয়েছিল। সেই ফার্মেসিওলা এ নিয়ে মন খারাপ করলো না, দুঃখ করলো না, এমনকি অন্য দশজনে এ রকম ক্ষেত্রে যা করে থানায় ডায়েরি করা বা এখানে ওখানে সন্দেহজনক স্থানে খোঁজাখুজি করা সে তাও করলো না।

তবে সে অনেক ভেবে চিন্তে খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি দিলো, 'যিনি আমার বৌকে নিয়ে পালিয়েছেন তাঁর অবগতির জন্যে জানাই যে তাঁর যদি কোনো কারণে ব্যান্ডেজ, তুলো ডেটল, আয়োডিন, বার্নল ইত্যাদি কোনো কিছু প্রয়োজন পড়ে তবে আমাকে জানালে সেটা বিনামূল্যে সরবরাহ করবো।'

বলা বাহুল্য, ওষুধওয়ালা তার স্ত্রীকে সেদিনই ফিরে পেল।

অনেকের বিশ্বাস বিজ্ঞাপনে কোনো কাজ হয় না, এটা শুধু শুধুই একটা বাড়তি খরচ। তবে তাই যদি হতো তবে দূরদর্শনে, বিবিধ ভারতীতে, খবরের কাগজে-পত্রিকায়, রাস্তাঘাটে সাইনবোর্ডে, হোর্ডিংয়ে এত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে খরবুদ্ধি বিষয়ী ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনে মাততেন না।

বিজ্ঞাপনের উপকারিতা সম্পর্কে একটি চিঠির উল্লেখ এই সূত্রে করা যেতে পারে। চিঠিটি এক ভদ্রমহিলা লিখেছিলেন, এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে। মহিলার পোষা কুকুর হারিয়ে গিয়েছিল। সেই কুকুরের ছবি দিয়ে কাগজের হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

বিস্তারিত বলবার কিছু নেই। ভদ্রমহিলার প্রেরিত চিঠিটি তুলে দিচ্ছি, তাহলেই বিজ্ঞাপনের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম হবে —

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহোদয়,

আমার পোষা কুকুর রোজী গত মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে কী করে রাস্তায় বেরিয়ে হারিয়ে যায়। মঙ্গলবার-বুধবার এই দু'দিন রোজীকে চারপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজি কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাই না।

অবশেষে বাধ্য হয়ে গতকাল বিষ্যুদবার দিন রোজীর একটা ফটো নিয়ে আপনার কাগজে নিরুদ্দেশ কলমে বিজ্ঞাপন দেই।

সত্যি সত্যি বিজ্ঞাপনের অপূর্ব মহিমায় আমি অভিভূত হয়ে গেছি। আজ সকালে আপনার কাগজে ছবিসহ রোজীর বিজ্ঞাপন বেরোনোর আধ ঘণ্টার মধ্যে রোজী একা একাই বাড়িতে ফিরে এসেছে। হঠাৎ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখি রোজী মাথা নিচু করে গুটি গুটি বাড়ির মধ্যে ঢুকছে।

আপনাকে আমার শতসহস্র ধন্যবাদ।

ইতি

* * *

বিজ্ঞাপন যে শুধুই উপকার করে তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞাপন জিনিসটা লাভজনকও বটে। আমাদের প্রতিবেশী সুমতি হালদারের ঘটনাটাই ধরা যাক।

শ্রীমতী হালদারের প্রায় চল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। অবশেষে আমার স্ত্রীর পরামর্শে এবং শুভানুধ্যায়ীদের অনেক জোরাজুরি আলাপ আলোচনার পর শ্রীমতী হালদার নিজের বিয়ের একটা বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে দিতে রাজি হন। সেই বিজ্ঞাপনটি আমি স্বয়ং খসড়া করে দিই এবং আমার এই মুসাবিদা আমার অন্যান্য রচনার মত এতই উৎকৃষ্ট মানের হয় যে অবিলম্বে শ্রীমতী হালদারের বিয়ে ঠিক হয়ে যায়।

বিজ্ঞাপনটি দিতে শ্রীমতী হালদারের আশি টাকা খরচ হয়েছিল। এরপরে বিয়ের রেজিস্ট্রি এবং ঘনিষ্ঠ দু-চারজন বন্ধুবান্ধবকে শুভকার্য উপলক্ষে আপ্যায়নে সর্বসমেত আড়াইশো টাকা ব্যয় হয়। বিজ্ঞাপনের আশি টাকা আর এই আড়াইশো টাকা মিলিয়ে মোট খরচ হয় তিনশো তিরিশ টাকা।

এরপরে বিয়ের পনেরোদিনের মাথায় শ্রীমতী হালদারের স্বামী ভদ্রলোকের (প্রায় পঞ্চান্ন

বছর বয়েস হয়েছিল, তিনি ছিলেন নিঃসন্তান ও বিপত্নীক) এই স্বামী বেচারা হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোকগমন করেন।

ভদ্রলোকের একটা পঁচিশ হাজার টাকার জীবনবীমা ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে শ্রীমতী হালদার এই টাকাটা একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে পেলেন। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বাবদ আশি টাকা আর সেইসঙ্গে আড়াইশো টাকা, মোট তিনশো তিরিশ টাকা ব্যয়ে শ্রীমতী হালদারের নেট লাভ হলো চব্বিশ হাজার ছয়শো সত্তর টাকা।

সুতরাং বিজ্ঞাপন যে যথেষ্টই লাভজনক এই ঘটনার পরে আর কেউ অবিশ্বাস করবেন না। তবুও কেউ যদি অবিশ্বাসী এখনও থেকে থাকেন তার জন্যে আরো একটা উপাখ্যান আমি জানি।

এ গল্প আমার বিশেষ পরিচিত এক প্রকাশককে নিয়ে। বলা বাহুল্য, সে আমারও দু-একটা ছোটখাটো বই প্রকাশ করেছে। সে আমার খুব কাছের লোকও বটে।

তার সঙ্গে দেখা হলো সেদিন বহুকাল পরে বইমেলার ভিড়ে। সে আমাকে দেখে করুণ মুখে বললো, 'দাদা একেবারে বসে গেছি।'

আমি বললাম, 'কী হয়েছে ?' সে বললো, 'সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম।' আমি বললাম, 'কী করে ?' সে বললো, 'অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনে একেবারে পথে বসে গেছি।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম, কারণ একে কখনো বইয়ের কোনো বিজ্ঞাপন দিতে দেখিনি, দিলেও সে নাম মাত্র। সুতরাং বিজ্ঞাপনে পথে বসে যাওয়া বা সর্বস্বান্ত হওয়া এর পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। সে কথা আমি তাকে বললাম, 'তুমি খুব বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়েছো বলে তো দেখিনি।'

সে বললো, 'না দাদা আমি কখনো কোনো বিজ্ঞাপন দেইনি। কিন্তু অন্যেরা দিয়েছে, তারা দিনের পর দিন বড় বড় করে দৈনিকে-সাপ্তাহিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। তাদের বই বিক্রি হচ্ছে, আমার কিছুই হচ্ছে না। তাই বলছি বিজ্ঞাপনে-বিজ্ঞাপনে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম।'

* * *

তবে স্বর্গীয় শিবরাম চক্রবর্তী মহোদয় বিজ্ঞাপনের যে নমুনাটি দিয়েছিলেন সেটি অবিস্মরণীয়। না, আমি তাঁর বইয়ের সেই বিখ্যাত বিজ্ঞাপনটির কথা বলছি না, যেখানে বলা হয়েছিল

উপনিষদ বলেছেন
        তুষ্ট হয়ো না অল্পে,
শৈলর আঁকা ছবি
        আর শিবরামের গল্পে।

অন্য একটি বিজ্ঞাপনের কথা বলছি, সেটা অবশ্য শিবরামের বানানো এবং আমি একাধিকবার উল্লেখ করেছি, কিন্তু বিজ্ঞাপনের নিবন্ধে সেই বিজ্ঞাপনটি বাদ দেয়া যায় না।

পাত্রী চাই

সুদর্শন, সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান, চাকুরিয়া (ইত্যাদি ইত্যাদি) পাত্রের জন্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্রীর নিজের বাড়ি থাকা প্রয়োজন। বাড়ির ফটোসহ আবেদন করুন।

রাম ও রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ শব্দটি অবশ্যই দ্বন্দ্ব সমাস। যার ব্যাসবাক্য হলো রাম ও কৃষ্ণ। তবে কেউ কেউ জটিল করে 'যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ'—এইরকম ব্যাসবাক্য করলে তাতেও খুব আপত্তি করা উচিত হবে না।

আমাদের এ বারের নিবন্ধের বক্তব্য খুব সরল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত রামায়ণের রামচন্দ্র সম্পর্কে পরমপুরুষ যে সব উপাখ্যান বলেছেন তারই কিছু উদ্ধৃতি এবারের সম্বল।

দূরদর্শনের দৌলতে রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্য আবার আসমুদ্র হিমাচলকে আকর্ষণ করেছে। সেই সূত্রেই আমার এবারের এই রামলীলা

* * *

সব আখ্যান হয়তো সব পাঠকের কাছে সরস মনে হবে না। কিছু কিছু কাহিনী সরসতার এলাকা পার হয়ে চিরায়ত দর্শনের সীমানায় পৌঁছে গেছে।

প্রথমেই দর্শন দিয়েই শুরু করি।

সীতাহরণের পর লঙ্কায় যাওয়ার পথে সামনে সমুদ্র দেখে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে করে ক্রুদ্ধ হয়ে রামকে বলেছিলেন, 'আমি বরুণকে বধ করবো। এই সমুদ্র আমাদের লঙ্কায় যেতে দিচ্ছে না।'

রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ, এ যা কিছু দেখছো এ সব তো স্বপ্নবৎ। অনিত্য। সমুদ্রও অনিত্য, তোমার রাগও অনিত্য। মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা বধ করা, সেটাও মিথ্যা।'

এর চেয়ে অনেক বেশি অনিত্য আখ্যান রাবণ জন্ম ও রাবণ বধের। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অসামান্য কথকতায় এ আখ্যান যে ভাবে বিবৃতি করেছেন, পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদধন্য শ্রীম যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এই রচনায় সেটা নিশ্চয় কেউ আশা করছেন না, সুতরাং ভরসা করে লিখি।

(ভরসা মানে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা)

কৈলাসে শিবঠাকুর আর তাঁর সুযোগ্য সহচর নন্দী বসে আছেন। হঠাৎ দুম করে একটা ভীষণ শব্দ হলো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু এ কিসের শব্দ ?'

শিবঠাকুর বললেন, 'এই মাত্র রাবণ জন্মালো, তাই এত শব্দ।'

কিছুক্ষণ পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হলো। নন্দী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, এবার আবার কিসের শব্দ হলো ?'

শিব মৃদু হেসে বললেন, 'এবার রাবণ বধ হলো।'

* * *

রামকৃষ্ণ এরপর বলেছেন, 'জন্ম মৃত্যু। এসব ভেলকির মতো। এই আছে। এই নেই। সব অনিত্য।...

...জলই সত্য। জলের ভুড়ভুড়ি। এই আছে, এই নেই। ভুড়ভুড়ি জলে মিশে যায়। যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়।'

* * *

এরপরে রামকৃষ্ণ কথিত দুটি রামভক্তির গল্প স্মরণ করি। বলা বাহুল্য দুটিই রূপক গল্প। এতে লোককথার সঙ্গে ঈশ্বরভক্তির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

প্রথম গল্পটি একটি কাক নিয়ে, দ্বিতীয়টি একটি কোলা ব্যাঙ নিয়ে।

রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখলেন, একটি কাক ব্যাকুল হয়ে বারবার জল খেতে যায়, কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'ভাই এ কাক পরমভক্ত। অহর্নিশি রামনাম জপ করছে। একদিকে জল তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু খেতে পারছে না। ভাবছে, খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ ফাঁক হয়ে যায়।...

কোলাব্যাঙের কাহিনীটি ততোধিক মর্মান্তিক। সে ঘটনাও পম্পা সরোবর তীরে।

রাম লক্ষ্মণ সরোবরের তীরের মাটিতে ধনুর্বাণ গুঁজে স্নান করতে নেমেছেন। স্নানের পরে উঠে লক্ষ্মণ মাটিতে গুঁজে রাখা বাণ তুলে দেখেন যে সেটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে রয়েছে। রাম তাই দেখে ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'ভাই দ্যাখো তো, বোধহয় কোনো জীবহিংসা হলো।'

লক্ষ্মণ তখন মাটি খুঁড়ে দেখলেন একটা বেশ বড় কোলা ব্যাঙ। শেষ অবস্থা। রাম করুণ স্বরে বললেন, 'কেন তুমি শব্দ করোনি, চেঁচিয়ে ওঠোনি ? আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। যখন সাপে ধরে তখনতো খুব চেঁচাও।'

কোলা ব্যাঙ বললো, 'রাম, যখন আমাকে সাপে ধরে তখন আমি চেঁচাই, 'রাম রক্ষা

করো, রাম বাঁচাও, এই বলে। এখন দেখলাম রামই আমাকে মারছেন। তাই চুপ করেছিলাম।'

দুটি কাহিনীরই বক্তব্য খুবই সরল ও স্পষ্ট। সারমর্ম বুঝতে অতি অশিক্ষিত, অতি সাধারণ লোকেরও কোনো অসুবিধে হয় না, হতে পারে না। যে কোনো কথা শিল্পীর পক্ষে এ বিষয়ে পরমপুরুষের ধারে কাছে পৌঁছানো অসম্ভব।

রাবণকে নিয়েও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনেক গল্প। সীতা তখন অশোক কাননে বন্দিনী। সীতাকে পাওয়ার জন্যে অনেক রকম ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে রাবণ। সেই সময় রাবণকে প্রশ্ন করা হয়, 'তুমি সীতার জন্যে নানারকম মায়ারূপ ধরেছো। একবার রামরূপ ধারণ করে সীতার কাছে গিয়ে দেখো না।

রাবণ বললো, 'যখন রামরূপ চিন্তা করি ব্রহ্মপদ পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়, পরস্ত্রীতো সামান্য কথা। তাহলে রামরূপ কি করে ধরবো ?'

সীতা এবং রাবণকে নিয়ে রামকৃষ্ণের অন্য একটা গল্প আরও বেশি অর্থবহ।

সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সীতার এ কথার মানে রাবণ বুঝতে পারেনি। তাই রাবণ এ কথা শুনে ভারি খুশি। সীতার একথা বলবার হেতু এই-যে রাবণের যতদূর যা হবার তা হয়েছে। সে পূর্ণচন্দ্রের মত বিকশিত, এইবার দিনদিন তার চন্দ্রকলার হ্রাস পাবে, সে কৃষ্ণপক্ষের দিকে এগোচ্ছে।....

...আর রামচন্দ্র হলেন দ্বিতীয়ার চাঁদ। তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।'

* * *

পুনশ্চঃ

এই রচনার অবশেষে অন্তত সামান্য একটু সরসতা না আনলে এই ধারাবাহিকের পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। তবু বলি এই জন্যে যদি কারো মনে সন্দেহ হয় যে পরবর্তী খণ্ড আখ্যানটি এই সামান্য গদ্যকারের নিতান্ত বানানো, তিনি দয়া করে উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৪৬) দেখে নেবেন। উপমা রামকৃষ্ণস্য নামক শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর বইয়ের একশো তেইশ নম্বর সংকলন সূত্রেও এটি রয়েছে।

গল্পটি খুব ছোট, খুবই সংক্ষিপ্ত।

...এক রামভক্ত রাতদিন হনুমানের চিন্তা করতো। মনে করতো আমি হনুমান হয়েছি।

শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হলো যে তার একটু ল্যাজও হয়েছে।...

কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ

সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছি। রবিবারের বিলম্বিত সকাল, দূরদর্শনে সদ্য মহাভারত শেষ হয়েছে। দেখলাম সে বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মাকে যথাক্রমে পিতাশ্রী মাতাশ্রী বলে সম্বোধন করছে। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে দূরদর্শনে মহাভারত চিত্রমালার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এরা এরকম সম্বোধন করা শিখেছে।

টিভি রামায়ণের মত টিভি মহাভারতও ক্রমশ অপরিসীম জনপ্রিয়তার দিকে ধাবমান হচ্ছে। সেদিন আর খুব বেশি দূরে নয়, যখন ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায় গদাযুদ্ধ দেখা যাবে এবং যে কোনো মুদির দোকানে গদা কিনতে পাওয়া যাবে।

এখনই কোনো কোনো পাড়ায় মহাভারত প্রদর্শনের সময়ে পথে বিশেষ কোনো লোক থাকে না। বাজারহাট, রাস্তাঘাট—সব প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়, অঘোষিত মহাকাব্যিক কার্ফু জারি হয়।

সংস্কৃত মহাভারত প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। বাংলায় পদ্যে কাশীরাম দাশ এবং গদ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ আর একালে রাজশেখর বসুর মহাভারত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। তবে এর কোনোটাতেই কৃষ্ণ চরিত্র প্রধান নয়, কৃষ্ণ নায়ক নন। পাণ্ডবদের বন্ধু এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি—মূল মহাভারতের কৃষ্ণ কথা প্রায় এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মহাভারতের কৃষ্ণ নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃষ্ণ এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়। আগেরবারের নিবন্ধ ছিল রাম ও রামকৃষ্ণ, এবারের বিষয় কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ।

শ্রীরামের মতোই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়েও পরমপুরুষের অজস্র সরস মন্তব্য ও আখ্যান। মহাভারতের কয়েকটি কাহিনীরও এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন।

যুধিষ্ঠির একবার স্থির করেছিলেন যে তাঁর সমস্ত পাপ কৃষ্ণকে সমর্পণ করে দেবেন এবং এই ভাবে তিনি পাপমুক্ত হবেন।

মধ্যমপাণ্ডব ভীম কিন্তু তখন যুধিষ্ঠিরকে বাধা দিলেন এবং সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'অমন কাজটি করতে যেয়ো না।'

ভীমের এ কথা শুনে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ?'

ভীম বললেন, 'কৃষ্ণকে যা কিছু অর্পণ করা যাবে তাই সহস্রগুণ হয়ে যাবে। তাঁকে একগুণ যা দেওয়া যায় তাই হাজারগুণ হয়ে যায়। কৃষ্ণকে পাপ সমর্পণ করলে সে পাপও সহস্রগুণ হয়ে যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য, 'তাই সব কাজ করে জলের গণ্ডুষ অর্পণ। কৃষ্ণে ফল সমর্পণ।'

পরমপুরুষের মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে অপর একটি গল্প কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কার। এটা গীতার গল্প, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভের।

অর্জুন শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, 'আমি যুদ্ধ করতে পারবো না। জ্ঞাতিবধ করা আমার দ্বারা হবে না।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু অর্জুন তোমাকে এ যুদ্ধ করতেই হবে। তোমার স্বভাবই করাবে।'

এর পরেও অর্জুন যুদ্ধ করতে আপত্তি করেন। জ্ঞাতি-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, গুরু ও গুরুজনদের সঙ্গে প্রাণক্ষয়ী, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে তিনি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন যে 'তুমি যাদের হত্যা করবে বলে আপত্তি করছো তারা কিন্তু কেউই জীবিত নয়, এই সব লোক আগে থেকেই মরে রয়েছে।'

এটুকুতো সবাই জানে কিন্তু এই সূত্রে রামকৃষ্ণ শিখদের কথা বলেছেন। শিখরা ঠাকুরবাড়িতে এসেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'শিখদের মতে অশ্বত্থ গাছে যে পাতা নড়ছে সেও ঈশ্বর ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছা বই একটি পাতাও নড়বার জো নেই।'

শ্রীকৃষ্ণ রহস্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের কাজ আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কী বুঝবো ?' এই সূত্রে তিনি একাধিক আখ্যানকে উল্লেখ করেছেন।

ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত, দেহত্যাগের সময় হয়েছে। পাণ্ডবভ্রাতারা শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে করে ভীষ্মের শরশয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন যে পিতামহ ভীষ্মের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

অর্জুন এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'কি আশ্চর্য ! স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, যিনি কিনা অষ্টবসুর এক বসু তিনিও দেহত্যাগের সময় সংসারের মায়ায় কাঁদছেন।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন ভীষ্মদেবকে অর্জুনের এই কথা বলাতে ভীষ্মদেব বললেন, 'কৃষ্ণ তুমি অবশ্যই জানো, আমি সে কারণে কাঁদছি না। যখন চিন্তা করছি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে সারথি, তাদেরও দুঃখ-বিপদের শেষ নেই, তখন এই মনে করে কাঁদছি যে ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

* * *

শ্রীকৃষ্ণের ভগবানত্ব নিয়ে সমস্যা ছিল শুধু একজনার, তিনি মা যশোদা।

মা যশোদার প্রসঙ্গ রামকৃষ্ণ নানাসূত্রে বারবার টেনে এনেছেন।

যশোদা ভাবতেন আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তাহলে গোপালের অসুখ হবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না।

উদ্ধব যশোদাকে বলেছিলেন, 'মা তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি জগৎ চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন। তাঁর কি হবে ?'

যশোদা বললেন, 'ওরে তোদের সাক্ষাৎ ভগবান বা চিন্তামণি নয়, আমি আমার গোপালের কথা বলছি, আমার গোপাল কেমন আছে ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ যশোদামায়ের আর একটি একই রকম গল্প বলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ একবার যশোদাজননীকে বললেন, 'তোমাকে আমি নিত্যধাম দর্শন করাবো। এসো যমুনায় স্নান করতে যাই।'

তাঁরা যেই ডুব দিয়েছেন, একেবারে গোলকদর্শন। অখণ্ড জ্যোতি দর্শন।

যশোদা কিন্তু এত সব দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না, কৃষ্ণকে বললেন, 'কৃষ্ণরে তোর ঐ গোলকদর্শন, জ্যোতি দর্শন, ওসব আর দেখতে চাই না। এখন তোর সেই মানুষ রূপ দেখবো। তোকে কোলে করবো। তোকে খাওয়াবো।'

রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। দেহধারণ করলে রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই আছে। মনে হয় আমাদেরই মতো।'

পরিশেষে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এই শ্রীকৃষ্ণ কথামালার অন্তে আমার নিজের একটি তুচ্ছ কাহিনী যোগ করি।

গল্পটি পুরনো, শ্রীকৃষ্ণের বয়েস নিয়ে।

এক বৃদ্ধা কৃষ্ণকথকতা শুনতে শুনতে কথকঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা ঠাকুরমশায় শ্রীকৃষ্ণের বয়েস কত ছিল।'

ঠাকুরমশায় স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলেছিলেন, একেক সময়, একেক রকম। যখন ছোট শিশুটি ছিলেন তখন বয়েস ছিল এক-দুই, তারপর বড় হলেন বালক হলেন, কিশোর হলেন তখন বয়েস দশ-বারো-পনেরো হলো, তারপর বাড়তে বাড়তে বিশ-পঁচিশ যুবক হলেন, তারপর যখন প্রৌঢ় হলেন...'

এই পর্যন্ত শুনে বৃদ্ধাটি বাধা দিলেন, 'থাক, থাক, আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।'

ভালবাসা ও টেলিফোন

টেলিফোনে সারাদিন যত কথা হয় তার অনেকটা ‘কেয়া ভাঁও’, কিছুটা ‘ইয়েস-নো-ভেরি গুড’, কিছুটা ননদ-বৌদির ডাল-ভাত, হাম-সিনেমা নিয়ে বাক্যালাপ। এর বাইরে রং নাম্বার নিয়ে ক্রোধ অভিমান ইত্যাদি বাদ দিলে বাকি সবটাই কপোতকাকলি। অবিরত নিরন্তর প্রেমগুঞ্জন। ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা।

টেলিফোন মানে ফোন। ইংরেজিতে ফোনি (phoney) বলে একটা শব্দ আছে। খাঁটি ইংরেজি অর্থাৎ নিকষ কুলীন শব্দ নয়, এটা একটা অন্ত্যজ শব্দ, মার্কিনি স্ল্যাং। ফোনি শব্দটির জন্মবৃত্তান্ত অভিধানকারেরাও জানেন না, তবে ইংরেজিতে বেশ চালু হয়ে গেছে ; শব্দটির মানে হলো ভুয়ো বা জাল কিংবা সন্দেহজনক।

ফোনি শব্দের অর্থ যাই হোক ফোনে ভালবাসা কিন্তু মোটেই ভুয়ো নয়। একবার ফোনে ক্রসকানেকশনে এক প্রেমিকার অনুযোগ শুনেছিলাম, দয়িতকে জিজ্ঞাসা করছে, ‘তুমি আজ এলে না কেন ?’ পুরুষ কণ্ঠে উত্তর শুনলাম, ‘আমার সানগ্লাসটা খুঁজে পেলাম না।’ মেয়েটি বললো, ‘সানগ্লাস কি দরকার ছিলো ? তাছাড়া আজ তো রোদ্দুর ছিলো না।’

ছেলেটির মোলায়েম কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, ‘রোদ্দুরের জন্যে নয়। তোমার যা চেহারা হয়েছে না মাইরি, সানগ্লাস চোখে না দিয়ে গেলে চোখ ঝলসিয়ে যায়। তাই যাইনি।’ এই আশ্চর্য স্তোকবাক্যটি নিশ্চয়ই ফোনি। কিন্তু প্রেয়সীর সৌন্দর্যের যে উজ্জ্বল বর্ণনা ছেলেটি

দিয়েছিলো তার তুলনা নেই কাব্যের কথায় অন্য এক ব্যর্থ কবির কথা বলি। সেটাও টেলিফোন ও ভালবাসা নিয়ে। ঘটনাটা আমার নিজেকে নিয়ে। আজ কয়েক বছর হলো উল্টো পাল্টা হাল্কা লেখা লিখে আমার ভাগ্যে কিছু ফাজিল পাঠিকা জুটেছে। সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে তারা ফোন করে আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করার চেষ্টা করে। আমার একটা সুবিধে আছে। পুরুষানুক্রমে আমরা বাড়ির সবাই একটা থমথমে ভারী গলার অধিকারী। আমার ছেলের কণ্ঠস্বরও আমারই মত হয়ে উঠেছে। আমি এই সুবিধেটাই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি, যখনই কোনো ফাজিল তরুণীর কণ্ঠস্বর ফোনে শুনে চিনতে পারি, আমি সঙ্গে সঙ্গে জানাই, 'বাবা, বাড়ি নেই।' এই দেড়-কাহিনী লেখাটার সাতকাহন হয়ে গেলো নিজের কথা। এই আমার এক পুরনো দোষ। এবার টেলিফোন ও ভালবাসা কিংবা ভালবাসা ও টেলিফোনে আবার ফিরে যাচ্ছি। একবার এসপ্ল্যানেড ট্রাম গুমটিতে দেখেছিলাম, এক নবীন যুবক টেলিফোন বুথে কোনো কথা না বলে ফোন কানে দিয়ে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর পিছনে অপেক্ষমান জনতার ভিড়। ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। লোকেরা সবাই গালাগাল করছে। ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে, কিন্তু সে যুবক নির্বিকার কি একটা প্রয়োজনে আমিও সেদিন ঐ পাবলিক বুথ থেকে ফোন করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভিড়, উত্তেজনা ইত্যাদি দেখে যখন ফিরে আসছি সেই সময় পাকা বত্রিশ মিনিট পরে নির্বাক যুবকটি সমস্ত গালাগাল হেলায় উপেক্ষা করে ফোন ছেড়ে বুথ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি ছেলেটা আমার চেনা। আমার এক প্রাচীনা বান্ধবীর ভাসুরপো। সে আমাকে চিনতে পারলো, বললো, 'কাকা, আপনি এখানে?' আমি বললাম, 'আমি ফোন করতে এসেছিলাম,

কিন্তু তুমি কোনো কথা না বলে বত্রিশ মিনিট ফোনটা আটকে রাখলে তাই ভিড় দেখে চলে যাচ্ছিলাম।'

ছেলেটি করুণ কণ্ঠে বললো, 'কাকা, সামনের মাসে আমার বিয়ে। আপনার ভাবী বৌমার সঙ্গে কথা বলছিলাম। পাকা আধ ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে সব কথাই ও বলে গেলো, আমি কিছুই বলতে পারলাম না, শুধু শুনলাম। তারপর ভিড় দেখে ফোন নামিয়ে রেখে পালাচ্ছি।'

ছেলেরা খুব সহজে পালাতে পারে, মেয়েরা পারে না।

একটি মেয়ে একদিন রাত একটার সময় ফোনের শব্দে জেগে উঠে, নিদ্রা জড়িত পদক্ষেপে টেলিফোন ধরে। ও প্রান্ত থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠ বলছে, 'কে মালতী ?'

মেয়েটির নাম মালতী, সে সেটা স্বীকার করলো।

তখন অন্যপ্রান্ত থেকে কাতর আকুতি শোনা গেলো, 'বলো মালতী, তুমি স্পষ্ট করে বলো আমাকে ভালবাসো কি না। না হলে এখনই আমি আত্মহত্যা করবো, সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছি।' স্পষ্টতই মাতাল কি পাগলের ব্যাপার। মালতী বাধ্য হয়ে বললো, 'কত বলবো ভালবাসি। হ্যাঁ, ভালবাসি, ভালবাসি।' তারপর একটু থেমে গলা নরম করে বললো, 'আচ্ছা, তুমি কে বলছো ? তুমি বিপুল না ভজন ? গলা শুনে মনে হচ্ছে তুমি রহিম। কিন্তু রহিমতো মদ খায় না। তা হলে তুমি আয়েংগার ? নাকি...' ওপাশে ঝনাৎ করে ফোন নামানোর শব্দ হলো। তবে পরের দিন কাগজে কোনো আত্মহত্যার খবর ছিলো না সেটাই যা রক্ষা। অবশেষে অন্য একটি মর্মান্তিক ফোনালাপ দিয়ে এই ভালবাসার উপাখ্যান শেষ করি।

দুই টেলিফোনের দুই প্রান্তে দুই মহিলা পরস্পর কথা বলছেন।

প্রথম মহিলা কণ্ঠ : (বেশ উত্তেজিত) বলিস কি ? তাহলে মালতী শেষ পর্যন্ত সত্যিই বিয়ে করলো। ওর লাভারকে তো আমি খুব বহুকাল ধরে চিনি।

দ্বিতীয় মহিলা কণ্ঠ : (চাপা, ভাঙা গলা) আরে তা তো হলো। কিন্তু এ লাভার সে লাভার নয়। মালতী ওর নিজের লাভারকে বিয়ে করেনি। এক নম্বরের নচ্ছার মেয়ে, ও কিনা আমার লাভারকে বিয়ে করলো !

জলবৎ তরলং

পরপর কয়েক সপ্তাহ ধর্মকর্ম করে, ধর্ম কথা আলোচনা করে যথেষ্টই পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে, অন্তত আমার নিজের তাই ধারণা। এবং সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে এবার আবার পাপের পথে পা বাড়াচ্ছি।

এবার আমার পাপের সঙ্গী পঞ্চ 'ম'কারের অন্যতম মতান্তরে বিপজ্জনকতম মদ নামক প্রাচীন পানীয়। মদের কারণেই এই নিবন্ধের নাম জলবৎ তরলং, অর্থাৎ জলের মত তরল। এই অশুদ্ধ বাক্যবন্ধটি ধ্বনি ব্যঞ্জনার লোভে এখানে ব্যবহার করলাম।

মদের ব্যাপারে ভূমিকা বিস্তৃত করে লাভ নেই, রসিক পাঠক তৃষ্ণার্ত বোধ করবেন।

প্রথমে নববধূ দিয়ে আরম্ভ করি। বিয়ের একমাসের মাথায় নববধূ অভিযোগ করলেন তাঁর স্বামী নিত্য মদ্যপান করে বাড়ি আসেন, ব্যাপারটা তাঁর খুব খারাপ লাগছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিয়ের আগেও মোটামুটি প্রায় এক বছর কাল উক্ত নববধূ তাঁর স্বামীর সঙ্গে প্রচুর প্রেম করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, 'বিয়ের আগের বারো মাস তারপর বিয়ের পরে এই এক মাস হয়ে গেল, এর মধ্যে আপনি মোটেই টের পাননি যে আপনার স্বামী মদ খান ?'

নববধূটি সরলভাবে জবাব দিলেন, 'না আমি একেবারেই টের পাইনি। শুধু এই দুদিন আগে এক সন্ধ্যাবেলায় ঝড়জলের জন্যে ও বাড়ি থেকে বেরোতে পারলো না তখন আমার

কেমন সন্দেহ হলো। ও কিরকম অন্যদিনের থেকে একেবারে আলাদা। সেই হাসিখুশি ভাব নেই, ঠোঁটে গুনগুন গান নেই, খিটখিটে মেজাজ, কর্কশ কথা। সেদিন আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলাম না। পরদিন সন্ধ্যাবেলাও যখন আগের মত বাইরে থেকে বাড়ি এলো আবার সেই হাসিখুশি ভাব, গুনগুন গান, সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, ওগো কাল কী হয়েছিল ?'

নববধূর দাম্পত্য আলাপ এর চেয়ে বাড়ানো অশালীন হয়ে যাবে শুধু বলে রাখি এই দুই সন্ধ্যার আপেক্ষিক তারতম্যে নববধূ নির্মদ ও মদমত্ত স্বামীর পার্থক্য চমৎকার টের পেয়েছিল।

শুধুই কি হাসিখুশি ভাব, ঠোঁটের ডগায় মধুর গানের গুনগুনানি মদ মানুষকে আত্মপ্রত্যয় জোগায়, যদিও অনেক সময় সে প্রত্যয় অতি সর্বনেশে।

এক বিখ্যাত চিকিৎসক মদ্যপানের অপকারিতা বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতার শেষে তাঁকে এক মদ্যপ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, আপনি যে মদ্যপানের বিরুদ্ধে এত কথা বলে গেলেন আপনি কি স্বীকার করেন না যে মদ খেলে লোকে যে কোনো কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারে ?'

চিকিৎসক মহোদয় এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'কথাটা ঠিক তা নয়। মদ খেলে লোকে কোনো কাজ ভালোভাবে করতে পারে একথা সত্যি নয়, তবে মদ খেয়ে কোনো কাজ করার সময় মনে হয় যে খুব ভালোভাবে কাজটা করছি।'

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে মদ খেয়ে মানুষ সাধারণত যে সব কাজ করে থাকে সেগুলো মোটেই ভালো কাজ নয়। সুতরাং সেগুলো ভালোভাবে করার চেয়ে খারাপভাবে করাই বোধহয় ভালো।

চিকিৎসকের সূত্রে মাথাধরার গল্পটা এখানে বলে রাখি, খুবই ছোটো গল্প।

দুই মদ্যপের মধ্যে কথা হচ্ছে। প্রথম মদ্যপ দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা ভাই মাথাধরার জন্যে তুমি কী করো ?' দ্বিতীয় মদ্যপ শুকনো মুখে বললেন, 'কি আর করি ? আগেরদিন রাতে যতটা পারি মদ খাই। তা হলেই সকালবেলা মাথাটা বেশ ধরে।'

মাতালদের এই প্রাতঃকালীন মাথাধরার সাহেবি নাম হ্যাং-ওভার (Hang over), মানে ঝুলে থাকা। এক প্রাতঃস্মরণীয় কথাসাহিত্যিক বলেছিলেন যে মদ খায় সেই কখনো না কখনো মাতাল হয় নয় সে মদের বদলে জল খায়। অনেকদিন পরে স্মরণ করতে গিয়ে উদ্ধৃতিটা একটু ঘুলিয়ে গেল মনে হচ্ছে, তবে কথাটা এই রকমই। এই কথাটাই একটু বাড়িয়ে বলা যায়, যে মদ খায় তারই কখনো না কখনো হ্যাং-ওভার হয় নয় যে মদের বদলে জল খায় কিংবা মদের সঙ্গে জল বেশি খায়।

মদ বেশি খেলে বা অনভ্যস্ত লোক মদ খেলে পা টলমল করে, মাথা ঝিমঝিম করে, চোখ ধাঁধা লাগে। সব জিনিস ডবল-ডবল দেখায়। টেবিলে একটা বোতল থাকলে মনে হয় দুটো, দুটো গেলাস থাকলে মনে হয় চারটে।

এক যুবকের স্ত্রী সন্তান হতে প্রসূতিসদনে গেছে। প্রথম সন্তান, আনন্দে, উত্তেজনায় স্ত্রীকে হাসপাতালের ভেতরে পৌঁছে দিয়ে যুবকটি পাশেই একটা বারে মদ খেতে গেছে। কয়েক ঘণ্টা বাদে মদ খাওয়া সাঙ্গ হলে স্খলিত চরণে প্রসূতিসদনে পৌঁছে সে সুসংবাদ পেল তাঁর স্ত্রী নিরাপদে প্রসব করেছে। প্রসূতিসদনের জমাদারকে দুটো টাকা বখশিস দিয়ে সে

জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল তার স্ত্রীর শয্যার পাশে পাশাপাশি দুটো বাচ্চা শোয়ানো রয়েছে।

এই দৃশ্য দেখে হৃষ্টচিত্ত যুবকটি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেলো কর্পোরেশন অফিসে যমজ বাচ্চার জন্ম রেজিস্ট্রারি করতে।

সেখানে বার্থ রেজিস্ট্রেশনের ঘরে এক কেরানিবাবু বিরাট মোটা খাতা আগলিয়ে বসে রয়েছে। যুবকটি তাঁকে গিয়ে বললো, 'দাদারা, এইমাত্র আমার স্ত্রী যমজ বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। তাই লেখাতে এসেছি।'

কেরানিবাবু খাতায় কী লেখালেখি করছিলেন, তিনি খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, 'দাদারা বলছেন কেন, এখানে তো আমি একা বসে রয়েছি।'

এই কথা শুনে যুবকটির সম্বিৎ ফিরে এলো, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কেরানিবাবুকে বললেন, 'দাদা আগেই লিখবেন না। আমি আরেকবার হাসপাতাল থেকে দেখে আসি সত্যিই বাচ্চা দুটো না একটা। ভুল দেখিনি তো ?'

মাতাল ও যমজ বিষয়ে আরেকটি বিখ্যাত গল্প আছে।

দুই যমজ ভাই একদিন ঠিক করলো যে তারা কোনো এক মাতালকে বেছে তাকে নিয়ে একটু মজা করবে। সেদিন সন্ধ্যায় তারা দু'জনে একই রকমের পোশাক পরলো, একই রঙের টাই, মাথার চুলের সিঁথি একইভাবে আঁচড়ানো।

দুজনে এক পানশালায় গিয়ে দরজার কাছের টেবিলে বসলো এবং সামান্য পান করতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে এক মদ্যপ, তখন তার টলটলায়মান অবস্থা, কিছু আগেই আশেপাশেই কোথাও যথেষ্ট পান করেছে, বারের মধ্যে ঢুকেই এই দুজনকে দেখে থমকিয়ে দাঁড়ালো। তারপর দুহাত দিয়ে চোখ কচলিয়ে খুব সন্তর্পণে পাশের একটা টেবিলে গিয়ে একটা পানীয় নিয়ে সাবধানে ও ধীরে পান করতে লাগলো। এবং সেইসঙ্গে এই ভ্রাতৃযুগলকে খুব সন্দেহের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

কয়েক মিনিট এরকম চলার পর যমজদের মধ্যে একজন উঠে সেই মদ্যপের টেবিলে গিয়ে বললো, 'দাদা, আমরা সত্যি যমজ। আপনার তেমন নেশা হয়নি যে ভাবছেন ডবল দেখছেন।'

লোকটি চিন্তিতভাবে দুই ভাইয়ের দিকে আবার তাকালো, তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'সত্যি বলছেন, আপনারা চারজনই যমজ ?'

রমণী ও রাজনীতি

রাজনীতি মানে যদি হতো নিতান্তই রাজার নীতি, তা হলে অন্তত সেই অর্থের সুবাদে এই অরমণীয় রচনার হাত থেকে অব্যাহিত পেতে পারতাম।

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অভিধান আমার সপক্ষে নয়। অভিধান বলছে রাজনীতি হলো পলিটিকস, রাষ্ট্রশাসনের ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। সাম, দান, দণ্ড, ভেদ—রাজ্য শাসনের এই চতুর্বিধ উপায় হলো রাজনীতি। যাঁরা তরল রচনা ভেবে এ লেখা পড়তে বসেছেন, দয়া করে সাম, দান, দণ্ড ইত্যাদি পাঠ করে বিহ্বল হয়ে যাবেন না। আমার অধিকার নেই, ভগবান আমাকে ক্ষমতা দেননি কোনো কঠিন বিষয়ে মনোনিবেশ করার। সুতরাং হালকা কাহিনীতে প্রবেশ করি।

প্রথমে রাজনীতির আদি গল্পটি স্মরণ করি। গল্পটি মহারানী ভিক্টোরিয়া এমন কি সুলতানা রাজিয়ার সময়েরও ঢের আগের। তাই এই গল্পে স্ত্রী চরিত্র নেই, নাটকীয় ভাষায় বলা চলে 'স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত।'

তাতে কিছু আসে যায় না। রাজনীতি সম্পর্কিত কোনো আলোচনাই এ গল্পটি বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়।

রোববারের দুপুর বেলায় বিয়ার পানের টেবিলে তুমুল তর্ক হচ্ছিলো চার বন্ধুর মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ কাহিনীর সময় বিয়ারের অনেক আগের যুগের। শুধু আধুনিকতার

কারণে এবং গল্পটি সহজে হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে এই বিয়ারসভা।

সে যা হোক, বিয়ারসভায় চার সুহৃদের মধ্যে তর্কাতর্কি থেকে প্রায় হাতাহাতি। ঘটনা আর কিছুই নয়, বন্ধুদের ভিতরে যিনি ব্যবসায়ী তিনি বললেন, 'আমার পেশাই সবচেয়ে পুরনো। সেই যেদিন সভ্যতা শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে আরম্ভ হয়েছে কেনাবেচা, বেচাকেনা। সেদিন থেকেই শুরু আমার পেশা, আমার ব্যবসা। এর চেয়ে পুরনো আর কি হবে ?'

অন্য বন্ধুরা কিছুতেই এ কথা মানবেন না। তাঁদের মধ্যে যিনি ডাক্তার তিনি বললেন, 'বাজে কথা রাখো। মানুষের আধিব্যাধি সভ্যতার থেকেও পুরনো। যেদিন থেকে মানুষ সেদিন থেকে মানুষের অসুখ। আর অসুখ মানেই চিকিৎসা, চিকিৎসা মানেই চিকিৎসক। বেদে-বাইবেলে পর্যন্ত ডাক্তারের কথা আছে। আমরা ডাক্তাররাই আদি পেশাদার।' তৃতীয় বন্ধুটি উকিল। তিনি জোর সওয়াল করলেন তাঁর জীবিকার প্রাচীনতা সম্পর্কে। তিনি প্রথমে ব্যবসায়ী বন্ধুকে বললেন, 'তোমার দাবি ধোপে টিঁকবে না। আদি যুগের মানুষ তো পশুর পর্যায়ে ছিলো। তারা আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের কি বুঝবে ? তারপর ডাক্তার বন্ধুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'তোমার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। অসুখ চিরকালই ছিলো, সে তো জীবজন্তু, গাছপালা সব কিছুরই অসুখ হয়। কিন্তু চিকিৎসা ? চিকিৎসা তো সেদিন শুরু হলো। আয়ুর্বেদ, বাইবেল, সব গতকালের ব্যাপার। তার আগে অসভ্য মানুষের চিকিৎসাও ছিলো না, চিকিৎসকও ছিলো না।' এরপর উকিলবাবু একবার গলা খাঁকারি দিলেন, দিয়ে বললেন, 'কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ, সেদিন থেকে মানুষে মানুষে ঝগড়া, গোলমাল, বচসা। সেই থেকে মামলা। মামলা আর মোকদ্দমা। আদালত হয়তো ছিলো না, কিন্তু সালিশি ছিলো। বিচার ছিলো। যেখানেই গোলমাল, সেখানেই বিচার আর বিচার মানেই উকিল। তার মানেই আমরা আছি। যেদিন থেকে গোলমাল, সেদিন থেকেই আমরা আছি।'

চতুর্থ বন্ধু এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন, সকলের সব কথা মন দিয়ে ভুরু কুঁচকিয়ে শুনছিলেন, এবার তিন বন্ধুর দিকে এক-এক করে কঠোর দৃষ্টিপাত করে, বিয়ারের গ্লাস সম্পূর্ণ শূন্য করে তারপর আরেক গ্লাস ভরে নিয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'তা হলে ?' বাকি তিন বন্ধুই অবাক হয়ে বললেন, 'তা হলে ?'

চতুর্থ বন্ধু বললেন, 'তা হলে গোলমালটা লাগালো কে ?'

সত্যিই গোলমালটা কে লাগালো ? আসলে এই চতুর্থ বন্ধু হলেন রাজনৈতিক নেতা। তাঁর ধারণা হলো জগৎসংসারের যাবতীয় গোলমাল তিনি কিংবা তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ কিংবা সমধর্মীরা কিংবা তাঁর বিপক্ষীয়েরা লাগান এবং এঁরা সবাই রাজনীতির লোক। সুতরাং যিনি গোলমাল লাগান, সেই আদি ও অনন্ত কাল থেকে তিনি আছেন, তিনি থাকছেন, তিনি থাকবেন।

সুতরাং রাজনীতিই সবচেয়ে পুরনো পেশা। আর এই পুরনো বৃত্তিতে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছেন অনাদিকাল থেকে। হয়তো সব সময় চাঁদ-বিবি কিংবা ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাইয়ের মতো প্রকাশ্যে অশ্বপৃষ্ঠে নয়, হয়তো রাজিয়া কিংবা ভিক্টোরিয়ার মত সিংহাসনাসীনা হয়ে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে নয়। এমনকি ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী অথবা শ্রীমতী বন্দর নায়েকের মত জনগণ বিধায়ক হয়ে নয়। তবু জাফরি কাটা অলিন্দের আড়াল থেকে

কত রাজ্য শাসিত হয়েছে। নর্তকীর নূপুর নিক্কনে, সুন্দরীর বিলোল দৃষ্টিপাতে কত শত মসনদের ভিত্তি দুলে পড়েছে, ট্রয়ের হেলেন থেকে দিল্লির নূরজাহান, ক্রিস্টিন কীলার থেকে ডনা রাইস পর্যন্ত যে ইতিহাস সবাই জানে।

মহিলা ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় ইতিহাস এসে গেলো, তাও নিতান্ত খেলো কেচ্ছা কাহিনীর ইতিহাস।

কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কেচ্ছাকাহিনী নয়। আজকাল ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার সাহেবার মন্ত্রিসভা সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিকরা অনেকে একটা কথা বলেন। কথাটা কিন্তু নতুন নয়। কথাটা প্রথম বলা হয়েছিলো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে।

সেই মহীয়সী মহিলা বিষয়ক সেই আশ্চর্য সত্য পুরনো বাক্যটি সকলেই এক সময়ে শুনেছেন, তবু গল্পের খাতিরে আরেকবার বলি। বাক্যটি ছিলো খুবই সাদামাটা।

'শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় একজনও পুরুষ মানুষ নেই, একমাত্র ইন্দিরাজী ছাড়া।' এই কথা এখন বিলেতেও চালু হয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে, 'ম্যাগি থ্যাচারের ক্যাবিনেটে মদ্দা মানুষ বলতে ঐ একা ম্যাগি।'

পুরুষ মানুষের কথা নয়। মহিলামহলে ফিরে আসি।

একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। খুব বড় ব্যাপার নয়, লোকসভা বা বিধানসভা নয়। নেহাৎ মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন।

ভদ্রমহিলার হৃদয়কন্দরে সমাজসেবার উদগ্র বাসনা দেখা দিয়েছিলো। একটি হপ্তাকাবারি তিনচাকার রিকসা দশ হাজার অকল্পনীয় প্রতিশ্রুতিময় লিফলেট, কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী ; তিন দেওর এবং এক প্রগলভা ভাসুরঝিকে সম্বল করে তিনি নির্বাচন মহাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ঐ ভাসুরঝি মেয়েটির প্রতি ছিলো আমার দুর্বলতা। না, কোনো খারাপ ভাবে একথা নেওয়া চলবে না। আসলে ঐ মেয়েটি আমাকে পেলেই আমার লেখার নিন্দে করতো। আমি আমার লেখার নিন্দা প্রশংসা বিশেষ শুনতে পাই না। এ মেয়েটির কথাবার্তা শুনে কেমন যেন চমক লাগতো। বড় ভালো লাগতো তাকে।

আমার সেই দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার ভাসুরঝির কাকিমা, মানে সেই নির্বাচন প্রার্থীনী, কোনো দলের টিকিটে নয় স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবং ফলে, এ সব ক্ষেত্রে যা হয় বহুবিধ গালভরা প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও তিনি হারলেন, নির্বাচকমণ্ডলী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর আমি একদিন সমবেদনা জানানোর জন্যে তাঁর ওখানে গেলাম। তিনি তখন বাসায় নেই। সেই প্রগলভা ভাসুরঝিটি রয়েছে, সে কিন্তু খুব ভালো কথা বললো, রীতিমত দার্শনিকের উক্তি, 'কাকিমা যে হেরেছে, এতে ভালোই হয়েছে। উনিও খুশি হয়েছেন। জিতলে পরে যা একগাদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অঢেল জল থেকে অঢেল বিদ্যুৎ সে সবের সুরাহা করতে গিয়ে দম বেরিয়ে যেতো।'

এবার স্বদেশ থেকে বিদেশ যাই। সরাসরি মূল মার্কিন ভূখণ্ডে। যেখানে নির্বাচনের তামাশা যথেষ্টই জমজমাট।

ব্যাপারটা ছোট। সংক্ষিপ্ত করেই বলি। এক মার্কিনী সুন্দরীর কাছে তাদের দেশের রাজনীতি বুঝতে চেয়েছিলাম। সে প্রথমেই শুরু করলো, 'আমাদের দেশে প্রধান পার্টি তিনটি। আমার চিরকালই ধারণা দুটো, সুতরাং অবাক হয়ে বললাম, 'তিনটে ?' সে মৃদু হেসে বললো, 'হ্যাঁ, তিনটে ?' তারপর চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে হাতের লোহিত কররেখাগুলি গুনে গুনে বললো, 'নাম্বার ওয়ান রিপাব্লিকান, দুই নাম্বার ডেমোক্রেটিক আর তিন নাম্বার, সেটাই আসল, সেটা হলো ককটেল পার্টি।'

পুনশ্চঃ এখন পর্যন্ত কোনো মহিলা ভারতের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। এবারে কেউ প্রার্থী হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, কোনোদিন কোনো মহিলাই বোধহয় ভারতের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে যাবেন না। বাধা একটাই, আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর নিম্নতম বয়েস হওয়া চাই পঁয়ত্রিশ। কোনোদিন কোনো মহিলার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, না হবে।

কোনো দিন কোনো মহিলার পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসও হবে না, কোনো মহিলা প্রেসিডেন্টও হতে পারবেন না।

স্বপ্ন ও রমণী

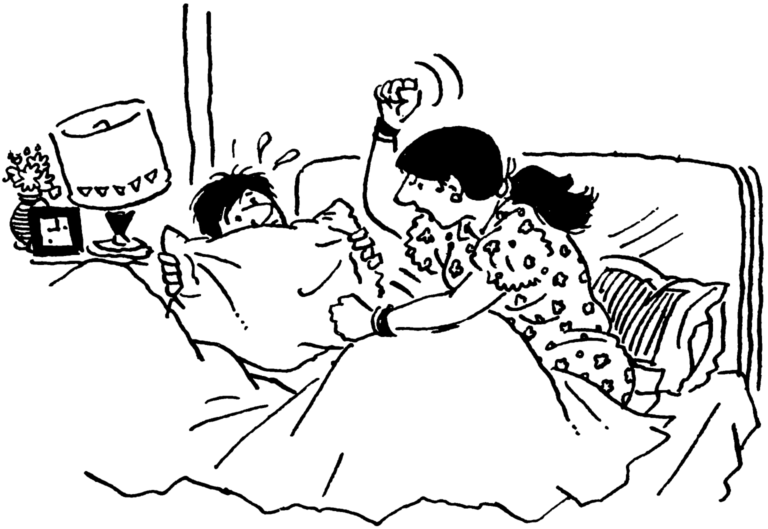

এই রকম বিপজ্জনক নামের গোলমেলে রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার আড়াল দিয়ে প্রবেশ করাই হয়তো নিরাপদ। 'স্বপ্ন' কবিতার সেই স্মৃতিগন্ধময়, উজ্জ্বল, অনিবার্য পংক্তিগুলি আরেকবার স্মরণ করি।

'দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকের উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে...'

নবীন বয়েসে যে বাঙালি তরুণ এই কবিতা পড়ে শিহরিত হননি, একবারের জন্যেও রোমাঞ্চিত হননি, তার জীবনযৌবন বৃথা। স্বপ্ন সকলেই দেখে। হয়তো সবাই স্বপ্নে শিপ্রা নদীপারে প্রথমা প্রিয়ার কাছে পৌঁছায় না, কিংবা স্বপ্নে দেখতে পায় না যে 'কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।' এমন কি হিং টিং ছটের হবুচন্দ্র ভুপ কবে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার অর্থ ভেবে ভেবে গবুচন্দ্র চুপ হয়ে যান, সেই অদ্ভুত স্বপ্ন, 'শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে'—আমাদের সকলের সেরকম স্বপ্ন দেখার

সৌভাগ্যও কদাচিত হয়। তবু স্বপ্ন সকলেই দেখে। শুধু মহিলাদের জড়িয়ে লাভ নেই, স্ত্রী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ, মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষু, দুগ্ধপোষ্য শিশু সকলেই স্বপ্ন দেখে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে ভয় পেয়ে শিশু কেঁদে ওঠে আবার মুহূর্তের মধ্যে পরম কৌতুকে ঠোঁট টিপে হাসে। মৃত্যুপথযাত্রীও স্বপ্ন দেখে, যন্ত্রণায় জর্জর তার শরীর কিন্তু তার স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখে পরম প্রশান্তি।

শুধু মানুষ নয়, স্বপ্ন জীবজন্তুও দেখে। আমাদের বাসায় একটি প্রৌঢ় কুকুর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে লড়াই করে ওঠে, তারপর তার ঘুম ভেঙে যায়, আচমকা জেগে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কুকুরের স্বপ্ন আপাতত থাক। মানুষের স্বপ্নে যাই।

প্রথমে সেই অতি পুরনো বাজে গল্পটা বলে নিই। গল্পটা আগেও কোথায় যেন বলেছি বলে মনে হচ্ছে, তাই একটু ঘুরিয়ে নাট্যাকারে লিখছি।

প্রথম দৃশ্য। মধ্যরাত

একটি ডবল বেডের খাটে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি নিদ্রিত।

স্বামী : (ঘুমের মধ্যে দুই বাহু প্রসারিত করে, উচ্চস্বরে) জলি, জলি, জলি।

স্ত্রী : (ঘুম ভেঙে উঠে, স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে তুলে) জলি ? জলি কে ?

স্বামী : (চোখ কচলাতে কচলাতে) জলি ?

স্ত্রী : হ্যাঁ। এতক্ষণ স্বপ্নে যাকে জড়িয়ে ধরে জলি-জলি করে চেঁচাচ্ছিলে, সেই জলিটা কে আমি জানতে চাই।

স্বামী : (আলগোছে হাই তুলে) ও কিছু নয়।

স্ত্রী : কিছু নয় ?

স্বামী : কি বিরক্ত করছো ? জলি আসলে একটা ঘোড়ার নাম। দুপুরে রেস খেলতে গিয়েছিলাম না। জলিই তো বাজি জিতলো। সেই পয়সা দিয়েই তো তোমার চকোলেটের বাক্স কিনে আনলাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রভাত কাল

ডবল বেডের খাটে স্বামী একা নিদ্রিত। কাছে জানালার ধারে চেয়ারে বসে স্ত্রী খবরের কাগজ পড়ছেন। সামনের তেপায়া টেবিলের উপরে টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো।

স্ত্রী : (টেলিফোন তুলে) হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, কি নাম বললেন। আচ্ছা। ধরুন। ঘুমিয়ে আছে ডেকে দিচ্ছি।

স্ত্রী উঠে গিয়ে নিদ্রিত স্বামীকে ধাক্কা দিলেন।

স্বামী : (জেগে উঠে) কি হলো ?

স্ত্রী : তোমার ফোন।

স্বামী : কে ফোন করলো ? এই সকালে ?

স্ত্রী : সেই যে জলি, রেসের ঘোড়াটার কথা রাতে বললে, সেই ঘোড়া ফোন করেছে।
পুরনো গল্পই যখন বলছি, তা হলে অন্য এক সরস কাহিনীর আরেক মহিলার কথা বলি। সেই মহিলার স্বামী বেচারার কিন্তু কোনো দোষই ছিল না।

ভদ্রমহিলা একদিন রাতে ঘুম থেকে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত অবস্থায় পাশে গভীর নিদ্রামগ্ন পতিদেবতাকে দমাদম ঘুষি মারতে থাকেন।

স্বামী ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে জেগে উঠে মাথার বালিশটা বর্মের মতো ব্যবহার করে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করতে করতে আতঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো ? আমাকে হঠাৎ মারছো কেন ? আমি কি করলাম ?' তখনো মারতে মারতে স্ত্রী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'কি করলাম ? ন্যাকা আমার। বদমায়েসির আর জায়গা পাওনি।'

হতভম্ব স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব কি বলছো ? কি বদমায়েসি করলাম আমি ?' স্বামীর এই সরল প্রশ্নে স্ত্রী এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'বদমায়েসি নয় ? এই মাত্র আমি স্বপ্নে দেখলাম, তুমি লিলিকে নিয়ে সিনেমায় গেছো। তাকে আদর-টাদর করছো।'

অবাক হয়ে স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে লিলি ? তার সঙ্গে আমি সিনেমায় ?' ...ফোঁপাতে ফোঁপাতে স্ত্রী বললেন, 'তুমি জানো না লিলি কে ? লিলি হলো সামনের বাড়ির নতুন বৌটা। রোববার সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। লিলির সঙ্গে অত হেসে হেসে গল্প করলে, এখন বলছো কে লিলি ?'

বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, নিরুত্তর স্বামীকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে স্ত্রী বললেন, 'আমি যদি আর কখনো স্বপ্নে লিলির সঙ্গে তোমাকে দেখি, চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে যাবো।'

স্বপ্নতত্ত্ব বড় কঠিন জিনিস। কেন এই সরলা মহিলা স্বপ্নে তাঁর স্বামীকে পাশের বাড়ির নতুন বৌটির সঙ্গে দেখলেন, সে গভীর গবেষণার বিষয়।

শুধু এই সমস্ত জটিল স্বপ্ন নয়, আমাদের অনেক সুখস্বপ্ন, মধুর তন্দ্রার সর্বনাশ করে গেছেন মহামান্য সিগমুণ্ড ফ্রয়েড গত শতকের শেষে এবং এই শতকের গোড়াতে। তারপরে তাঁর চেলাচামুণ্ডার হাতে ব্যাপারটা ভয়াবহ পরিণতি লাভ করেছে। ফ্রয়েডীয় মানুষের মনে কোনো চিন্তাই আর নিষ্পাপ নয়, কোনো ভাবনাই সহজ, সরল নয়। সব জটিল হয়ে গেছে। এমনকি স্বপ্নের মত তরল জিনিসও। বহু যুগ আগে এক মহাকবি বলেছিলেন, স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম। আরো আগে, ঢের আগে সাহিত্যে স্বপ্নের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। রামায়ণে রাজা দশরথ স্বপ্ন দেখেছেন, অশোককাননে সীতা স্বপ্ন দেখেছেন।

স্বপ্নের মধ্যে দেবতারা চিরকাল ধরে নিঃসঙ্গিনী, বিরহাতুরা রমণীদের দেখা দিয়েছেন, প্রয়োজন বোধে সঙ্গদান করেছেন। মায় রমণীরা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তাঁদের গর্ভে ধারণ করেছেন স্বর্গীয় সন্তান।

এ সব পুরনো কথা। স্বপ্নতত্ত্ব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাপার। যে কোনো বড় পঞ্জিকায় ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে বেশ কয়েক পাতা ধরে স্বপ্নতত্ত্ব দেয়া থাকে। বটতলার বাইরে দোকানে স্বপ্নের বিষয়ে বই পাওয়া যায়। আর গবেষণাগ্রন্থের কোনো ভাষাতেই অভাব নেই। স্বপ্ন-বিজ্ঞানীরা এতকাল বলতেন যে স্বপ্নের নাকি কোনো রঙ নেই। সে শুধুই পুরনো দিনের সিনেমার মত সাদাকালো। আমি নিজেও কখনো রঙিন স্বপ্ন দেখিনি, নিতান্তই সাদাকালো, আবছায়া।

কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, স্বপ্ন নাকি রঙিনও হতে পারে, স্বপ্নের মধ্যে নানা বর্ণের প্রতিফলন আসা অসম্ভব নয়। জানি না বিদেশি স্বপ্ন গবেষকরা কখনো ভারতীয় হিন্দি সিনেমা দেখেছেন কি না এবং তাদের রঙিন স্বপ্নের ধারণা বোম্বে সিনেমার স্বপ্নের দৃশ্য দেখে তৈরি হয়েছে কিনা। বলা বাহুল্য, রঙিন স্বপ্নের হলিউডি সিনেমারও একদা অভাব ছিলো

না। সে যা হোক, স্বপ্ন ও রমণী সংক্রান্ত শেষ আখ্যানটি লিখি। এ গল্পের নায়ক এক চুরচুর মাতাল, ধরা যাক, তার নাম তিনকড়ি দাস। গভীর রাতে টলমল করতে করতে বাড়ি ফিরছিলেন তিনকড়িবাবু। বাড়ির কাছেই রাস্তা থেকে তাঁর অতিশয় তরল অবস্থা দেখে পুলিশ তাঁকে ধরলো।

তিনকড়িবাবু স্খলিত কণ্ঠে পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তিনি কোনো অন্যায় করেননি, কাছেই তাঁর বাড়ি, তিনি বাড়ির কাছে রাস্তায় বায়ুসেবন করছেন। পুলিশ কি আর অত সহজে ছাড়ে?

তিনকড়িবাবুর কোনো কথা সে বিশ্বাস করে না, শুধু বলে, 'থানায় চলো। তোমার বাড়ি এখানে একথা আমি বিশ্বাস করি না।' তিনকড়িবাবু তখন টলতে টলতে পুলিশকে নিয়ে নিজের বাড়ির সামনে এলেন, তারপর বাড়ির সদর দরজায় নেমপ্লেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'সেপাইজি, ঐ যে দেখছেন নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে মিঃ তিনকড়ি দাস, ঐ তিনকড়ি দাস হলাম আমি।' তারপর ডাকবাক্সে হাত দিয়ে কয়েকটা চিঠি বার করলেন। এবং বললেন, 'এই যে চিঠিগুলো সব তিনকড়ি দাসের নামে এসেছে, আমিই হলাম তিনকড়ি দাস।' তারপর তিনকড়ি দাস চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলে পুলিশকে সরাসরি শোবার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে গোলমেলে ব্যাপার, তিনকড়িবাবুর স্ত্রীর পাশে কে এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে, মুখে হাসির ছটা, বোধহয় স্বপ্ন দেখছে।

অদমিত তিনকড়িবাবু পুলিশকে বললেন, 'ঐ যে মহিলা শুয়ে আছেন উনি হলেন আমার মানে তিনকড়ি দাসের স্ত্রী। আর ওঁর পাশে শুয়ে আছি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি হলাম আমি, এই তিনকড়ি দাস।'

এই অখাদ্য নিবন্ধ রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম। ইয়েটসের স্বপ্ন দিয়ে শেষ করি। এই স্বপ্নের মধ্যেও রমণী বিজড়িত। অনুবাদে কিছু স্বাধীনতা নিলাম। বিদূষী, বিদ্যাবতী পাঠিকার অনুমতি নিশ্চয় পাবো। সামান্যই কয়েক পংক্তি : কিন্তু আমি নিতান্ত গরীব। আমার আছে শুধু স্বপ্ন। আমি সেই স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছি তোমার পায়ের নিচে, প্রিয়তমা। প্রিয়তমা, তুমি একটু নরম করে হাঁটো, তোমার পায়ের নিচে আমার স্বপ্ন। তুমি আমার স্বপ্ন মাড়িয়ে দিয়ো না।

অবাঞ্ছিত আতিশয্য

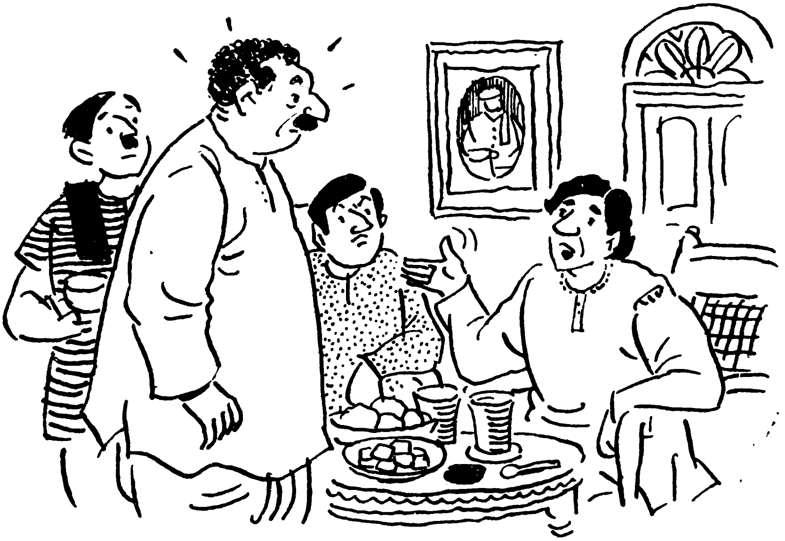

আতিশয্য বিষয়ে দুটো প্রাচীন গ্রাম্য গল্প মনে পড়ছে। প্রথমে সে দুটো বলে নিই। গল্পগুলো আজকের নয়, যে সব স্মৃতিমতী পাঠিকা এগুলো স্মরণ করতে পারবেন তাঁদের নিশ্চয় ঢের বয়েস হয়েছে, তাঁরা দয়া করে এবং নিজ গুণে এই অবচীন হাস্যকর লেখককে ক্ষমা করে দেবেন।

গল্প দুটো প্রায় একই জাতের, সামান্য প্রকৃতিভেদ আছে। দুটো গল্পেই নব জামাতা শ্বশুরালয়ে গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গী এক সেয়ানা বন্ধু।

প্রথম গল্পের জামাতা বাবাজীবনের একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যাস রয়েছে। তাঁর সেয়ানা সঙ্গীর দায়িত্ব হলো রাশ টেনে রাখা। ঠিক হয়েছে জামাতা যদি অভ্যাসের দোষে শ্বশুরবাড়িতে বেফাঁস কিছু বাড়াবাড়ি বলে ফেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটি একটু কাশবেন বা গলাখাঁকারি দেবেন আর সেটা শোনামাত্র জামাতা তাঁর বক্তব্য অর্ধেক কমিয়ে ফেলবেন। জামাতা এবং তাঁর বন্ধু শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে হাতমুখ ধুয়ে বৈঠকখানা ঘরে এসে বসেছেন। শ্বশুরমশায় কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পরে জানতে চাইলেন পথে কোনো অসুবিধে হয়েছে কি না।

জামাতা বললেন, 'না তেমন কিছু হয়নি। তবে নৌকো করে নদী দিয়ে আসার সময় একটা প্রকাণ্ড কুমীর দেখলাম।'

শ্বশুরমশায় বললেন, 'প্রকাণ্ড কুমীর ?'

জামাতা বললেন, 'সে প্রায় দুশো হাত লম্বা হবে।' শ্বশুরমশায়ের চোখ কপালে উঠলো কুমীরের দৈর্ঘ্য শুনে। সেয়ানা বন্ধুটিও গলা খাঁকারি দিলো।

জামাতা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করলেন, 'কুমীরটা যখন নৌকোর কাছে এলো দেখে বুঝলাম দুশো না হলেও অন্তত একশো হাত হবে।'

এটাও অবিশ্বাস্য, সেয়ানা সুহৃদ আবার গলা খাঁকারি দিলেন, জামাতা তখন বেশ চিন্তা করে মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'নদীর মধ্যে আরেকটা নৌকোয় এক শিকারি ছিলো সে বন্দুক দিয়ে গুলি করে কুমীরটা মেরে ফেললো। মরা কুমীরটা ডাঙায় ওঠানো হলে বুঝলাম হাত পঞ্চাশেক হবে।'

আবার গলা খাঁকারি, জামাতা বাবাজীবনের সংশোধন, 'ডাঙায় ওঠানোর পর ফিতে দিয়ে মেপে দেখা গেলো ঠিক পঁচিশ হাত।'

এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা রীতিমত গোলমেলে হয়ে উঠেছে, শ্বশুরমশায় কেমন হতভম্ব হয়ে গেছেন সমস্ত ঘটনা শুনে, বন্ধুটির গলা খাঁকারি এবার তীব্রতর হলো। কিন্তু এখন আর উপায় নেই, জামাতা তাঁর বন্ধুটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আর কমাবো কি করে। মাপা হয়ে গেছে, এরপর আর কমানো যাবে না।'

পরের কাহিনীটিতেও নব জামাতা আর তাঁর সেয়ানা বন্ধু শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। তবে এই গল্পে জামাতা নন তাঁর বন্ধুটিই অবাঞ্ছিত আতিশয্য দোষে পীড়িত।

শ্বশুর মহোদয় নবজামাতার সঙ্গে গল্পের ছলে নানা বিষয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তবে কথাবার্তা প্রায় সবই চালাচ্ছেন বন্ধুবর। শ্বশুর প্রশ্ন করলেন, 'কালীঘাটের বাড়িটা তো তোমাদের নিজেদের ?' বন্ধুটি বললেন, 'শুধু কালীঘাটের বাড়ির কথা বলছেন কি, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, রাঁচী, মিহিজাম সব জায়গায় ওদের বাড়ি আছে।' শ্বশুরমশায় বললেন, 'তোমার এক কাকা বোধহয় দিল্লিতে থাকেন।'

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর বন্ধুটি বললেন, 'দিল্লি কি বলছেন, ওর আরেক কাকা থাকে বোম্বাইতে, দুই মামা আছে মস্কোতে, মেসো প্যারিসে, এক পিসেমশায় লন্ডনে, অন্য পিসেমশায় রামপুরহাটে।'

এই রকম ভালোই চলছিল, কিন্তু এই সময় জামাই একটু হাঁচলেন, শ্বশুরমশায় বললেন, 'তোমার কি একটু সর্দিকাশি আছে ?' বন্ধুটি বললেন, 'সর্দিকাশি কি বলছেন, ওর ছোটবেলা থেকে হুপিং কাশি, ওদের বাড়ির প্রত্যেকের শ্লেষ্মাকাশি, গুপোকাশি এমনকি যক্ষ্মাকাশিও পর্যন্ত রয়েছে।'

এরপর আর এই গল্প এগোতে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না।

জামাতা বাবাজীবন এবং তাঁর সেয়ানা সুহৃদের এই রদ্দি গল্পগুলি অত্যন্ত মোটা দাগের, কিন্তু এগুলির মধ্যে আসল সত্যটি নিহিত রয়েছে। সোজা কথা, কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে শেষ পর্যন্ত একটা কিছু গোলমাল হবেই।

তা গোলমাল একটু হয় হোক। আমরা ইত্যবসরে আরো একটু গোলমেলে জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

বহুক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত আতিশয্য ব্যাপারটা ঘটে তোষামোদ বা খোশামোদ করতে গিয়ে। এই শব্দ দুটি সম্পর্কে এখানে সামান্য কিছু বলে রাখা ভালো। বাংলা ভাষায় তোষামোদ

একটি আশ্চর্য শব্দ। তোষামোদ এবং খোশামোদ শব্দের অর্থ একই, স্তাবকতা, মনোরঞ্জন, চাটুবৃত্তি, মোসাহেবি ইত্যাদি। খোশামোদ শব্দটি প্রায় খাঁটি ফারসি শব্দ, মূল ফারসিতে শব্দটি হলো, 'খুশ আমদ' মানে মনোরঞ্জন। তোষামোদ শব্দটি রচনা হয়েছে সংস্কৃত আর ফারসি মিলিয়ে সংস্কৃত তুষ থেকে ফারসি খুশ-আমদ্ শব্দের দৃষ্টান্তে গঠিত। এ রকম শব্দ আমাদের ভাষায় খুব বেশি নেই।

সে যাই হোক, পণ্ডিতি করবো না। গালগল্পে ফিরে যাই। তোষামোদের কথায় মহামহিম গোপাল ভাঁড় মহোদয়ের সেই বিখ্যাত গল্পটি স্মরণীয়।

রাজা তাঁর পারিষদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। তাঁর মোসাহেব সবটাতেই রাজাকে তাল দিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা প্রায় দৃষ্টিকটু (অথবা শ্রুতিকটু) পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আলোচনার বিষয় হলো তরকারি। কথায় কথায় পটলের কথা উঠলো। রাজা বললেন, পটল খুব ভালো তরকারি। মোসাহেব সায় দিলেন ভালো মানে ? খুব ভালো। ভাজা খান, সিদ্ধ খান, মাছে খান, নিরামিষ খান, সরষে বাটা খান, পটলের মতো তরকারি নেই, হুজুর। রাজা বললেন, 'কচি পটল',...রাজাকে কথা শেষ করতে দিলেন না মোসাহেব, লুফে নিলেন বাক্যটা, 'কচি পটলতো অমৃত। আর শুধু কচি পটল কেন পটলের পাতা খান ডাল দিয়ে, বড়া করে খাওয়া আরম্ভ করার সময়, ভাতের আগে, তার কোনো তুলনা নেই, হুজুর।'

রাজা বললেন, 'কিন্তু বড় তিতো।' মোসাহেব ঘাড় কাত করে সায় দিলেন, 'খুব তিতে, অতি বিদঘুটে'। রাজা বললেন, 'পটল বেশি খাওয়া যায় না। ভালো করে হজম হয় না।'

মোসাহেব বললেন, 'পটল মোটেই ভালো নয়। হজম করা খুব কঠিন। হাতি পর্যন্ত পটলের বিচি হজম করতে পারে না। পটল সাংঘাতিক জিনিস হুজুর।'

রাজা আর থাকতে পারলেন না। মোসাহেবকে বললেন, 'তোমার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি কখনো বলছো পটল খুব ভালো, কখনো বলছো পটল খুব খারাপ।' মোসাহেব হাত কচলিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হুজুর তা বলেছি।' রাজা বললেন, 'তা হলে তোমার আসল কথাটা কি ?' মোসাহেব আরো হাত কচলিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হুজুর, আমার কথাটা হলো আমি তো আর পটলের গোলামি করি না, আমি আপনার গোলাম, আপনি যা বলেছেন আমি তাই বলেছি।'

স্বীকার করা উচিত এই মোসাহেবটি খুব উচ্চস্তরের নয়। স্তাবকতা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার, সেটা প্রকট হয়ে গেলে, মোসাহেবি ধরা পড়ে গেলে চলবে না। তাতে সাহেব এবং মোসাহেব দুজনেরই বেকায়দা।

মোসাহেব নিয়োগের কাহিনীটি বলি।

এক সাহেব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন মোসাহেব চেয়ে। অনেক লোক দরখাস্ত করেছে, সাক্ষাৎকার চলছে। সাহেব নিজেই তাঁর মোসাহেব বাছছেন। কিন্তু ঠিক মতো লোক পাওয়া খুব কঠিন। অবশেষে অনেক জনের পরে এলো আসল ব্যক্তি। সাহেব এবং ঐ চাকুরি প্রার্থীর নিম্নোক্ত কথোপকথন থেকে এই আসল ব্যক্তিটিকে কিছুটা বোঝা যাবে।

সাহেব : তুমি কি মোসাহেবের কাজ পারবে ?

ভাবী মোসাহেব : আমারো কেমন খটকা লাগছে, আমি কি মোসাহেবের কাজ পারবো।

সাহেব : আমার মনে হচ্ছে তুমি পারলেও পারতে পারো।

ভাবী মোসাহেব : আমারও একেক সময় সাহস হচ্ছে, হয়তো পারলেও পারতে পারি।

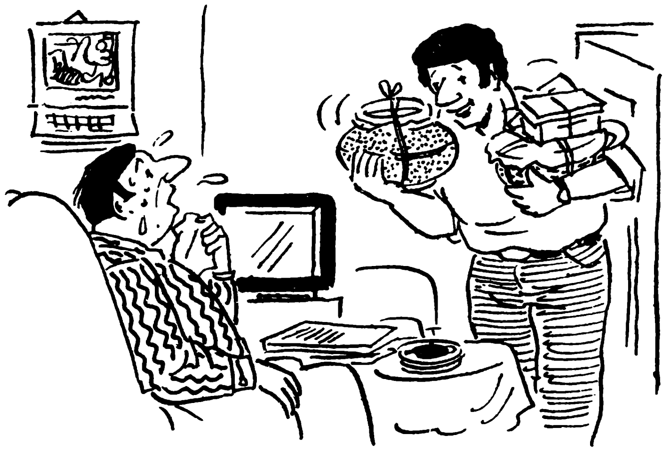

সাহেব : কিন্তু পারবে কি ?
ভাবী মোসাহেব : পারবো কি ?
সাহেব : মোসাহেবির কাজ খুব কঠিন।
ভাবী মোসাহেব : খুব কঠিন স্যার।
সাহেব : তবে চেষ্টা করলে হয়তো পেরে যাবে।
ভাবী মোসাহেব : চেষ্টা করলে পারবো হয়তো।
সাহেব : তোমার তো বেশ এলেম আছে। মনে হচ্ছে ভালো ভাবেই পেরে যাবে।
ভাবী মোসাহেব : তা ঠিক স্যার। এখন মনে হচ্ছে খুব ভালোই পারবো।
সাহেব : কিন্তু শেষে যদি না পারো ?
ভাবী মোসাহেব : সত্যি শেষে যদি না পারি আমিও খুব ভাবছি স্যার।
সাহেব : থামো, তোমাকে আর ভাবতে হবে না।
ভাবী মোসাহেব : না স্যার, আমি আর ভাববো না।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ব্যক্তিই মোসাহেবির কাজটা তখনই পেয়ে গিয়েছিলো এবং পরবর্তী জীবনে একজন অত্যন্ত সফল মোসাহেব হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে।

তবে অবাঞ্ছিত আতিশয্য অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় ও দৃষ্টিকটু বাড়াবাড়ি ব্যাপারটা শুধুই যে চাটুকারিতা এবং মোসাহেবির সঙ্গেই জড়িত এমন কথা বলা যাবে না।

অনেকের চরিত্রের মধ্যেই এই অসঙ্গতি রয়েছে। এই রকম কারো বাড়িতে যান, তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে, 'আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার, গরিবের বাড়িতে আপনি আসবেন, এতো ভাবাই যায় না, বসতে আজ্ঞা হোক', বলে চেয়ার ঠেলে বসিয়ে দিয়ে আপনাকে খালি ঘরে ফেলে সামনের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। আপনি বোকার মতো বসে থাকবেন তাঁর বাইরের ঘরে, এসেছিলেন এক মিনিটের এক প্রয়োজনে কিংবা ভদ্রতার খাতিরে। গৃহকর্তা আধ ঘন্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ফিরলেন হাতে এক চাঙারি সিঙ্গাড়া, কচুরি, সন্দেশ, রসগোল্লা নিয়ে, ঘরে ঢুকে দেখলেন আপনি দরদর করে

ঘামছেন, তাড়াতাড়ি বললেন, 'আরে কি লজ্জার কথা পাখাটা খুলে দিয়ে যাইনি।' বলে জোড়া হাতে পাখার সুইচটা অন করতে গিয়ে খাবারের চাঙারিটা হাত থেকে তিনি অবশ্যই ফেলে দেবেন। তিনি আবার ছুটবেন মোড়ের মাথায় গঙ্গারামে কিংবা সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে—

আপনি এই অবসরে অবশ্যই সরে পড়বেন কারণ আপনার হাতে আর অপেক্ষা করার মতো আধ ঘণ্টা সময় নেই। আর তা ছাড়া, ঐ সন্দেশ রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া, কচুরি, ওগুলো সব আপনার পক্ষে বিষ, ডাক্তারের বারণ, আর ওসবের প্রতি আপনার তেমন রুচিও নেই। এরই রকমফের দেখা যায় সভা-সমিতিতে। যেখানে অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় শ্রোতাদের সঙ্গে অবিশ্বাস্য সমস্ত বিশেষণ এবং অলঙ্কারে ভূষিত করে। স্পষ্ট মনে আছে, মফঃস্বলের এক সাহিত্যসভার শেষে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সভায় বলা হয়েছিলো, 'ওঁর মতো মহাপ্রাণ বিশিষ্ট উজ্জ্বল পুরুষকে ক্ষুদ্র ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ছোট করতে চাই না।' এবং এর ঠিক পরের পংক্তি ছিলো, 'এঁকে শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।' আরেক ধরনের আতিশয্য ঘটে মদ্যপানের আসরে। এমনিতে মাতালেরা মদ খেয়ে নানা রকম বাড়াবাড়ি করে ফেলে কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক হলো কোনো কোনো মদ্যপ কিছুটা পান করার পরে ঘরের কিংবা টেবিলের সকলকে পরের দিন সন্ধ্যায় তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে বসে। কেউ যদি সেই নিমন্ত্রণ এড়াতে চায়, তবে অব্যাহতি নেই। ভীষণ জোরাজোরি হবে নিমন্ত্রণ কর্তার তরফে, এমন কি কাঁদাকাটি, হাতে-পায়ে ধরা হবে নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্যে।

এইখানেই আসল বিপদ। কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি সরল চিত্তে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং পরের দিন সন্ধ্যায় যদি ঐ ব্যক্তির বাড়িতে যায় তাকে রীতিমতো জব্দ হতে হবে। নিমন্ত্রণ কর্তার বাড়ির লোকেরা বিস্মিত হবে তাকে দেখে কারণ সে বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথা কিছুই বলেনি, এমনকি তার নিজেরই মনে নেই যে সে নিমন্ত্রণ করেছিলো ; সুতরাং যখন সে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করবে, 'আরে কি মনে করে', তখন দু-চারটে বাজে কথা বলে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অবশেষে আতিশয্যহীনতার একটি চৈনিক উপাখ্যান দিয়ে দাঁড়ি টানি। এক কারখানা দেখতে গিয়েছেন জনৈক পর্যটক। চীনেদের একটি পারিবারিক সমাধিস্থলে গিয়ে দেখেন প্রত্যেকটি কবরের উপরে মৃতদের জন্যে ভুরিভোজ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে বাহারি থালায়। দেখে পর্যটক খুব বিস্মিত হলেন। কিন্তু তিনি আরো বিস্মিত হলেন এরই মধ্যে একটি সমাধি দেখে যার উপরে থালায় মাত্র দুই কুচি শশা আর এক চিলতে লেবু দেওয়া রয়েছে। পর্যটক প্রশ্ন করলেন, 'প্রত্যেকের এত খাবার, এর এত কম কেন ?' যে ব্যক্তি খাবার দিচ্ছিলেন তিনি বললেন, 'ওটা উং চুংয়ের কবর, মরার সময় উং চুং ডায়েটিং করছিলো, তাই এই খাবার দেওয়া হয়। উং চুংকে বেশি খাবার দিলে শুধু শুধু নষ্ট হবে।'

অবাঞ্ছিত আতিশয্যের এখানেই ইতি।

অসমাপ্ত

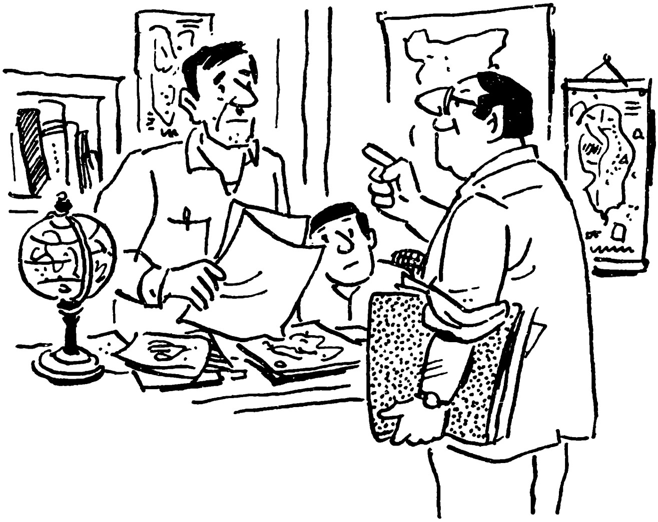

মহাভারতের এটা শেষ কিস্তি ; মহাকাব্যের অনুকরণে বলা যেতে পারে এ আমার এবং পাঠকদের শান্তিপর্ব। এ লেখা অমর হবে না, না হলে বলতাম স্বর্গারোহণ পর্ব। একদিন দু'দিন নয়, প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি সপ্তাহ ধরে পরম সহিষ্ণু পাঠক পাঠিকাগণ এবং সেই সঙ্গে মাননীয় সম্পাদক, মুদ্রাকর— সবাই যাঁরা আমার এই বস্তাবন্দী গুরুভার বিনা বাক্যব্যয়ে বহন করেছেন, কখনও বা মৃদুহাস্যে বাহবা দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবান। তাঁদের প্রত্যেককে নমস্কার।

প্রথম ক্ষেত্রে কারোর ধরতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়নি যে, এ মহাভারত সে মহাভারত নয়। এখানে মহৎ কল্পনার চেয়ে চপলতা বেশি, মৌলিকতার চেয়ে বাটপাড়িই বেশি। তবু বলি, এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ হাস্যকর রচনা কখনও না কখনও কারো না কারো নিশ্চয় ভালো লেগেছিল, তা না হলে এতদিন চললো কী করে ?

রবীন্দ্রনাথই তো লিখেছিলেন, 'আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না।' কথাটা কবি অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন কিন্তু বাংলা ধারাবাহিক রচনা কোথাও একবার শুরু হলে আর সমাপ্ত হতে চায় না। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর স্রোতের বিপক্ষে, হাওয়ার বিরুদ্ধে রচনাতরীর গুণ টেনে যান অদম্য লেখক।

মহাভারতের ক্ষেত্রে অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা যে, আপাতত ক্লান্ত পাঠক স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলে বাঁচবেন। প্রতি রবিবার সকালে তাঁকে আর বাজে রসিকতা সহ্য করতে হবে না।

* * *

শেষ করার মুহূর্তে দু'একটা প্রায়শ্চিত্ত সেরে নিই।

গত সংখ্যায় 'জলবৎ তরলং' নামক মদ্যপ বিষয়ক নিবন্ধে দুটো আখ্যান বাদ পড়েছিল।

স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত একটা আখ্যান এর মধ্যে রয়েছে। সেটিই প্রথমে ধরছি, তবে ঠিক গল্প নয়, এক মদ্যপের বক্তব্য।

এক মাতাল দুর্গা পুজোর সময় মণ্ডপে প্রতিমা দেখতে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রতিমার সাজগোজ দেখলো, তারপর প্রতিমার উদ্দেশ্যে বললো, 'মা তুমি যতই সাজো গোজো, দিন দুই-তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দেবে।' সব ঐশ্বর্যই যে অনিত্য এ কথা বোঝাতে মাতালের এই মন্তব্যের কোনো তুলনা নেই।

মদ্যপ সংক্রান্ত দ্বিতীয় কাহিনী বিলিতি, সদ্য কেনা জোক বুকে পেয়েছি।

বড়বাবু সকালবেলা তাঁর বাইরের ঘরে বসে রয়েছেন, এমন সময়ে থানা থেকে ফোন এলো, থানার দারোগা ফোন করেছেন। ফোন পেয়ে বড়বাবুর মাথা গরম হয়ে গেল। তিনি তাঁর খাস বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন, খাস বেয়ারা এসে করজোড়ে বড়বাবুর সামনে দাঁড়ালো, তার নাম রামু।

বড়বাবু বললেন, 'রামু, তুমি খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছো'।

রামু বললো, 'আজ্ঞে বাবু'।

বড়বাবু বললেন, 'আজ্ঞে-টাজ্ঞে নয়। এইমাত্র থানা থেকে ফোন করলো। কাল রাত দুটোর সময় বীটের পুলিশ দেখেছে তুমি আমার বাড়ির পাইপ বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলে। এ কথা কি ঠিক?'

রামু বললো, 'আজ্ঞে বাবু'।

বড়বাবু বললেন, 'রাত দুটোর সময় তো আমি তোমাকে নিয়ে শেফালির বাড়ি থেকে এক সঙ্গে ফিরলাম। আমি তা হলে তখন কোথায় ছিলাম?'

রামু বললো, 'আজ্ঞে বাবু, আপনি তো তখন পাইপের মাথায় কার্নিশের ধারে বসেছিলেন। আমি তো আপনাকে নামানোর জন্যই পাইপ বেয়ে উঠছিলাম।'

* * *

শেষ কিস্তিতে ধারাবাহিকতা টেনে লাভ নেই। বরং দু'একটা অপ্রাসঙ্গিক গল্প বলি।

একজনের পেটে মাঝে মধ্যে ব্যথা হয়। এই পৃথিবীতে জন্মে মানুষ যে সব রোগে নিয়মিত ভোগে তার মধ্যে পেট ব্যথা অন্যতম। সুতরাং এই লোকটির অসুখটি খুব মারাত্মক নয়। কিন্তু লোকটির ধারণা অন্যরকম।

তার ধারণা তার পেটের গোলমালের কারণ একটা বেড়াল, সে ভাবে একটা বেড়াল তার পেটের মধ্যে কোনভাবে ঢুকেছে। সেটাই পেটের ভিতরে একেক সময় ম্যাও, ম্যাও, মিউ মিউ করে, একেক সময় রাগে গরর-গর করে, আবার কখনও বা পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ায়। পিঠ ফোলায়, লেজ ফোলায় আর সেই সঙ্গে তার পেটও ফুলে ওঠে।

বলা বাহুল্য, এই কাল্পনিক বেড়ালের অত্যাচারে লোকটি অস্থির হয়ে উঠলো। সে

এদিকে ওদিকে যত ডাক্তার আছে সবাইকে দেখাতে লাগলো।

ডাক্তাররা বুঝতে পারলেন, এ কাল্পনিক রোগ শিবের অসাধ্য। মানসিক চিকিৎসা ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু রোগী মানসিক চিকিৎসা করতে রাজি হবে কেন ? সে নিজেকে পাগল বলে স্বীকার করতে রাজি নয়, কোন্ পাগলই বা তা স্বীকার করে ? আর তাছাড়া সে'তো নিশ্চিত জানে যে তার পেটে বেড়াল ঢুকেছে। তার জন্যেই তার পেট ফোলে, তার জন্যেই তার পেট কামড়ায়।

অবশেষে নানা ঘাটের জল খেতে খেতে আমাদের এই রোগী এক বুদ্ধিমান ডাক্তারের হাতে গিয়ে পড়লো। সেই ডাক্তারবাবু সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রোগীকে বললেন, 'আপনার পেটে সত্যি একটা বেড়াল ঢুকে গেছে, সেটাকে অপারেশন করে বের করতে হবে।'

রোগী এ কথা শুনে খুব খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অপারেশনে সম্মতি জানালো। নির্দিষ্ট দিনে অপারেশন থিয়েটারে রোগীকে অজ্ঞান করে বেশ কিছুক্ষণ শুইয়ে রাখা হলো। তারপর তার জ্ঞান ফিরে আসার পর কিছু রক্ত মাখা তুলো-ব্যান্ডেজ আর একটা বেড়াল দেখিয়ে বলা হলো, আপনার পেট কেটে এই বেড়ালটা বার করা হয়েছে।'

এ কথা শুনে রোগী সন্দেহের সঙ্গে বেড়ালটাকে হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। তারপর বললো, 'এটা সে বেড়াল নয়, আমার পেটের মধ্যের বেড়ালটা হুলো, আর সাদা, মোটেই এ রকম কালো মেনি বেড়াল নয়।'

এই অপ্রাসঙ্গিক গল্পের শেষে এবং মহাভারত কথামালার অবশেষে আরেকবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই, এ মহাভারত সে মহাভারত ছিল না। এ বেড়াল সে বেড়াল নয়।

পুনশ্চঃ বিদায়বেলায় আরেকটা রসিকতার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

এক ভদ্রলোক খুব সম্ভবত কোনো বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক, এক ম্যাপের দোকানে গিয়েছেন হিমালয় পর্বতের ম্যাপ কিনতে।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত বড় দেবো ? কি সাইজের ম্যাপ চাই আপনার ?'

সরলচিত্ত শিক্ষক ভদ্রলোক প্রায় কোনো কিছু চিন্তা না করে বললেন, 'বেশ বড় দেখেই দিন। লাইফ সাইজ হলেই ভালো হয়।'

লাইফ সাইজ হিমালয়ের ম্যাপ মানে আট কিলো মিটার উঁচু এবং কয়েক হাজার কিলোমিটার লম্বা যেমন সম্ভব নয় তেমনই সম্ভব ছিল না আমার এই নকল মহাভারতের দর্পণে জীবনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন।

এই শেষ বাক্যের খেলো অনুপ্রাস যেমন অস্বাভাবিক, এই মহাভারতও তেমন অস্বাভাবিক ছিল।

ভাই প্রাণাধিকা পাঠিকা,
সে কথা ভুলো না,
এবং এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ আমাকেও ভুলো না, শ্রীচরণে না হোক, মননে ঠাঁই দিয়ো।

জন্ম : নভেম্বর, ১৯৩৬ । বাংলাদেশের টাঙাইলে । সেখানেই বিন্দুবাসিনী হাই ইংলিশ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা । কলেজে পড়তে আসেন ১৯৫১ সালে । তদবধি কলকাতায় ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র । কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন, তারপর সরকারি চাকরি । এখন একটি দপ্তরে যুগ্ম-সচিব ।

কবিতা লিখছেন নাবালক বয়স থেকে । অদ্যাবধি প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা সহস্রাধিক । কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা—আট ।

কবিতার পাশাপাশি রম্যরচনা লিখেছেন অজস্র, সঙ্গে গল্প, ছোট উপন্যাস, শিশুসাহিত্য ।

সরকারি অতিথি হয়ে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও অন্যত্র ভ্রমণ করেছেন । সম্পাদনা করেছেন দুটি লিটল ম্যাগাজিন—পূর্বমেঘ ও কয়েকজন ।

বিবাহিত । একটি সন্তান—পুত্র, সম্প্রতি বিদেশে পাঠরত ।

শখ : বাড়িতে নোটিস ও পোস্টার লাগানো এবং নির্বিচারে কুকুর-বিড়ালের পৃষ্ঠপোষকতা ।

প্রচ্ছদ ☐ দেবাশিষ দেব

9 788170 669937